মাঘ—১৩৩৮

দ্বিতীয় খণ্ড } ঊনবিংশ বর্ষ { দ্বিতীয় সংখ্যা

বাঙ্গালা সাহিত্যে Romanticism

এ, হাকিম এম-এ, বি-এল্

যে দিন Wordsworth ও Coleridge তাঁদের "Lyrical Ballads" প্রকাশ করিলেন, ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে সে এক স্মরণীয় দিন। অষ্টাদশ শতাব্দী "রহস্য" বলিয়া কোন জিনিসকে স্বীকার করিতে চায় নাই,—যা কিছু "অলৌকিক" আখ্যা পাইতে অধিকারী, তাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া বিজ্ঞানের গণ্ডীর ভিতর নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট করান হইয়াছে। রামধনুর রহস্যের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে, আমরা তার জাতি-কুলের পরিচয় পাইয়াছি। পৃথিবীতে আর পরীর মেলা বসে না। বিশ্ব-বিজয়ী বিজ্ঞান সমস্ত রহস্যের কুঞ্জিকাঠির সন্ধান পাইয়াছে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বর্ণ-উষায় যে দিন "Lyrical Ballads" প্রকাশিত হইল, সেই দিন হইতে আবার স্বর্গীয় পরীবালাগণ একে একে ভূতলে অবতীর্ণা হইতে লাগিলেন। পল্লীর মাঠ, পল্লীর নদী, পল্লীর আকাশ, পল্লীর বাতাস এক রহস্যের আবরণে ঘিরিয়া গেল; পল্লীর দোয়েল, পল্লীর পাপিয়া, পল্লীর বুলবুল রহস্যের গান গাহিয়া উঠিল। পল্লীবালার কণ্ঠে "Old, unhappy, far-off thing" ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। জানার দেশে না-জানার বহর বাড়িয়া গেল। যা কিছু Familiar ছিল সব আবার Unfamiliar হইয়া উঠিল। Coleridgeএর Ancient Mariner রহস্যের বাণিজ্য হইতে পণ্যসম্ভার লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। Wordsworth অস্তগামী সূর্য্যের সোণালি কিরণে, বিশাল

জলধি-বক্ষে, বিরাট আকাশ-গাত্রে ও মানবের হৃদি-পদ্মাসনে কার রাঙা চরণের সন্ধান পাইয়া আসিলেন। Shelley নিশীথ রাত্রে চিররহস্যের আগার প্রণয়-বিধুরা রাজকুমারীর বিরহের গান শুনিয়া আসিলেন। Keats কোন্ অচিন 'পরীরাজ্যের' দেশে গমন করিয়া মায়া-অট্টালিকার গবাক্ষপথে অপহৃতা রাজকুমারীর ব্যথামলিন মুখখানি দেখিয়া আসিলেন।

ইংরাজী সাহিত্যের সমসাময়িক বাঙ্গালা সাহিত্য এই অপূর্ব্ব স্পন্দন লাভ করিতে পারে নাই। গতানুগতিকের পন্থা পরিত্যাগ করিয়া যে সাহিত্যসৃষ্টি, সে আমরা দেখিতে পাই সর্ব্বপ্রথম বঙ্কিমচন্দ্রে। একটা অসাড়, পরাধীন, মৃতকল্প জাতিকে আত্মমর্য্যাদায় জাগাইয়া তুলিতে হইলে যে সাধনা আবশ্যক, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল। সেই সাধনা সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যসৃষ্টিতে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইংরাজী সাহিত্যে Sir Walter Scott যেমন তাঁর জন্মভূমির অতীত গৌরব-কাহিনী লইয়া অমর সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ইতিহাসের নীরস ঊষর পথ পরিত্যাগ করিয়া কল্পনার বিচিত্র লীলা-লাবণ্যে সৃষ্টিকে অপূর্ব্ব ও অনবদ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র সেইরূপ ভস্মস্তূপ-কল্প প্রাণহীন জাতির ভিতর দিয়া তাঁর Romantic প্রতিভার কল্পনা-মন্দাকিনী প্রবাহিত করিয়াছিলেন, বাস্তবের সহিত স্বপ্নের মণিকাঞ্চন যোগ সংঘটিত হইয়াছিল।।

ইংরাজী সাহিত্যে Romanticism বলিয়া যে জিনিস সাহিত্য-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে, তাহার ইতিকথা ও আত্মকথা অতি সহজ ও সরল। এমন দিন ছিল যখন কাব্যের ভাষা ও অলঙ্কারই ছিল রাজাধিরাজ। কাব্যের বা সাহিত্যের লীলা-অংশই যে প্রধান বস্তু এ কথা বুঝিবার সমজদার ছিল না। তাই কতকগুলি মামুলী ধরাবাঁধা আইনের মাপকাঠি দিয়াই তাহার বিচার হইত। নাগরিক জীবন, রাজা-মহারাজার কাহিনী, এই সমস্ত হইবে সাহিত্যের আখ্যানবস্তু। গরীবের ভগ্নকুটীরে, ধানের ক্ষেতে, 'বনরাজি-নীলা' গ্রাম্য-প্রকৃতির মধ্যে যে কোন কিছু আছে, সে ছিল ধারণার অতীত। এই কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণাই "Romantic Movement" নামে ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে বিখ্যাত। জটিলের বিরুদ্ধে সরলের অভিযান, দাসত্বের বিরুদ্ধে মুক্তির সংগ্রাম, নাগরিক আবহাওয়ার বিরুদ্ধে পল্লীর শান্তি-শ্রীর বিদ্রোহ, কৃত্রিম সভ্যতার বিরুদ্ধে মানবাত্মার চির-বিরোধই এই Romanticismএর ভিতরকার বস্তু। ভিন্ন ভিন্ন সমজদার একে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ এর নাম দিয়াছেন "Return of Nature," কেহ বলিয়াছেন "Renaissance of Wonder"। যিনি যে অভিজ্ঞান একে দিয়া থাকুন, তাহার দ্বারা ঐ একই জিনিসকেই বুঝিতে পারা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের আসরে এই Romanticismকে পরিপূর্ণ রূপ দান করিতে পারেন নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর রমন্যাস বা রহস্যবাদের প্রভাবে তিনি প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তৎকালীন বাঙ্গালা ভাষায় একে কায়েমী মৌরশী স্বত্ব দান করিতে পারেন নাই। কিন্তু উচ্ছেদযোগ্য কোর্ফা প্রজা হইয়াও পরবর্ত্তী কালে এ নিজের পুরুষানুক্রমে ভোগ-দখলের যোগ্য স্বত্ব সাব্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। আমরা দেখিতে পাই, "কপাল-কুণ্ডলার" Romanticismএর অতি বড় একটা element বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিপাদ্য বিষয় হইয়াছে। সুদূর সাগর-পারে মনুষ্যসমাগমহীন নির্জ্জন বনে স্বভাবের শিশু কপাল-কুণ্ডলা স্বভাবের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইতেছেন। প্রকৃতি তাঁর কাছে "Both Law and Impulse"। কৃত্রিম সভ্যতা হইতে দূরে প্রতি পদে সমাজের নিষেধের গণ্ডীর পরপারে একটি নারীপ্রকৃতি কী ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে, ইহাই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টিতত্ত্ব। কপাল-কুণ্ডলাকে মনে পড়িতে Wordsworthএর Lucyকে মনে পড়ে। একের সহিত অন্যের পার্থক্যও অনেক, মিলও প্রচুর। কোন্ স্বর্ণ-উষায় মূর্ত্তিমান রহস্যের মত বনানি উজ্জ্বল করিয়া নবকুমার প্রকৃতিবালার সম্মুখীন হইয়াছিল, যার তড়িৎস্পর্শে মায়াবী যাদুকরের মায়াদণ্ড-স্পর্শের ন্যায় সৃষ্টির সেরা রমণী-কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হইল, "পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ!" অয়ি, রহস্যময়ি! তোমার রহস্যের পরপারে পাড়ি দিবার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই! তুমি তোমার রহস্যের পাথারে আমাদের চির-কালের জন্য ডুবাইয়া রাখ।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্ত্তী কালে বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথের

কাব্যে এই Romantic element অপূর্ব্বভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। বস্তুতঃ, বাঙ্গালা সাহিত্যকে রবীন্দ্র-নাথই এই মহাগৌরব দান করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ভাষা ও অলঙ্কারের কারাগার হইতে ভাবকে স্বাধীনতা দান করিয়া মুক্ত বাতাসে আনয়ন করিয়াছেন। সমাস-সন্ধি-গুরুগম্ভীর কাব্যাবলীকে পেন্‌সন দিয়া সহজ, সরল সাদাসিদা, গ্রাম্য, চলিত কথাকে উচ্চপদে বহাল করিয়াছেন। সাহিত্যের প্রাণ যে গভীর অনুভূতি, স্বাধীন-উদার চিন্তা, সমৃদ্ধ কল্পনা, এ সত্য রবীন্দ্রনাথ পূর্ণমাত্রায় দেখাইয়াছেন। পল্লীর জীবনে যে সহজ সৌন্দর্য্য আছে, পল্লীবালার হৃদয়ে যে মধু আছে, মহাপ্রাণতা আছে, পল্লীর স্তরে স্তরে যে কবিতা গাথা আছে, তাহা তিনি একে একে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। Material Civilization যে মানুষকে অ-মানুষ ক'রে দেয়, সুন্দরকে সিংহাসনচ্যুত করে, শিবকে বিদায় করে দেয়, সত্যকে কাছে ঘেঁসতে দেয় না, এ রবীন্দ্রনাথের কাব্যের অন্তঃস্থল। এই যে সহজ সৃষ্টি, সহজ Expression, ইহাই কেবল রবীন্দ্রনাথের Romanticism নয়। রবীন্দ্রনাথের উপর প্রাচ্যের বৈষ্ণব কবির যে প্রভাব, তাহাতে প্রতীচ্যের Romanticism অনুপ্রাণিত হইয়া এক অভিনব কাব্য সৃষ্টি হইয়াছে। Wordsworth রামধনুর অন্তঃপুরে যে রহস্যের সন্ধান পাইয়াছেন, সেখানে প্রেমময় পরমপুরুষকে টানিয়া আনেন নাই। কিংবা Highland Girlএর সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে

"এসেছিলো নীরব রাতে,
বীণাখানি ছিল হাতে"

এরূপ কোন ভাবের অবতারণা করেন নাই। বস্তুতঃ, রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বতোমুখী ভাবধারা ছুটিয়াছে শুধু সকল রহস্যের যে শেষ রহস্য তার সন্ধানে!

"সেথা কে পারিত
ল'য়ে যেতে, তুমি ছাড়া, করি' অবারিত
লক্ষ্মীর বিলাসপুরী—অমর-ভুবনে!
অনন্ত বসন্তে যেথা নিত্য পুষ্পবনে
নিত্য চন্দ্রালোকে ইন্দ্রনীল শৈলমূলে
সুবর্ণ সরোজফুল্ল সরোবর কূলে
মণিহর্ম্ম্যে অসীম-সম্পদে নিমগনা
কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহ-বেদনা।"

এই যে একটা mystic element, একটা রহস্যের ইঙ্গিত, এ রবীন্দ্র-কাব্যের বিশেষত্ব। পারসীক মহাকবি হাফেজ যেমন Human Soul ও Godএর সম্পর্ককে আশেক-মাশুকের হিসাবে তাঁর অমর কবিতার ভিতর দিয়া দেখাইয়াছেন, Mystic রবীন্দ্রনাথও Sufeeismএর সে প্রভাবে অনুপ্রাণিত; তাঁর প্রেমাস্পদ কখন নিশীথযোগে তাঁর শিয়রে আসিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁর মালার পরশ বুকে লাগিয়াছিল, এবং তাঁর আগমনের শত চিহ্ন তিনি ফেলিয়া গিয়াছেন। কখন তিনি রহস্যময়ী নারী, চির-বিরহ-বিধুরা, "জগতের নদী-গিরি সকলের শেষে" তাঁর প্রেম-অমরাবতী, সেখান হইতে চিরকালের জন্য আমরা নির্ব্বাসিত হইয়াছি। কার শাপে আমাদের এই ব্যবধান? তার সেই দূর বাতায়নে "কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে" শুধু কল্পনাকেই পাঠান যায়!

কবি বা শিল্পীর লীলাভূমি হইতেছে 'মানুষ' ও 'প্রকৃতি'। কোন কবি এই 'মানুষ' ও 'প্রকৃতি'র যা দেখে, তাই লিখে যায় বা নিপুণ তুলিকায় আঁকে। একটা ফুল, সে ত সুন্দর, সুতরাং তার যে ছবি তোলা হয় সেও সুন্দর, তাতে হয় তো বাহাদুরীও কম নয়। কিন্তু প্রকৃত শিল্পীর কাজ ঐখানেই শেষ হয় না। Romantic কবিদের মতে ঐ ছবিতে তাকে যোগ করতে হবে

"The Light that never was on land or Sea.
The Consecration and the poet's dream."

রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেক কবিতা, প্রত্যেক লেখার ভিতরে এইটিরই উপস্থিতি দেখিতে পাওয়া যায়।) জগতের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি লইয়াই তিনি কাব্য-সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু এ সংসারের প্রত্যেক প্রাণীটি যেন স্বপ্নের দেশ হইতে কার আশীর্ব্বাদের বরমাল্য ধারণ করিয়া আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ 'এই সূর্য্যকরে, এই পুষ্পিত কাননে' তাঁর ঘর বাঁধিতে চাহিয়াছেন। 'জীবন্ত হৃদয় মাঝে' তিনি স্থান কামনা করেন। পৃথিবীতে যে চির-তরঙ্গিত প্রাণের খেলা, কত বিরহ, মিলন, কত হাসি-অশ্রু,

মানবের এই সুখে দুঃখে সঙ্গীত গাঁথিয়া তিনি অমর-আলয় রচনা করিতে চাহেন। তাই 'ধনীর দুয়ারে' কাঙ্গালিনী মেয়েকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন 'তবে আজ কিসের উৎসব!'

"দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লানমুখ বিষাদে বিরস,—
তবে মিছে সহকার-শাখা,
তবে মিছে মঙ্গল-কলস।"

এর Suggestiveness কত গভীর; অথচ প্রকাশের ক্ষমতা কত সহজ ও সুন্দর। অন্য কেহ হইলে হয় তো কাঁদিয়াই ভাসাইত; আর কান্নার পরে থাকে কী, ঐখানেই এর সমাধি হইত।

দিনের আলো যখন নিবে এলো, সূর্য্য যখন ডোবে ডোবে, চাঁদের লোভে আকাশ ঘিরে মেঘ সব জুটেছে, এমন সময় ও-পারেতে বিষ্টি এলো, গাছপালা সব ঝাপ্‌সা, যা মনে ক'রে দেয়—ছেলেবেলার গান, সেই "বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর ন'দী এলো বান।" এই যে একটা বৃষ্টিভরা বাদ্‌লা হাওয়ার আসন্ন সন্ধ্যার একটি ছবি, এ যেন একটা কুহকের রাজ্য সৃষ্টি করে দেয় যেখানে প্রবেশ করিলে শিশু হইয়া প্রবেশ করিতে হয়। নাগরিক সভ্যতার কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে পল্লীর সহজ, সুন্দর শান্তি-শ্রীর যে বিদ্রোহ, তা রবীন্দ্রনাথের "বধূ" কবিতায় এক মনোরম বেশে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। পল্লীর বালিকা আজ সহরের বধূ হইয়াছে।

"হায়রে রাজধানী পাষাণকায়া!
বিরাট মুঠিতলে চাপিছে দৃঢ়বলে,
ব্যাকুল বালিকারে নাহিকো মায়া!
কোথা সে খোলা মাঠ, উদার পথ ঘাট,
পাখীর গান কই, বনের ছায়া!"

আজ সবার মাঝে বালিকা একেলা ফিরিতেছে, কেমন ক'রে তার সারাটা বেলা কাটে! ইঁটের 'পরে ইঁট রহিয়াছে, তার মাঝে মানুষ কীট; এখানে না আছে ভালোবাসা, না আছে খেলা। "বেলা যে প'ড়ে এলো, জল্‌কে চল্।" সে মায়া-কণ্ঠের আহ্বান কোথায়?

আবার গরীবের ভিতরে যে মহাপ্রাণতা আছে, তার জীবনের ছোট কাহিনীও যে কাব্যের গৌরবান্বিত আসরে একটু জায়গা পেতে পারে, সে যে উপেক্ষার বস্তু নয়, তা রবীন্দ্রনাথের "পুরাতন ভৃত্য" প্রভৃতি কবিতায় বেশ দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্ববর্ত্তীদের কেহ অনুপ্রাসের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছেন, কেহ চিতোরের মহীয়সী পদ্মিনীর সমর-অভিযান দেখিতেছেন। কেহ বা "মধুকরী কল্পনার" সাহায্যে প্রাচ্যের ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি এবং প্রতীচ্যের হোমার, ভার্জ্জিল, দান্তে, মিল্‌টন প্রভৃতি কবির "চিত্ত-ফুলবন" হইতে মধু হইয়া অপূর্ব্ব "মধুচক্র" রচনা করিয়াছেন "গৌড় জন যাহে আনন্দে করিবে পান' সুধা নিরবধি"। কেহ ভগ্নোত্তম দেবগণের সহিত বৃত্তাসুর-বধের মন্ত্রণা করিতেছেন, আবার কেহ "ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের" আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতেছেন। এ ত সব বড় লোকের বড় কথা। গরীবের আসন চিরদিনই ধূলায়। সেই ধূলা হইতে তাহাকে তুলিয়া মহামহিমান্বিত মঞ্চে যিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সে এই রবীন্দ্রনাথ। অত্যাচারী জমিদার গরীবের 'দুই বিঘা জমি' কেড়ে নিয়ে গেল, তার অস্থিমজ্জার 'পর আরাম-বাগ তৈয়ার করিল, এ যে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারের মতই, তথাপি কাব্যসংসারে এ কথা কেউ মুখ ফুটিয়া বলিবেন না। রবীন্দ্রনাথ কাব্যের এই কলঙ্ক মোচন করিয়াছেন। তাঁর দুর্ভাগা দেশ কতজনকে অপমান করিয়াছে, কত ভাইকে মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, মানুষের প্রাণের ঠাকুরকে ঘৃণা করিয়াছে, সেই অজ্ঞান-আঁধারে আচ্ছন্ন দেশবাসীর প্রতি তাঁহার বাণী কী অপূর্ব্ব!

"তবু নত করি' আঁখি
দেখিবারে পাও না কি
নেমেছে ধূলার তলে হীন পতিতের ভগবান্!
সবারে না যদি ডাকো,
এখনো সরিয়া থাকো,
আপনারে বেঁধে রাখো চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান।
মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান॥"

Romanticismএর আর একটা লক্ষণ হইতেছে 'স্বাধীনতা'। "Liberty, Equality and Fraternity"

এই ত্রিবিধ মন্ত্রে জগতে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। সারা জগৎ অতীতের বিবিধ সংস্কারের চাপে নিপীড়িত হইতেছিল। একটা মুক্তি, একটা খোলা হাওয়া, একটা পক্ষের বিস্তার, একটা হৃদয়-স্পন্দন, এর জন্য বিশ্বমানব ব্যাকুল হইয়াছিল। এক স্বর্ণ উষায় France তার মুক্তি-সংগ্রামের জয়-পতাকা ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিল। ফ্রান্সে যাহা রাজনীতিক্ষেত্রে দেখা দিল, জারমানীতে তাহা Transcendentalism নামে দার্শনিক চিন্তা-রাজ্যে আত্মপ্রকাশ করিল, এবং একই ভাবধারা ইংলণ্ডের সাহিত্য-জগৎকে নূতন করিয়া গড়িয়া দিল। এই যে স্বাধীনতা, এই আলো-বাতাসের কামনা রবীন্দ্র কাব্যে সংযম ও উচ্ছ্বাসের ভিতর দিয়া মহামহিম মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের দেশ গৃহে পরাধীন, বাহিরে পরাধীন। তিনি গৃহের পরাধীনতাকেই প্রকৃত পরাধীনতা বলিয়াছেন। এ'কে দূর করিতে পারিলে বাহিরের পরাধীনতা আপনা হইতেই আত্ম-নির্ব্বাসন-দণ্ড গ্রহণ করিবে। তাই তাঁর কবি-প্রতিভার পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাইয়া দেশবাসীর কাছে সেই স্বাধীন প্রভাতের অদূরবর্ত্তী ভবিষ্যৎ মূর্ত্তি ঘোষিত করিয়াছেন—

"সে দিন প্রভাতে নূতন তপন
নূতন জীবন করিবে বপন,
এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন,
আসিবে সেদিন, আসিবে।"

রবীন্দ্রনাথ মানুষকে মানুষ বলিয়াই জানিয়াছেন। তিনি সামাজিক, রাজনৈতিক, কিংবা ভৌগোলিক কোন প্রকার সীমার মধ্যে তার সসীম-অসীমত্বকে বেড়ী দিয়া আটকাইয়া রাখেন নাই। তিনি ভারতের মহা-মানবের সাগর-তীরে দাঁড়াইয়া আর্য্য, অনার্য্য, দ্রাবিড়, চীন, মোগল, পাঠান সকলেরই মহা-সমন্বয় দেখিতে পাইয়াছেন। পশ্চিমে আজি দ্বার খুলিয়াছে, সেখান হইতেও বহু উপহার আনিতে হইবে, তবে ত সবার স্পর্শে পবিত্র-করা তীর্থনীরে মঙ্গলঘট পূর্ণ হইবে।

রমন্যাসে সৌন্দর্য্যের স্থান অতি উচ্চে। ইংরাজী সাহিত্যে romantic poetগণ, বিশেষ করে Shelley ও Keats এই সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি অনবদ্য ও অতুলনীয়। তাঁহার "উর্ব্বশী" সৌন্দর্য্যের 'পীরামিড'। "চাঁদের হাসি, তারকার চাহনি, আকাশের নীলিমা, মলয়ার হিল্লোল, কোকিলের কণ্ঠ, বুলবুলের গান, পত্রের মর্ম্মর-ধ্বনি, ফুলের মধুরিমা, ঝরণার কলকল গীতি, প্রেমিকার হৃদয়-মধু, জগতে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মধুর, সকলেরই উৎস-মুখ—আদিম বাসন্তান এই উর্ব্বশী! সৃষ্টির উষায় মন্থিত সাগরে অনন্ত-যৌবনা উর্ব্বশী সেই যে সর্ব্বপ্রথম আমাদের সম্মুখে উপনীত হইলেন, তার পর তাঁকে আর একদিনের জন্যও বিদায় করিয়া দিই নাই। উর্ব্বশী কোনো কালে মুকুলিকা বালিকা বয়সী ছিলেন কি না জানি না! তিনি আঁধার-পাথার-তলে কার ঘরে একেলা বসিয়া মাণিক মুকুতা লইয়া শৈশবের খেলা করিয়াছেন? আমরা যখন তাঁর পরিচয় পাই, তখন তিনি 'যৌবনে গঠিতা' 'পূর্ণ প্রস্ফুটিতা।' এই বিলোল-হিল্লোল উর্ব্বশী দেবরাজের সভায় যখন নৃত্য করেন, তখন সেই ছন্দে ছন্দে সিন্ধু মাঝে তরঙ্গের দল নাচিয়া উঠে। জগতের অশ্রুধারে তাঁর তনুর তনিমা ধৌত হয়। তাঁর পায়ের আলতা ত্রিলোকের হৃদিরক্তে তৈরী। তিনি মুক্তবেণী ও বিবসনে বিকশিত বিশ্ব-বাসনার অরবিন্দ-মাঝখানে আপনার অতি লঘুভার পাদপদ্ম রাখিয়াছেন। নিখিল মানবের হৃদয় তাঁর রঙ্গভূমি; তিনি স্বপ্নসঙ্গিনী। উর্ব্বশী যুগযুগান্তর হইতে বিশ্বের প্রেয়সী, কিন্তু বিশ্ব রহস্যজাল ভেদ করিয়া কখনও তাঁকে পায় নাই, তিনি স্বর্গের উদয়াচলে মূর্ত্তিমতী রহস্যরূপেই চিরবিরাজমানা আছেন। কবি-প্রাণ তার জন্য সদা ব্যাকুল

"মুনিগণ ধ্যান ভাঙি' দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমারি কটাক্ষপাতে ত্রিভুবন যৌবন-চঞ্চল,
তোমার মদিরগন্ধ অন্ধ বায়ু বহে চারিভিতে,
মধুমত্ত ভৃঙ্গসম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধ চিতে
উদ্দাম সঙ্গীতে।"

কিন্তু হায়, সেই আকুল-অঞ্চলা, বিদ্যুৎ-চঞ্চলা, নিষ্ঠুরা, বধিরা উর্ব্বশী নূপুর বাজাইয়া কোথায় চলিয়া যায়।

যে-কোন সৃষ্টির পশ্চাতে যে শিল্পীর সাধনাটাই বড়, শিল্পীর স্বপ্ন-যোগ না হলে তার সৃষ্টি যে রাঙা হ'য়ে ফুটতে পারে না, রহস্যবাদের কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর "মানসী" নামক চতুর্দ্দশপদী কবিতায় নারীসৃষ্টি প্রসঙ্গে তার ইঙ্গিত করিয়াছেন

"শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী।
পুরুষ গ'ড়েছে তোরে সৌন্দর্য্য সঞ্চারি'
আপন অন্তর হ'তে। বসি' কবিগণ
সোণার উপমাসূত্রে বুনিছে বসন।
সঁপিয়া তোমার 'পরে নূতন মহিমা
অমর করিছে শিল্পী তোমার প্রতিমা।
কতো বর্ণ কতো গন্ধ ভূষণ কতো না,
সিন্ধু হ'তে মুক্তা আসে খনি হ'তে সোণা,
বসন্তের বন হ'তে আসে পুষ্পভার,
চরণ রাঙাতে কীট দেয় প্রাণ তা'র।
লজ্জা দিয়ে, সজ্জা দিয়ে, দিয়ে আবরণ,
তোমারে দুর্লভ কবি' ক'রেছে গোপন।
প'ড়েছে তোমার 'পরে প্রদীপ্ত বাসনা;
অর্দ্ধেক মানবী তুমি অর্দ্ধেক কল্পনা।"

কবি যে বিশ্ব-রহস্যের বাণিজ্য করে, তা রবীন্দ্রনাথের "প্রকাশ" কবিতায় বেশ ক'রে প্রকাশ পায়। হাজার হাজার বছর কাটিয়া গিয়াছে, কেহ তো কোন কথা কহে নাই। ভ্রমর মাধবী-মঞ্জরীর আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, লতা শত আলিঙ্গনে তরুকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে, চাঁদ উঠিতেই চকোরী আনন্দিত হইয়াছে, মেঘের মধ্যে তড়িৎ খেলিয়াছে, সাগরকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া তটিনী হয়রাণ হইয়াছে, সূর্য্য উঠিতেই কমল চক্ষু মেলিয়াছে,—নবীন আষাঢ়কে চাতক আগমনী গাহিয়া আহ্বান করিয়াছে, এতো যে সব গোপন মিলন তা কবি-ই সর্ব্বপ্রথম জগৎকে বলিয়া দিয়াছেন। সে কবি লতা-পাতা-চাঁদ-মেঘ এদের সহিত এক হ'য়ে মিশে ছিল। সে মনের আড়ালে ঢাকা ও ফুলের মতন মৌন ছিল। সে চাঁদের মতন স্বপন-মাখা নয়নে চাহিতে জানিত, এবং বায়ুর মতন অলক্ষ্য মনোরথে ফিরিতে পারিত। সে মেঘের মতন আপনার মাঝে আপন ছায়া ঘনাইয়া একাকী কোণে বসিয়া—"ঘনগম্ভীর মায়া" রচনা করিতে জানিত। বিশ্ব-প্রকৃতি কবির কাছে সাবধানে ছিল না; ভাবে, ইঙ্গিতে, গানে ঘনঘন তা'র ঘোম্‌টা খসিত। বাসরঘরের বাতায়ন যদি কখন খুলিয়া যাইত কবিকে দ্বার-পাশে দেখিয়া দম্পতী দুয়ার বন্ধ করিত না। যদি কবি সে নিভৃত শয়নের পানে নয়ন তুলিয়া চাহিত, তাহা হইলে শিয়রের দীপ নিবাইতে কেহ ফুল-ধূলি ছুঁড়িত না!

জগতের যা কিছু প্রেয়,—জীবন, যৌবন, ধন, মান, সবই কালস্রোতে ভাসিয়া যায়। তাই সম্রাট শা-জাহান কালের কপোলতলে এক বিন্দু নয়নের জল রাখিয়া গিয়াছেন—সে তাঁর 'তাজমহল।' রবীন্দ্রনাথ তার "শা-জাহান" কবিতায় এই নশ্বরতার যে মনোজ্ঞ ছবি দিয়াছেন, তাহা তাঁহার রহস্যবাদ আলোচনা-প্রসঙ্গে আপনাদিকে উপহার না দিয়া থাকিতে পারিলাম না

"হায় ওরে মানব-হৃদয়
... ...
দক্ষিণের মন্ত্র-গুঞ্জরণে
তব কুঞ্জবনে
বসন্তের মাধবী মঞ্জরী
যেইক্ষণে দেয় ভরি'
মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল,
বিদায় গোধূলি আসে ধূলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল।
সময় যে নাই,
আবার শিশির রাত্রে তাই
নিকুঞ্জে ফুটায়ে তোলো নব কুন্দরাজি
সাজাইতে হেমন্তের অশ্রুভরা আনন্দের সাজি।
হায় রে হৃদয়,
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথ-প্রান্তে ফেলে যেতে হয়।
নাই নাই, নাই—যে সময়।

এই ক্ষণভঙ্গুরতা চিন্তা করিয়াই সম্রাট তাঁর সৃষ্টির বিস্ময় 'তাজমহল' নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইচ্ছা, সৌন্দর্য্যে ভুলাইয়া সময়ের হৃদয় হরণ করিবেন। সম্রাট-প্রণয়িনী আজ যে দেশে আছেন, সে এক "Undiscover'd Country, from whose bourne no traveller ever returns." কিন্তু সেখানে কবির অবাধ গতি, তাই সম্রাটের দূত অমলিন, শ্রান্তি-ক্লান্তি-হীন একস্বরে চিরবিরহীর বাণী লইয়া সে দেশে গিয়া পৌঁছিয়াছে—কবি তাহা আমাদিগকে জানাইতেছেন

"হে সম্রাট্ কবি,
এই তব হৃদয়ের ছবি,
এই তব নব মেঘদূত,
অপূর্ব্ব অদ্ভুত

ছন্দে গানে
উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে
যেথা তব বিরহিণী প্রিয়া
র'য়েছে মিশিয়া
প্রভাতের অরুণ-আভাসে
ক্লান্ত-সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ-নিশ্বাসে,
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্য-বিলাসে,
ভাষার অতীত তীরে
কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হ'তে আসে ফিরে ফিরে।
তোমার সৌন্দর্য্যদূত যুগ যুগ ধরি'
এড়াইয়া কালের প্রহরী
চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্ত্তা নিয়া
"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"

রবীন্দ্রনাথের সম-সাময়িক কোন কবি কিংবা তাঁহার পদাঙ্কানুবর্ত্তীদের মধ্যে কেহ বাঙ্গালা সাহিত্যে এই অপূর্ব্ব romanticism সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। কাজেই প্রবন্ধের উপসংহারে তাঁদের আলোচনায় বিরত রহিলাম। রবীন্দ্র-শিষ্যগণের মধ্যে একমাত্র শরৎচন্দ্রের অমর নাম এ স্থলে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি। গুরুর প্রতিভার প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া শরৎচন্দ্রের প্রতিভা একটী নির্দ্দিষ্ট বিরাট-বিশাল ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। এই সাধনায় তিনি তাঁর বিশ্ব-বিজয়ী গুরুকেও ছাড়াইয়া চলিয়াছেন। মানুষের মন যদি জগতের সব চাইতে বড় রহস্য হয়, তাহা হইলে সেই মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে শরৎচন্দ্র যে নিপুণতা দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে অপূর্ব্ব romantic seer বলিতে হইবে। আদিম বসন্ত-প্রভাত হইতে যে-ভাব বিশ্ব-মানবের মধ্যে যুগে যুগে রূপে রসে পুষ্পে ফলে সুশোভিত হইয়া আসিয়াছে, চির-পুরাতন, অথচ চির-নূতন সেই ভাবরাজির রহস্যময় লীলা-মাধুর্য্য সহজ, সরল ভাবে যে শিল্পী আমাদের সামনে উপস্থিত করিয়াছেন সে শরৎচন্দ্র। সারা পৃথিবীর লোকের যে উৎসবে নিমন্ত্রণ, তার ভাঁড়ারের চাবি গোলমাল হইতে পারে; নিমন্ত্রিতদের ভোজের অসুবিধা হইতে পারে। কিন্তু শরৎচন্দ্র সে প্রকারের দায়িত্ব নিয়ে ভোজের নিমন্ত্রণ করেন নাই। যে কুটীরের যে চাবি তাই দিয়াই তিনি তাকে খুলিয়াছেন, তার অন্তরের সম্পদকে বাহির করিয়া দিয়াছেন। তাঁর এক একখানি উপন্যাস এক একটি জীবন-রহস্য।

আজ প্রবন্ধের অন্তগিরিতে নামিয়া শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আর কিছু বলিতে চাই না। আলোচ্য প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্ব্বে আমার কৌতূহল হইতেছে যে, আপনাদের মধ্যে কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এত কথার পরেও কি Romanticism অথবা Mysticism কী বস্তু, তার মীমাংসা হ'য়েছে? আমার উত্তর হইবে এই—কবি যা সৃষ্টি করেন সে একটা atmosphere মাত্র, তাকে ধরা যায় না, সে কেবল অনুভবের বস্তু। রামধনুকে খুলিয়া দেখাইতে হইলে তাহাকে ঐ "dull catalogue of comnon things" এর মধ্যে নিয়ে ফেল্‌তে হয়, তাতে তার রামধনুত্ব ঘুচে যায়। ফুলকে দেখেই আনন্দ, তার পাপড়ীগুলি চিরে একটি একটি করিয়া দেখাইলে, তার ফুলজীবন ব্যর্থ হয়, দেখার গৌরবও মাঠে মারা যায়।

স্রষ্টার সৃষ্টির মধ্যে একটা কুহকের রাজ্য, একটা মায়া-মরীচিকা, একটা ইন্দ্রজাল, একটা যাকে-ধর্‌তে-চাওয়া-যায়-অথচ-ধরা-যায়-না অপূর্ব্ব ও অভূতপূর্ব্বভাবে আত্ম-প্রকাশ করে। রসজ্ঞ সমজদার কতক পেয়ে—কতক না পেয়ে কেমন একটা বিপুল পরিতৃপ্তিতে এই সৃষ্টির লীলামাধুর্য্য সন্দর্শন করেন। সুন্দর কিছু দেখ্‌লে, মধুর কিছু শুন্‌লে, মনে যে কেমন এক ভাবের উদয় হয়, তাকে analyse করা যায় না, তাকে উপলব্ধি কর্‌তে হয়। কাব্যের সৌন্দর্য্য চুলচেরা analysisএ ফুটে উঠে না, তার হৃদয়-ঐশ্বর্য্য আপন গৌরবে দেখা দেয় যখন সে সৃষ্টির সুমেরু-শিখরে নিরুপদ্রবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই Romantic element যেন মুক্তফলের উপর 'ছায়া', একে আপনারা সহজেই উপভোগ কর্‌তে পারেন, কিন্তু রূঢ় আলিঙ্গনের মধ্যে এ নিজেকে ধরা দেয় না। এ যেন রবীন্দ্রনাথের প্রাণপ্রিয়া, তাঁর মানসী, তাঁর সাধনার উর্ব্বশী—এ কারু মাতা নয়, কারু কন্যা নয়, কারু বধূ নয়; কোন বন্ধনের মধ্যে একে পাওয়া যায় না। অথচ এ আছে, একে প্রাণ চায়।

'পূর্ণিমা নিশিতে যবে দশ দিক পরিপূর্ণ হাসি,
দূরস্মৃতি কোথা হ'তে বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশি।'

এই এর স্বরূপ! এই এর পরিচয়!

তার পর

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল

(১৮)

সেদিন রাত্রে সরমা বিছানায় শুইয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। সকাল-বেলায় সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে সকল চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সে পড়াশুনায় মনোনিবেশ করিবে। সারা দিন সে একান্ত ভাবে সে প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছে। বই-খাতা লইয়া সে যতক্ষণ ছিল, তখন মনের ভিতর দিয়া যদিও একটা তপ্ত-উদাস বাতাস বহিতেছিল, তবু সে প্রতিজ্ঞা হইতে বিচ্যুত হয় নাই। কিন্তু এই নিঃসঙ্গ নিশীথে শয্যায় পড়িয়া তার মনে হইল অজয়ের কথা। কিছুতেই সে তার মনশ্চক্ষুর অন্তরাল করিতে পারিল না অজয়ের সেই শীত-ক্লিষ্ট দেহে দীর্ঘ রাত্রি জাগরণের চিত্র, তার রোগতপ্ত পীড়িত মুখের ছবি!

সকালবেলায় সে দেখিয়া আসিয়াছে অজয়ের দেহে খুব বেশী উত্তাপ। সারা দিন সে কোনও সংবাদ পায় নাই। না জানি কত জ্বর হইয়াছে তার! সেই এক ছোকরা ছাড়া আর তার শুশ্রূষা করিবার কেহ নাই। সেই অপরিচ্ছন্ন দোকানঘরে ভাঙ্গা খাটিয়ায় শুইয়া অজয় না জানি রোগে কত কষ্ট পাইতেছে!

ভাবিতে তার প্রাণ ছট্‌ফট্ করিয়া উঠিল। অভয়ের বাড়ী হইতে ফিরিবার সময় একবার তার মনে হইয়াছিল যে অজয়ের একটা খবর লইয়া যায়; কিন্তু প্রবল শক্তির সহিত সে আকাঙ্ক্ষা সে দমন করিয়াছিল। এখন তার মনে হইল যে দেখিয়া আসিলে ভাল হইত।

কিছুতেই সে স্বস্তি লাভ করিতে পারিল না। কোনও মতেই চোখে ঘুম টানিয়া আনিতে পারিল না।

ছট্‌ফট্ করিয়া সে শেষে উঠিয়া পড়িল। সে তার মাকে ডাকিয়া তুলিল। সুনীতি উঠিয়া বলিলেন, "কি মা? কি হ'য়েছে?"

সরমা বলিল, "কিছু নয় মা, কিছুতে ঘুম পাচ্ছে না, ছট্‌ফট্ ক'রছি। এসো মা, তোমার সঙ্গে একটু গল্প করি।"

সুনীতি বলিলেন, "ঘুম হবে কি? দিনরাত এত পড়া—এতে মাথা গরম হবে না! আয় তুই আমার কাছে এসে শো'; আমি তোকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি। মোদ্দা কাল আর আমি তোকে বই ছুঁতে দিচ্ছি নে।"

সরমা মায়ের বিছানায় শুইয়া পড়িল। সুনীতি তার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে সরমা শেষে ঘুমাইয়া পড়িল।

সকালে উঠিয়া সরমা বলিল, "মা, আজ তো পড়া মানা, চল আজ বেড়িয়ে আসি।"

সুনীতি সম্মত হইয়া বলিলেন, "বেশ তো, চল না। কোথায় যাবি?"

"বিশেষ কোথাও নয়—একটু লম্বা রাস্তায় ঘুরে আসবো।"

মোটরে করিয়া তারা বালিগঞ্জ হইতে ঢাকুরিয়া, যাদবপুর, রসা প্রভৃতি ঘুরিয়া টালিগঞ্জের পথে ফিরিতে লাগিল।

অজয়ের দোকানের কাছাকাছি আসিয়া সরমা বলিল, "মা গো, অজয়বাবুর শুনেছি বড় অসুখ, একবার দেখে যাবো?"

সুনীতি বলিলেন, "তাই না কি? কি অসুখ?"

"বড্ড না কি জ্বর হ'য়েছে।"

সুনীতি বলিলেন, "চল্ দেখে যাই।"

অজয়ের দোকানের সামনে গাড়ী থামিলে সরমা দেখিল আজও দোকানের দুয়ার বন্ধ, সুধু সেই ছোকরা পাম্পের কাছে বসিয়া আছে। সরমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল—অজয় তবে আজও অসুস্থ আছে!

সেই ছোকরাকে সরমা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু কেমন আছে?"

ছোকরা মুখ ভার করিয়া বলিল, "ভারী বেমার আছে। কাল সারা দিন জ্বরে বেহুঁস হ'য়ে ছিল।"

সরমার প্রাণের ভিতর কাঁদিয়া উঠিল। সে মাকে নামাইয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গেল দোকানের দুয়ারে। দুয়ার ভেজান ছিল, ধাক্কা দিতে খুলিয়া গেল।

সরমা ছুটিয়া অজয়ের বিছানার কাছে গেল। সুনীতি ব্যস্ত হইয়া পিছু পিছু আসিলেন।

সরমা দেখিল, অজয় ঘুমাইতেছে। সে নিঃশব্দে পা ফেলিয়া বিছানার কাছে গেল। অতি সন্তর্পণে সে অজয়ের কপালে হাত দিয়া তাপ পরীক্ষা করিল। দেখিল উত্তাপ খুব বেশী।

সরমা কপালে হাত দিতেই অজয় চক্ষু মেলিয়া চাহিল। চক্ষু দুটি লাল টক্ টক্ করিতেছে।

সুনীতি স্নিগ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কবে জ্বর হ'ল বাবা? কেমন আছ?"

অজয় বলিল, "এখন অনেকটা ভাল আছি—কিন্তু, মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে! আপনাকে কে খবর দিলে?"

সরমা অজয়ের মাথার দিকে ছিল, অজয় তাকে তখনও দেখিতে পায় নাই।

সুনীতি সরমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সরির কাছে এই শুনলাম। এত জ্বর তোমার, তোমায় দেখছে শুনছে কে?"

অজয় চোখ ফিরাইয়া সরমাকে দেখিয়া একবার চক্ষু বুজিল।

সরমার মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, তার মুখে কথা ছিল না।

অজয় ক্লিষ্টকণ্ঠে বলিল, "দেখবার লোক আছে পিসিমা। কাল একটা ডাক্তারও এসেছিল। কিন্তু আজ হাঁসপাতালে যাব ভাবছি।"

বলিয়া অজয় হাত দিয়া মাথা চাপিয়া ধরিল।

সরমা ত্রস্তেব্যস্তে অজয়ের মাথাটা দুই হাতে টিপিয়া ধরিল। শুষ্কমুখে সে বলিল, "আপনার মাথাটা ধুইয়ে দেব?"

অজয় মাথাটা নাড়া দিয়া বলিল, "দেও!—দিন।"

সরমা ছুটিয়া গিয়া সেই ছোকরাকে ডাকিল। সরমার আদেশে সে বালক এক বালতী জল ও একটা ঘটি লইয়া আসিল।

সরমা বলিল, "আপনার এ লম্বা চুলগুলো কেটে দি

অজয় বলিল, "যা ইচ্ছা কর—আর পারি নে সহ্য ক'রতে।—মাপ ক'রবেন কথার ঠিক নেই আমার।"

সেই ছোকরা একখানা কাঁচি আনিয়া দিল। সরমা কচ কচ করিয়া অজয়ের লম্বা চুলগুলি ছোট করিয়া কাটিয়া ফেলিল। তার পর সে দু'হাতে তার মাথা তুলিয়া ধরিল, সুনীতি অনেকক্ষণ ধরিয়া জল ঢালিলেন।

সরমা এদিক ওদিক চাহিয়া হাতের গোড়ায় কিছু না পাইয়া তার আঁচল দিয়া অজয়ের মাথা মুছাইয়া দিল।

অজয় বলিল, "ওঃ বাঁচলাম। মাথার কি যন্ত্রণা! আপনি বাঁচালেন আমাকে। আপনার কাপড়টা মিথ্যে ভিজালেন।"

সরমা বলিল, "তার জন্য ভাববেন না আপনি।"

সুনীতি বলিলেন, "ডাক্তার এখন আসবে কি বাবা?"

অজয় বলিল, "না, আর ডাক্তারকে খবর দিই নি। ঠিক ক'রেছি হাঁসপাতালে যাব। আমার ট্যাক্সি-ড্রাইভার এলেই যাবো।"

সরমা বলিল, "মা, ওঁকে আমাদের ওখানে নিলে হয় না?"

সুনীতি বলিলেন, "বেশ তো, সেই ভাল। চল আমরা তোমাকে নিয়ে যাই।"

অজয় বলিল, "না—না, আপনারা কেন কষ্ট ক'রবেন—আমি হাঁসপাতালে যাচ্ছি।"

সরমা বলিল, "হাঁসপাতালে গেতে ডাক্তার দেখতে অনেক দেরী হ'য়ে যাবে; চলুন না এখনকার মত—তার পর দু' একদিনে না সারে যাবেন হাঁসপাতালে। কি বল মা?"

সুনীতি বলিলেন, "হাঁ তাই ভাল। তাই চল বাবা।"

অজয় বলিল, "মাপ ক'রবেন, আপনাদের অনেক কষ্ট দিয়েছি—আর কষ্ট দেব না।"

সুনীতির তখন ঝোঁক চাপিয়া গিয়াছে, তিনি বলিলেন, "সে কিছুতেই হবে না, আমি তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি না।"

অজয় বলিল, "মাপ করুন আমায়—"

সুনীতি বলিলেন, "সেও কি একটা কথা হ'ল? তুমি চল। আমাদের ড্রাইভারকে ডাক না সরি, ওকে ধ'রে নিয়ে যাক।"

অজয় কাতরভাবে সরমার দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি, আপনি আমায় মাপ করুন—মাকে বলুন।"

সুনীতি নিজেই উঠিয়া দরজার কাছে গেলেন ড্রাইভারকে ডাকিতে। সেই অবসরে সরমা বলিল, "আপনি যা ভাবছেন সে ভয় নেই। আমি আপনাকে আর সে কথা তুলে বিরক্ত ক'রবো না। আপনার কাছেও যাব না। আপনি চলুন।"

অজয়ের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। সে বলিল, "ভুল বুঝলে দেবি,—কিন্তু কি ব'লবো আমি? উপায় নেই।"

সরমা। সে সব কথা আপনি মোটে ভাববেন না। আমি আপনাকে পরিপূর্ণরূপে মুক্তি দিয়েছি—কোনও ভয় নেই।

অজয় বলিল, "ভয়!—হাঁ ভয় বই কি?—আচ্ছা ছাড়বে না যখন—চল।"

ড্রাইভার আসিলে সে অভয়ের একপাশে দাঁড়াইল, অপর পার্শ্বে দাঁড়াইল সরমা। দু'জনে ধরাধরি করিয়া অজয়কে লইয়া গাড়ীতে উঠাইল। অজয়ের মাথা কোলে করিয়া গাড়ীর ভিতর বসিলেন সুনীতি, ড্রাইভারের পাশে বসিল সরমা।

দোকান ঘরে চাবী বন্ধ করিয়া সেই ছোকরা আসিয়া চাবী সরমার কাছে দিয়া গেল। কারখানা খোলাই রহিল।

সরমা তার পড়িবার ঘর পরিষ্কার করিয়া অজয়ের জন্য একটা খাট পাতিয়া বিছানা করিয়া দিল। টেলিফোনে ডাক্তার ডাকা হইয়াছিল, অল্পক্ষণ বাদেই ডাক্তার আসিয়া দেখিলেন।

ডাক্তার বলিলেন, "ইনফ্লুয়েঞ্জা হ'য়েছে—বুকে দোষ হবার আশঙ্কা আছে, সাবধানে শুশ্রূষা করা দরকার।"

সরমা ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সে ভাবিয়া চিন্তিয়া টেলিফোন করিয়া দিল দুইজন নার্সের জন্য। নার্স দুইজন পালা করিয়া অজয়ের শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

সারা সকালটা সরমা অজয়ের ঘরে গেল না। দ্বিপ্রহরে যখন সে সংবাদ পাইল জ্বর অত্যন্ত বাড়িয়াছে এবং অজয় একেবারে বেহুঁস হইয়া পড়িয়া আছে, তখন সে আর বাহিরে থাকিতে পারিল না, বিছানার পাশে গিয়া বসিল। জ্বরের মোহে অজয় অজ্ঞান হইয়া ঘুমাইতেছে, নার্স মাঝে মাঝে আসিয়া আইস্-ব্যাগ বদলাইয়া দিতেছে, সময়মত ঔষধ খাওয়াইতেছে। সরমা কেবল বসিয়া অজয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, আর ব্যাকুলচিত্তে ভগবানের কাছে অজয়ের রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। সুনীতিও ঘুরিয়া ফিরিয়া তাকে দেখিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার সময় জ্বরের বেগ কিছু কমিল, অজয় একবার চক্ষু মেলিল। সরমার দিকে চাহিয়া সে তার হাতখানা তার দিকে বাড়াইয়া দিল। সরমা হাতখানা দুই হাতের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া রহিল। অজয় তৃপ্তির সহিত চক্ষু বুজিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িল। পাছে তার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় সেই ভয়ে সরমা নড়িল না, হাতও ছাড়িল না।

রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত সরমা ঘুরিয়া ঘুরিয়া সংবাদ লইতে লাগিল। বারটার সময় নার্স বলিল, জ্বর বেশ কমিয়া গিয়াছে, রোগী বেশ শান্তিতে নিদ্রা যাইতেছে। তখন সরমা গিয়া নিজের ঘরে শুইয়া পড়িল। ভোর হইবার পূর্ব্বেই সরমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি গায় একখানা শাল জড়াইয়া অজয়ের ঘরে চলিয়া গেল। নার্স বলিল, জ্বর আর কমে নাই, কিন্তু রোগী বেশ শান্তভাবে ঘুমাইতেছে।

সরমা আবার অজয়ের শয্যাপার্শ্বে গিয়া বসিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার পর অজয় চক্ষু মেলিয়া চাহিল। সরমা মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছেন?"

অজয় করুণ নয়নে তার দিকে চাহিয়া রহিল। তার চোখের কোণ চক্ চক্ করিয়া উঠিল। শেষে সে বলিল, "বেশ আছি, আজ মাথার যন্ত্রণা নেই। আপনি কি সারা রাত এখানে ব'সে আছেন?"

সরমা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না, আমি ঘুমিয়েছি সারারাত, এই এখনি এসেছি।"

অজয় চুপ করিয়া রহিল। তার পর সে বলিল, "আমি স্বপ্ন দেখছিলাম যে সারা রাত আপনি আমার কাছে আমার হাত ধ'রে ব'সে আছেন।"

তার পর সে আবার বলিল, "কত কষ্ট যে দিলাম আপনাকে!"

হাসিয়া সরমা বলিল, "আমার আর কি কষ্ট বলুন, খাচ্ছি দাচ্ছি কাজকর্ম্ম ক'রছি। শুশ্রূষা তো ক'রছে নার্সেরা।"

অজয় বলিল, "সে কথা বলছি না।" আর কিছু বলিল না।

সরমা উঠিয়া মুখ হাত ধুইল। তার পর চা খাইয়া সে নিজ হস্তে অজয়ের পথ্য প্রস্তুত করিয়া লইয়া গেল।

ডাক্তার বলিয়াছিলেন দুই ঘণ্টা অন্তর পথ্য দিতে। অজয় পথ্য খাইতে বড় আপত্তি করিতেছিল। নার্সেরা অনেক বলিয়া কহিয়া একরকম জোর করিয়া তাহাকে খাওয়াইতেছিল।

এখন সরমা মুখের কাছে বাটী ধরিল, অজয় নির্ব্বিবাদে পান করিয়া ফেলিল।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার আসিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া তিনি বলিলেন, "অনেকটা ভাল; কিন্তু আজকের দিনটা না গেলে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কোন্ ভাব ধ'রবে।"

সরমা বাহিরে গিয়া তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করিল, "কোনও চিন্তার কারণ দেখলেন কি?"

ডাক্তার বলিলেন, "এবার ইনফ্লুয়েঞ্জায় ফুসফুসের দোষ প্রায় হ'চ্ছে, আর হ'লে বিশেষ চিন্তার বিষয় হয়। এঁর ফুসফুসে এখনও কোনও দোষ হয় নি, কিন্তু bronchial catarrh আছে। তা ছাড়া হৃৎপিণ্ডও খুব সবল নয়—কালকে পর্য্যন্ত দেখলে বোঝা যাবে।"

সারা দিন জ্বর খুব বেশী থাকিল। সরমা ব্যস্ত হইয়া সারা দিন কাটাইল। দ্বিপ্রহর রাত্রিতে জ্বর কমিয়া আসিল। আজ আর সরমা শুইতে গেল না। কাল অজয় বলিয়াছিল সে স্বপ্ন দেখিয়াছে সরমা তার কাছে বসিয়া আছে। তাই সে আজ বসিয়া রহিল।

সারারাত্রি অজয় পরম শান্তভাবে নিদ্রা গেল। শেষরাত্রে সরমা সন্তর্পণে গায় হাত দিয়া দেখিল, না, বেশ ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। একটা শান্তির দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া সরমা খাটের চালির উপর মাথা রাখিয়া একটু বিশ্রাম করিল। সেই অবস্থায় সে ঘুমাইয়া পড়িল।

সকাল বেলায় ঘুম ভাঙ্গিয়া অজয় দেখিল সরমা সেই অবস্থায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তার একখানা হাতে সে অজয়ের হাত ধরিয়া ছিল। তার শিথিল হস্তের উপর অজয়ের হাত পড়িয়া আছে।

তার দিকে চাহিয়া অজয় দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া হাত টানিয়া লইল, এবং পাশ ফিরিয়া সরিয়া শুইল। তাতে সরমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

অজয় বলিল, "আজও কি আপনি এই এসেছেন?"

সরমা লজ্জিতভাবে বলিল, "না, ব'সে থাকতে থাকতে এখানেই ঘুমিয়ে প'ড়েছিলাম।"

অজয় করুণ-নয়নে তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সরমা তার গায় হাত দিয়া দেখিল জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে। নার্স আসিয়া থারমোমিটার লাগাইয়া দেখিল, জ্বর আর নাই। সরমা তখন উঠিয়া বলিল, "এইবার যাচ্ছি আমি। আর আসবো না।"

ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, "যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, আমার ভয় হ'য়েছিল বুঝি broncho-pneumonia দাঁড়াবে। সৌভাগ্যক্রমে তা হয় নি। এখন আর চিন্তা নেই, কিন্তু চার পাঁচ দিন অন্ততঃ সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়া দরকার, বিছানা থেকে নড়া নিষেধ!"

ডাক্তারের মুখে এ কথা শুনিয়া সরমা নিশ্চিন্ত মনে তার পড়ার বই লইয়া বসিল। অজয়ের ঘরে আর সে গেল না। মাকে পাঠাইয়া দিল।

অজয় তাঁকে বলিল, "পিসীমা, এবারে আমার জ্বর তো ছেড়েছে, এখন আমাকে যেতে দিন।"

সুনীতি বলিলেন, "না, বাবা, ডাক্তার যে চার পাঁচ দিন শুয়ে থাকতে ব'ল্লে।"

অজয় বলিল, "ডাক্তারেরা অমন ব'লে থাকে, আর কিছু হবে না।"

সুনীতি কিছুতেই সে কথা শুনিলেন না, অজয়কে বাধ্য হইয়া থাকিতে হইল।

সেদিন সমস্ত দিন রাত্রির ভিতর সরমা একবারও

অজয়ের কাছে গেল না। পরের দিন সকালে গিয়া অজয়কে কুশল প্রশ্ন করিল।

অজয় বলিল, "আমি তো সেরে গেছি, কিন্তু আপনারা সারতে দিচ্ছেন কই?"

সরমা বলিল, "ডাক্তার বারণ ক'রেছেন, কি করি বলুন?"

অজয় বলিল, "ভারী অন্যায় ক'রছেন কিন্তু। ভারী অনিষ্ট হ'চ্ছে। আপনি বুঝতে পারছেন না, কি ব'লব?"

"কেন? আমি তো আর আপনার কাছে এসে বিরক্ত করি নি? আর, এক্ষুনি আমি চ'লে যাচ্ছি।"

উত্তেজিত ভাবে অজয় বলিল, "কেবল ইচ্ছে ক'রে আমাকে কষ্ট দেবার জন্য আপনি ঐ কথা বার বার ব'লছেন। নইলে, আপনি এলে আমি বিরক্ত হব, এ কথা আপনি কিছুতে ভাবতে পারেন না। আমি এত বড় পাপিষ্ঠ নই।"

অজয় মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল।

সরমা বলিল, "সত্যি বলছি আপনাকে কষ্ট দেবার জন্য আমি কোনও কথা বলি নি"—

বাধা দিয়া অজয় বলিল, "আপনি বুঝবেন না জানি, বোঝাতে পারবো না আপনাকে—যে কত দুঃখে আমি আপনাকে দুঃখ দিয়েছি—যদি বুঝতেন তবে ক্ষমা ক'রতেন।" অজয়ের চক্ষে জল আসিল।

অজয়ের চোখের জল মুছাইয়া সরমা স্নিগ্ধভাবে বলিল, "সে সব কথা আর কেন অজয়বাবু। সে কথা তো আমি তুলি নি, তা নিয়ে আপনার উপর আমার কোনও অভিযোগ তো নেই। তবে কেন সে কথা ভাবছেন?"

"অভিযোগ আপনি ক'রছেন না, কিন্তু আমার অন্তর দিন-রাত অভিযোগ ক'রছে। কিন্তু ভগবান জানেন, আমি যা ক'রেছি ভাল বুঝেই ক'রেছি।"

সরমা। থাক—সে কথা থাক। এখন সে সব কথায় কাজ নেই—কোনও দিনই সে কথা তুলে আর কাজ নেই। যা' হবার হ'য়ে গেছে, ভগবানের যা' ইচ্ছা ছিল তাই হ'য়েছে। আমি সত্যি বলছি আমার তা নিয়ে কোনও অনুযোগ কি অভিযোগ নেই।"

অজয় চুপ করিল। সরমা কিছুক্ষণ তার মাথায় হাত বুলাইয়া, আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

সে আবার রীতিমত পড়াশুনা আরম্ভ করিল, কেবল ল্যাবরেটারীতে এ কয়দিন গেল না।

(১৯)

নিরুপম যখন মায়ার কাছে শুনিল যে অজয়ের সঙ্গে সরমার বাস্তবিক কোনও ভালবাসা নাই, তখন সে সহজেই সে কথা বিশ্বাস করিল। বিশেষতঃ সে ভাবিয়া দেখিল যে অজয়ের সঙ্গে সরমার যদি কোনও দোষের সম্পর্ক থাকিত তবে সরমা অজয়কে বাড়ীতে আনিত না। কেন না বাড়ীতে সুনীতি আছেন। সুনীতির চক্ষের সম্মুখে সরমা যে এতবড় অপকার্য্য করিতে সাহস করিবে এমন তার মনে হইল না। তার মন এইরূপ চিন্তার অনুকূল হওয়ায় ক্রমে আরও এই সিদ্ধান্তের পক্ষে সহস্র যুক্তি তার মনে সারবন্দী হইয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু অজয় যে নিরুপমের প্রণয়ের পথে বিঘ্ন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সে কথা মায়া নিজেই বলিয়াছে। মায়া বলিয়াছে অজয় সরমার মন অনেকটা নরম করিয়া ফেলিয়াছে।

এ কথায় নিরুপমের ভয়ানক রাগ হইল সরমার উপর এবং অজয়ের উপর। সরমার উপর রাগের কারণ এই যে নিরুপমের মত যোগ্য পাত্র সম্মুখে থাকিতে সরমার মন অজয়ের উপর পড়ে কেন? অজয়ের সঙ্গে নিরুপমের তুলনা? এ কল্পনাই যে নিরুপমের পক্ষে অসম্মানজনক! নিরুপম ভাবিল সরমাকে ভালরকমে শিক্ষা দেওয়া দরকার।

সে গত কয়েক দিন হইতেই সরমাকে শিক্ষা দিবার উপায় চিন্তা করিতেছিল। আজ মায়ার কাছে কথাটা শুনিয়া সে আরও গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিল। মায়া তার নিজের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়াই বলিয়াছে যে, যদি তার চোখের সামনে অজয় তাকে পরাজিত করিয়া সরমাকে লইয়া যায়, সে তার পক্ষে একটা ভয়ানক লজ্জার কথা, আর সে যদি হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিয়া এমন একটা কাণ্ড হইতে দেয় তবে সে কাপুরুষ। কিছুতেই সে ইহা হইতে দিতে পারে না।

মায়ার মনের ইচ্ছা এই ছিল যে নিরুপম সরমাকে জয় করিবার জন্য সরমার মন কাড়িবার চেষ্টা করুক। নিরুপমের চিন্তা সে ধারায় গেল না। সে ভাবিতে লাগিল অজয়কে

কোনও রকমে নির্য্যাতন করিয়া—অপমান করিয়া তার পথ হইতে তাড়াইতে হইবে। এবং তার সহজেই মনে হইল যে অজয়ের নামে একটা ফৌজদারী মোকদ্দমা করিয়া তাকে জেলে দিতে পারিলেই এ কার্য্যটি সৌষ্ঠবের সহিত সম্পন্ন হইবে। তাতে এক ঢিলে দুই পাখী মরিবে—অজয়ের উপর বৈর-নির্য্যাতন করা হইবে, সরমাকে জব্দ করা হইবে।

এ কথা তার আগেও মনে হইয়াছিল, কিন্তু ভাবিয়া সে কোনও উপায় করিতে পারে নাই। অজয়ের পূর্ব্ব-জীবনের কথা তার কিছু জানা ছিল না। কার সঙ্গে তার কি কারবার আছে তাহা সে জানিত না। তার মনে কোনও সন্দেহ ছিল না যে, সেই সময় অজয় যাদের সঙ্গে কারবার করিত তাদের কাছে অনুসন্ধান করিলে হীরালাল আগরওয়ালার মামলার মত আর দুই চারটি মামলার খোঁজ সে অনায়াসে পাইতে পারিবে। কিন্তু সে খোঁজের সূত্র সে ধরিতে পারে নাই। আজ মায়ার কাছে কথাটা শুনিয়া অবধি সে গভীর ভাবে বিষয়টা লইয়া চিন্তা করিল। তার বুদ্ধি আরও তীব্র অনুসন্ধিৎসার সহিত এই খাতে প্রবাহিত হইল।

কাছারীতে গিয়া তার মনে হইল হীরালাল আগরওয়ালার কাছে অনুসন্ধান করিলে তার কাছে হয় তো কোনও সূত্র পাওয়া যাইতে পারে। অজয়ের সঙ্গে যেকালে তার খুব হৃদ্যতা ছিল, সে তার গতিবিধির সন্ধান রাখিবার কথা।

এই স্থির করিয়া সে হীরালালের কাছে যাইয়া তাকে জিজ্ঞাসা করিবার সঙ্কল্প করিল। হীরালালের যিনি উকীল ছিলেন তাকে লইয়া সে হীরালালের কাছে গেল। কিন্তু শুনিতে পাইল হীরালাল কলিকাতায় নাই—চার পাঁচ দিন বাদে আসিবে।

উপায় নাই—এ পাঁচ দিন অপেক্ষা করিতেই হইবে।

হীরালালের বাড়ী হইতে ফিরিবার সময় তার সঙ্গী উকীলটি কথা-প্রসঙ্গে বলিয়া ফেলিলেন যে, অজয় আর একটা বড় অপরাধ করিয়াছিল, তাতে তার পাঁচটি বচ্ছর জেল অবধারিত ছিল; সে একটা হুণ্ডীতে কান্তিবাবুর নামে acceptance জাল করিয়া এই উকীলের প্রফ মক্কেলের কাছে টাকা ধার করিয়াছিল।

নিরুপম বলিল, "তার পর? সে অজয়কে ফৌজদারীতে দিলে না?"

"না, সে আর হ'ল কই। সে ফৌজদারী ক'রবেই ঠিক ক'রেছিল, কিন্তু অভয়বাবু তার সব টাকা শোধ ক'রে দিলে তাই আর ফৌজদারী হ'ল না।"

উত্তেজিত ভাবে নিরুপম বলিল, "ভয়ানক অন্যায়। অভয়দা প্রশ্রয় দিয়েই তো ওই কুকুরটাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। এখন পস্তাচ্ছে।"

বন্ধু উকীলটি তার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "পস্তাচ্ছে মানে? অভয়বাবু কি অজয়ের উপর চ'টেছেন না কি?"

"চটেছেন? আমার বোধ হয় এখন যদি অজয় জেলে যায় তবে তিনি আনন্দে একটা উৎসব ক'রবেন।"

"তা সে তো তাঁর হাত। রামসুখের হুণ্ডীর টাকা শোধ দিয়ে তো সে হুণ্ডী তিনিই নিয়েছেন—তাঁর কাছেই আছে। তিনি ইচ্ছা ক'রলেই এখন অজয়ের নামে forgeryর চার্জ্জ ক'রতে পারেন। তাঁকে ব'লে দেখুন না একবার।"

"Capital!" বলিয়া নিরুপম খুব জোরে তার হাঁটুর উপর করাঘাত করিল।

পরদিন সে অভয়ের কাছে গেল।

অভয়কে সে বলিল, "অভয়দা' রামসুখ মাড়োয়ারীর একখানা হুণ্ডী তোমার কাছে আছে?"

অভয় বলিল, "সে তো আমি জানি না, এটর্ণী জানেন। কিন্তু হুণ্ডী—হুণ্ডী কিসের থাকবে আমার কাছে?"

"অজয় বাবু সেই হুণ্ডী দিয়ে রামসুখের কাছে টাকা নিয়েছিল; তুমি রামসুখকে টাকা দিয়ে হুণ্ডী তোমার নামে endorse করিয়ে নিয়েছিলে?"

অভয় বলিল, "হাঁ তা' হ'তে পারে—আমি তো এ সব খবর রাখি না, এটর্ণী সব জানেন। কিন্তু কেন বল তো?"

"সে হুণ্ডীখানা জাল—অজয় তাতে কান্তিবাবুর নাম জাল ক'রেছিল।"

অভয় বলিল, "তাই না কি? তা কিন্তু অজয়বাবু সে সব শোধ ক'রে দিয়েছেন।"

"শোধ ক'রেছেন! তবে কি সে সব তুমি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছ না কি?"

"হাঁ—এটর্ণী সব দলিলপত্র তাকে ফেরত দিয়েছিলেন।

কিন্তু অজয় সেগুলো না নিয়েই চ'লে গেছে। সে বোধ হয় এখনও এটর্ণীর কাছেই আছে।"

নিরুপম বলিল, "বাঁচালে। যা' হ'ক এখন এটর্ণীর কাছ থেকে তুমি সেই হুণ্ডীখানা আনিয়ে নাও—আর একটা নালিস লাগিয়ে দাও—ওইটেই হবে অজয়ের মৃত্যুবাণ।"

অভয় হাঁ করিয়া নিরুপমের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "নালিস ক'রবো কি হে? সে সব দলিলের টাকা নিয়ে ক্যান্সেল ক'রে দিয়েছি যে—আবার নালিস কিসের?"

নিরুপম বলিল, "তাতে forgeryর দায় থেকে তার মুক্তি নেই। তুমি তাকে forgeryর জন্য ফৌজদারীতে দাও—তার পর দেখি বাছাধন কোথায় যান।"

অভয় বলিল, "তাই না কি?—না, এ কি হ'তে পারে? টাকা শোধ ক'রে দিয়ে দিলে সে, তার পর আবার ফৌজদারী কি?"

"আরে হাঁ, অভয়দা, হাঁ—আমি বলছি তুমি শুনে রাখ। কাগজখানা এনে তুমি আমাকে দাও, তার পর দেখে নিচ্ছি আমি।"

অভয় বলিল, "আচ্ছা আমি জিগ্‌গেস ক'রে দেখবো এটর্ণীকে। আর ক'টা দিন যাক।"

"আবার ক'টা দিন যাক কেন? আজই নিয়ে এসো, কাল নালিস রুজু ক'রে দি। বাছাধনের ট্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই সব মিটে যাক।"

অভয় বলিল, "বেশী নয়, আর পাঁচ সাত দিন যাক না।"

অভয় ভাবিতেছিল যে অজয় যদি তার চিঠি পাইয়াও তিন চার দিনের মধ্যে সরমাকে বিবাহ করিতে সম্মত না হয়, তবে এই হুণ্ডী দেখাইয়া সে অজয়কে ভয় দেখাইবে। নিরুপম যাহা বলিল তাহা যদি সত্য হয়, তবে এই হুণ্ডী দেখাইয়াই অজয়কে কাবু করা যাইবে। কিন্তু এখন সে কথা তুলিবার দরকার নাই—চার পাঁচ দিন দেখিয়া এ সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য অভয় তাহা করিবে। তার মনের এ কথাটা সে নিরুপমের কাছে খোলসা করিয়া বলিল না, তাই নিরুপম কিছুতেই এই প্রস্তাবিত বিলম্বের কারণ বুঝিতে পারিল না। অনেক ঝকাঝকি করিয়া সে শেষে অপ্রসন্ন চিত্তে উঠিয়া গেল।

পাঁচ দিন পর সে হীরালাল আগরওয়ালার সাক্ষাৎ পাইল। তার উকীল বন্ধুটি তাকে হীরালালের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিলে নিরুপম জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি অজয় বাবুর নামে অত বড় সঙ্গীন মোকদ্দমাটা অমনি তুলে নিলেন, ব্যাটাকে শাস্তি দিলেন না?"

হীরালাল বলিল, "কি করবো বাবু, তার স্ত্রী আমার পা ধ'রে কান্নাকাটি ক'রলে, কিছুতে পা ছাড়ে না। তার পর টাকাটা সব দিয়ে দিলে—আমি ব'ল্লাম যা'ক।"

নিরুপম বলিল, "তার স্ত্রী! সে তো বিয়ে করে নি! আমি তো জানতাম একটা বাজে মেয়েলোককে নিয়ে সে আপনাকে ঠকিয়েছিল।"

"আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু সে তার স্ত্রীই। মোকদ্দমার আগের দিন আমাকে সে ডাকিয়ে নিয়ে ভয়ানক কান্নাকাটি ক'রলে। আর সে বড়লোকের মেয়ে—মস্ত বড় বাড়ীতে থাকে! আমার বোধ হয় সে মেয়ে বিয়ে ক'রেছে ওকে, কিন্তু এই সব মামলা ফ্যাসাদে প'ড়ে ও এমন খাটো হ'য়ে গেছে ব'লে ওর স্ত্রী লজ্জায় সে কথা চেপে রেখেছে। সে মস্ত বড়লোকের মেয়ে বোধ হয়।"

নিরুপম উগ্র কৌতূহলের সহিত এ কথা শুনিল। তার মনে হইল ইহা তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির একটা সহজ পথ। অজয়ের যদি সত্য সত্যই বিবাহ হইয়া থাকে এবং তার স্ত্রী বর্ত্তমান থাকেন, তবে সেই কথাটা প্রকাশ করিয়া দিলেই সরমা তাকে বিষবৎ বর্জ্জন করিবে—আর মামলা ফ্যাসাদের মধ্যে যাইতে হইবে না।

তাই সে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "বটে?—তার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার তবে আলাপ আছে—পর্দ্দানশিন কি তিনি?"

"না, না, পর্দ্দা-ফর্দ্দা নেই। আজকাল আপনাদের বাঙ্গালীর ঘরে যেমন হ'য়েছে। আমার সঙ্গে দিব্যি কথাবার্ত্তা কইলে।"

নিরুপম আগ্রহের সহিত হীরালালকে অনুরোধ করিল, "আপনি একবার তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিতে পারেন?—আমার বিশেষ দরকার আছে।"

হীরালাল একটু সঙ্কোচ অনুভব করিল, কিন্তু শেষে সে সম্মত হইল। সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় হীরালাল নিরুপমকে লইয়া যাইবে স্থির হইয়া গেল।

বৈকাল বেলায় নিরুপম মায়ার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিল, "বউদি, সব আস্কারা হ'য়ে গেছে। আমি একটা মস্ত বড় আবিষ্কার ক'রেছি—অজয় বাবু বিবাহিত, তাঁর স্ত্রী বর্ত্তমান!"

মায়া ও অভয় দুজনেই বিস্মিত হইয়া বলিল, "অ্যাঁ!"

হাসিয়া নিরুপম বলিল, "হাঁ—যতই আশ্চর্য্য হোক কথাটা সত্যি। এবং আজ এখনি আমি যাব তাঁর সেই স্ত্রীর সঙ্গে দেখা ক'রতে। যদি সম্ভব হয় তাঁকে নিয়ে তোমার দিদির কাছে হাজির ক'রলেই অজয়ের দফা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে।"

মায়া কথাটা বেশী তলাইয়া দেখিল না, সে খুসী হইল। অভয়ের মুখ শুকাইয়া গেল। সে ভাবিল ইহাই যদি সত্য হয় তবে তো অজয়ের পক্ষে সরমাকে বিবাহ করা অসম্ভব! তবে তো সরমার মান রক্ষার কোনও উপায়ই থাকিবে না! সে মনে মনে দারুণ অস্বস্তি বোধ করিল, কিন্তু কোনও কথা প্রকাশ করিল না। মায়ার কাছে এখন সরমার নাম করিতেও সে মহা সঙ্কোচ অনুভব করে।

নিরুপম বলিল, "বিয়ে সে আজ করেনি, তিন চার বছর আগে তার বিয়ে হ'য়েছে। যখন তোমাদের বাড়ীতে তার আনাগোনা খুব বেশী ছিল, সেই সময়েই তার বিয়ে হ'য়ে গেছে। সেই স্ত্রীকে নিয়ে তিনি গিয়েছিলেন হীরালাল আগরওয়ালার দোকানে—কি শয়তান দেখেছ!"

এই কথায় মায়ার মুখ শুকাইয়া গেল। তার প্রাণ ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল! কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া এ আবার কি সাপ বাহির হইতে চলিল। তার অন্তর ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল।

সে তখন বলিল, "তুমি ভুল শুনেছ ঠাকুরপো! তখন অজয় বাবুর নিশ্চয় বিয়ে হয় নি! আমি জানি।"

হাসিয়া নিরুপম বলিল, "তুমি তো তখন তা' জানবেই। কিন্তু বিয়ে যে তার হ'য়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। আমি যার কাছে শুনেছি সে নিজের চক্ষে তাকে দেখে এসেছে—তার সঙ্গে কথা ক'য়েছে। আর এ তো হাতে পাঁজী মঙ্গলবার—এখনি তো যাচ্ছি আমি, সেখানে গেলেই সব পরিষ্কার হ'য়ে যাবে।"

মায়া শুষ্কমুখে বলিল "কে সে?—কে দেখেছে তাকে?"

নিরুপম বলিল, "হীরালাল আগরওয়ালা—সেই আমাকে নিয়ে যাবে তার কাছে।"

মায়া এক মুহূর্ত্তে যেন বিলুপ্ত হইয়া গেল। কথা কওয়া তার পক্ষে অসম্ভব হইল। ভাল করিয়া সব কথা ভাবিতেও সে পারিল না। হীরালালকে লইয়া কথাটা ঘাঁটাঘাঁটি করিলে শেষে পাছে আসল কথাটা বাহির হইয়া পড়ে, পাছে অজয় সরমার সম্মান রক্ষার জন্য সত্য কথাটা বলিয়া দেয়—সেই ভয়ানক সম্ভাবনার কথা কল্পনা করিয়া সে একেবারে বজ্রাহতের মত হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে মায়া সসঙ্কোচে অভয়ের দিকে চাহিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "এ কথা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করাটা কি ভাল হবে? তুমি কি বল?"

অভয় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "কিছু ভেবে উঠতে পারছিনে। আমার মনে হয়—তাই যদি হয়, তবে ওটা আর কিছুদিন চাপাই থাক।"

মায়া আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "হাঁ সেই ভাল—আমিও তাই বলি। কথাটা প্রকাশ হ'য়ে প'ড়লে—কে জানে সরি হয় তো ভয়ানক একটা কিছু ক'রে ব'সতে পারে!"

নিরুপম বলিল, "সে ভয় মিছে ক'রছেন। আমার ঠিক বিশ্বাস যে কথাটা প্রকাশ হ'লে আপনার দিদি অজয়কে সুধু লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবেন। তার চেয়ে ভয়ানক কিছু ক'রবেন না।"

ব্যস্ত হইয়া মায়া বলিল, "থাক ঠাকুরপো, ও নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে কাজ নেই।"

নিরুপম তাদের সঙ্গে তর্ক করিল। অভয় ও মায়া দুজনেই তাদের গোপন হেতুটা প্রকাশ করিতে না পারায় তর্কে তাদের সপক্ষে কোনও যুক্তিই উপস্থিত করিতে পারিল না।

পরিশেষে নিরুপম বলিল, "আচ্ছা দেখাই যাক না একবার কথাটা কতদূর সত্য। একবার তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি, তার পর ঘাঁটা কি না ঘাঁটার কথা তোমাদের সঙ্গে বিচার করা যাবে।"

নিরুপম তার পর হীরালালের কাছে গেল। হীরালাল তাকে মোটরে চড়াইয়া চলিল বালিগঞ্জে।

বালীগঞ্জে আসিয়া যখন হীরালাল ড্রাইভারকে সরমার বাড়ীর রাস্তার কাছে মোড় লইতে বলিল তখন নিরুপম

চমকাইয়া উঠিল। ভাবিল কি দুঃসাহস এই অজয়ের। এই রাস্তার উপর, সরমার এত কাছে তার স্ত্রী থাকে, আর এইখানে সরমার সঙ্গে সে প্রেম করিতে আসে! এসব লোকদের দুঃসাধ্য কর্ম্ম নাই।

তার চমকটা ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই গাড়ী দাঁড়াইল—সরমারই বাড়ীর সামনে! নিরুপম স্তব্ধ হইয়া গেল—এই বাড়ীতে?—তবে কি—সরমাই অজয়ের বিবাহিত পত্নী?

এই কথা মনের ভিতর ঝলক দিয়া যাইতেই নিরুপমের হাত পা অসাড় হইয়া গেল, তায় উৎসাহ দপ করিয়া নিভিয়া গেল।

হীরালাল নামিতে যাইতেছিল, নিরুপম তার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "আপনার ভুল হয় নি তো বাবুজী? এই বাড়ীই ঠিক?"

হীরালাল বিস্মিত হইয়া মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "নিশ্চয়! আমার ভুল হবে কেন?"

শুষ্কমুখে নিরুপম বলিল, "এ যে—এ যে আমার এক বন্ধুর বাড়ী!"

হীরালাল বিস্মিত হইয়া গাড়ীতে চাপিয়া বসিল। সে একবার নিরুপমের মুখের দিকে চাহিল, আর একবার চাহিল সেই বাড়ীর দিকে। বাড়ীতে উজ্জ্বল বিজলী বাতি জ্বলিতেছে, সরমা তার পড়িবার ঘরের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আছে, জানালা দিয়া তার মুখ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

হীরালাল অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সরমাকে দেখাইয়া বলিল, "ঐ অজয় বাবুর স্ত্রী!"

নিরুপম মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে স্থির করিল যে সরমার সঙ্গে অজয়ের বিবাহ হইলে মায়ার সে কথা কিছুতেই অজানা থাকিত না। সুতরাং বিবাহ হয় নাই নিশ্চয়। সে হীরালালকে বলিল, "উনিই কি অজয়ের সঙ্গে আপনার দোকানে গিয়েছিলেন সেই গয়না চুরীর দিন?"

"হাঁ।"

নিরুপম ভাবিতে লাগিল। বিবাহ হয় নাই নিশ্চয়, কিন্তু তিন বৎসর পূর্ব্ব হইতে সরমা অজয়ের সঙ্গে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়াছে এবং অপরের কাছে অজয়ের স্ত্রী বলিয়া পরিচিত হইতে সঙ্কোচ বোধ করে নাই? কি পাপিষ্ঠা! নিদারুণ ঘৃণায় ও জিঘাংসায় তার চিত্ত ভরিয়া উঠিল। তার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল।

শেষে সে বলিল, "বাবুজী, এখন আমার দেখা করবার দরকার নেই। আপনি আর একটু দয়া ক'রবেন। অনুগ্রহ ক'রে আধঘণ্টা এখানে একটু অপেক্ষা ক'রতে হবে। আমার বিশেষ অনুরোধ—আমি এক্ষুণি আসছি।"

হীরালাল বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। ব্যাপারটা কি বুঝিবার জন্য তার কৌতূহল হইল। সে অপেক্ষা করিতে সম্মত হইল।

নিরুপম ছুটিয়া গিয়া নিকটবর্ত্তী এক বাড়ী হইতে অভয়কে টেলিফোন করিয়া বলিল, "তুমি শীগ্‌গির বউদিকে নিয়ে বালিগঞ্জের সরমার বাড়ীতে এসো!"

অভয় বলিল, "কেন, কি হ'য়েছে?"

"ভয়ানক তামাসার কথা, শীগ্‌গির এসো—এক মুহূর্ত্ত দেরী ক'রো না—বউদি যেন আসে।"

"কেন অজয়ের স্ত্রীকে পেয়েছ না কি?"

"হাঁ—তুমি এসোই না।" বলিয়া সে টেলিফোন ছাড়িয়া দিল।

অভয় ও মায়া দুজনেই স্বতন্ত্রভাবে বসিয়া ভাবিতেছিল ঠিক এই কথাই।

অভয় ভাবিতেছিল, নিরুপম যাহা বলিল তাহা যদি সত্য হয় তবে ভয়ানক সর্ব্বনাশের কথা! তাহা হইলে কি উপায় হইবে সরমার?

একবার মনে হইল, সরমাকে জগতের অবজ্ঞা হইতে রক্ষা করিবে অভয় নিজে। তার সকল শক্তি দিয়া সে সরমাকে পৃথিবীর সমস্ত আঘাত হইতে বাঁচাইয়া রাখিবে, আর তার গৃহে সম্মান দিয়া তাকে সে বেষ্টিত করিয়া রাখিবে। কলিকাতায় তার থাকা সম্ভব না হয়, স্থানান্তরে যাইবে—চাই কি ভারতের বাহিরে ইয়োরোপ কি আমেরিকায় যাইবে, কিন্তু অজয়ের বঞ্চনার জন্য সরমার পায় সে কুশাঙ্কুরও বিঁধিতে দিবে না। সরমার সন্তান হইলে তাকে মানুষ করিবে অভয়।

তখনই তার মনে পড়িল ভয়ানক কথা! সরমাকে রক্ষা করিবার তার যে শক্তি তাহা একেবারে পঙ্গু করিয়া দিয়াছে মায়া। মায়া সরমাকে সন্দেহ করে, অভয়কে সন্দেহ করে! আর তার চেয়ে আরও ভয়ানক কথা,

সরমা অভয়কে মনে মনে ভালবাসে! এইটাই অভয়ের মনে হইল সব চেয়ে বিপদের কথা। অভয় যদি সরমাকে অধিক সমাদর করে, কে জানে তার ভিতরকার এই প্রচ্ছন্ন প্রেম বাড়িয়া উঠিয়া সকল বাধা চুরমার করিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে না? তবেই তো বিষম বিপদ!

চারিদিক দিয়াই বিপদ। কোনও দিক দিয়া কূল সে খুঁজিয়া পাইল না।

মায়ার ভাবনার আর কোনও কূল-কিনারা ছিল না। সে ভাবিতেছিল, এতক্ষণ নিরুপম হয় তো হীরালাল আগরওয়ালাকে লইয়া সরমার কাছে গিয়াছে, হয় তো এতক্ষণ এ কথা প্রকাশ হইয়া গিয়াছে যে, অজয় বিবাহিত নয়, সরমাই আপনাকে তার স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, এবং হয় তো সরমা আসল কথাটা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে! যদি তাই হইয়া থাকে তবে তো তার আর মরণ ছাড়া গতি নাই। উল্টাইয়া পাল্টাইয়া এই কথাটাই সে বার বার ভাবিতে লাগিল—কোনও মতেই ভাবিয়া শেষ করিতে পারিল না। ভয়ে ভয়ে তার কণ্ঠ শুকাইয়া গেল, বুক যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।

নিরুপমের টেলিফোনবার্ত্তা পাইয়া অভয় শুষ্কমুখে মায়াকে নিরুপমের কথা জানাইল। মায়া তার হৃৎকম্পন কোনও মতে দমন করিয়া শুনিল—তার পর অনেকক্ষণ দুইজনে নিস্তব্ধ হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দু'জনেরই মুখ শুষ্ক, হৃদয় ভারাক্রান্ত।

শেষে অভয় বলিল, "চল যাওয়াই যা'ক। নিরুপমটা যে গোঁয়ার, কি ক'রতে কি ক'রে ব'সবে তার ঠিকানা নেই। চল যাই।"

মায়া বলিল, "তুমিই যাও, আমি গিয়ে কি ক'রবো?"

অভয় বলিল, "তুমি না গেলে কিছুতেই হবে না—নইলে দিদিকে এ বিপদের সময় সামলাবে কে?"

মায়া খুব জোর করিয়া অস্বীকার করিতেও সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল। মনের গুপ্ত আশঙ্কায় সে ভীরু হইয়া পড়িয়াছিল; তার মনের ভিতর যে ভয় পাছে জোরে অস্বীকার করিলে সেটা অভয়ের কাছে প্রকাশ হইয়া যায়, সেই আশঙ্কায় সে খুব তীব্র প্রতিবাদ করিতে পারিল না। সে পাশ কাটাইবার চেষ্টায় বলিল, "না থাক, এখন খোকাকে খাওয়াতে হবে আবার।"

অভয় বলিল, "সে মা ক'রবেন, চল।"

অত্যন্ত ক্ষীণভাবে মায়া বলিল, "মার হাতে সে খেতে চায় না—গোলমাল করে।"

"তা হোক—তোমাকে রেখে আমি যাব না। তুমি চল।"

আর প্রতিবাদ করা চলিল না। মায়া নীরবে গিয়া গাড়ীতে উঠিল। গাড়ীর ভিতর অভয়ের অঙ্গস্পর্শ করিতেও তার সঙ্কোচ হইল। অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে গাড়ীর এক কোণায় সে এতটুকু হইয়া পড়িয়া রহিল।

তার মনে হইল সে চলিয়াছে আজ তার মৃত্যুর পথে।

(২০)

সেই দিন সকালে অজয় উঠিয়া ঘরের ভিতর পায়চারী করিতে লাগিল। তার মুখখানা চিন্তায় অন্ধকার।

পূর্ব্বদিনে সরমা সকালে সুধু একবার তার কাছে আসিয়াছিল। আর সারা দিনের মধ্যে সে একবারও আসে নাই। অজয় সমস্ত দিন ব্যগ্রভাবে তার আগমনের প্রতীক্ষা করিয়াছিল—বার বার দ্বারের দিকে চাহিয়াছিল, প্রতিবারই হতাশ হইয়া চক্ষু ফিরাইয়াছিল।

অথচ অন্তরালে থাকিয়া সরমা যে তার সেবা-যত্ন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া করিতেছে, বার-বার দাস-দাসী পাঠাইয়া তার খবরা-খবর করিতেছে, অজয়ের নিঃসঙ্গতার গ্লানি দূর করিবার জন্য মাকে পাঠাইয়া দিয়াছে, বই পাঠাইয়াছে, কাগজ পাঠাইয়াছে, এসব কোনও খবরই অজয়ের জানিতে বাকী নাই।

এই সেবায় প্লাবিত হইয়া অজয় আকুল ভাবে কামনা করিতেছিল এই করুণা, সেবা ও স্নেহের উৎসের। তাকে চোখে দেখিয়া, তার কথা শুনিয়া, তার সঙ্গে কথা কহিয়া যে আনন্দ, তার জন্য সে লোলুপ হইয়া উঠিয়াছিল।

এ কামনা তার মুখ ফুটিয়া বলিবার নয়, কিন্তু এ বেদনা সে সহিতেও পারে না।

সারা দিবারাত্রের অদর্শনে তার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছিল সরমার দর্শনের জন্য! কাল অনেকবার সে ভাবিয়াছে, সরমাকে ডাকিয়া পাঠায়, কিন্তু সাহস পায় নাই। আজ আর সে তার দর্শন-তৃষ্ণাকে কোনও ক্রমেই দমন করিতে পারিতেছে না।

চাকর আসিয়া তার চা ও খাবার দিয়া গেল। অজয় বলিল, "দেখ—"

চাকর ফিরিয়া দাঁড়াইল আদেশের প্রতীক্ষায়। কিন্তু অজয় থামিয়া গেল।

তার পর সে বলিল, "তোমার দিদিমণি কি ব্যস্ত আছেন খুব?"

তখনই হাসিতে হাসিতে সরমা ঘরে প্রবেশ করিল। অজয়ের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। চাকর ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সরমা হাসিয়া বলিল, "আমাকে ডাকছিলেন আপনি?"

অজয় চট্ করিয়া কোনও উত্তর দিতে পারিল না। একটু থামিয়া সে বলিল, "হাঁ একবার—এই আপনাকে বলছিলাম কি? আজ আমাকে ছুটী দিন। আজ আমি সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ ক'রছি—আর আটকে রাখবেন না।"

সরমা মুখ ভার করিয়া বলিল, "কষ্ট যদি হয় আপনার এখানে থাকতে, তবে কাজ নেই।"

উত্তেজিত ভাবে অজয় বলিল, "কষ্ট হয়! আপনি কি ব'লছেন? কিছুই কি বুঝতে পারেন না আপনি? আমার উপর আপনি এমনি অবিচার কি চিরদিন ক'রবেন?"

সরমা বলিল, "অবিচার কিছু করিনি অজয় বাবু। আজ তিন দিন থেকে যাবার জন্য আপনি ছট্‌ফট্ ক'রছেন, তাই আপনাকে আর কষ্ট দিতে চাই না ব'লেছি।"

অজয় গম্ভীর হইয়া মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।

স্নিগ্ধ কণ্ঠে সরমা বলিল, "রাগ ক'রলেন অজয় বাবু?"

দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া অজয় বলিল, "না। রাগ করিনি, কিন্তু দুঃখে বুক ফেটে যাচ্ছে এই জন্যে, যে বুকের ভিতর যা হ'চ্ছে তা আপনাকে খুলে দেখাতে পারছি না। তাই অবিচার আমার মাথা পেতে নিতে হ'চ্ছে। সে দুঃখ সইবে—কিন্তু আপনি যে না বুঝে দুঃখ পাচ্ছেন এই দুঃখ সইতে পারছি না।"

সরমা তার বড় বড় চক্ষু দুটি অসীম স্নেহের সহিত অজয়ের মুখের উপর রাখিয়া বলিল, "আমার কোনও দুঃখ নেই অজয় বাবু। বরং এ কয় দিন আপনার যে একটু সেবা ক'রতে পেরেছি সেই আমার আনন্দ!"

অজয় দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তবে হাসিমুখে আজ আমায় বিদায় দিচ্ছেন?"

সরমাও ছোট্ট একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিল, কিন্তু হাসিয়া বলিল, "হাসিমুখেই বিদায় দেব, কিন্তু এ বেলায় নয়। খাওয়া দাওয়া ক'রে একটু ঘুমিয়ে বিকেলে যাবেন। কেমন?"

অজয় বলিল "আচ্ছা।"

তার পর কিছুক্ষণ দুইজনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। শেষে অজয় হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "দেখুন, আপনাকে না ব'লে আমি পারছি নে। না ব'ল্লে চিরদিন আপনি আমার উপর অবিচার ক'রবেন, সে আমি সইতে পারবো না। সেদিন আপনি আমাকে যে মহার্ঘ রত্ন দিতে গিয়েছিলেন, নিতে পারি নি আমি তা। কিন্তু অশ্রদ্ধা ক'রে আমি প্রত্যাখ্যান ক'রেছি—গর্ব্ব ক'রে বা রাগ করে প্রত্যাখ্যান ক'রেছি, এমন কথা যদি আপনি মনে ভাবেন তবে আমার দুঃখের সীমা থাকবে না। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি না—আপনাকে ভালবাসি না—এর চেয়ে নিদারুণ মিথ্যা নেই। কিন্তু আপনাকে বড় ভালবাসি ব'লেই প্রত্যাখ্যান ক'রেছি—আপনাকে অসম্মানিত ক'রবো না ব'লে। এ কথা বিশ্বাস ক'রবেন কি?"

একটা আনন্দের লহর খেলিয়া গেল সরমার অন্তরে। কিন্তু সে আনন্দ সে প্রকাশ করিল না। সে সুধু বলিল "সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'রছি। কিন্তু আর সে কথা কেন? সে সব তো চুকে গেছে। সে কথা তুলে' তো কোনও লাভ নেই।"

"লাভ আছে। দরকার আছে তাই ব'লছি। যদি না বলি, তবে আপনি আমাকে একটা পশুর অধম ভাবলে আপনাকে কেউ দোষ দিতে পারবে না। তাই এই কথাটা আমি আপনাকে বিশ্বাস করাতে চাই যে আমার অন্তরে যে ভালবাসা আছে আপনার উপর—সে সমুদ্রের মত গভীর। কিন্তু সে ভালবাসায় আপনাকে রক্ষা ক'রতে চাই—বাঁচিয়ে রাখতে চাই আপনার পরিপূর্ণ সম্মান—আপনাকে গ্রাস ক'রে ডোবাতে চাই নে। তাই, আমার অত বড় স্পর্দ্ধা হ'য়েছিল।"

সরমা শান্তভাবে বলিল, "থাক, ও-কথা আর তুলে কাজ নেই। আমি ব'লেইছি তো, সে কথা নিয়ে আমার আপনার উপর কোনও অভিযোগ নেই, অনুযোগ নেই। আমার আপনার দুজনেরই এখন উচিত সে দিনকের

কথাগুলো ভুলে যাওয়া। নয় কি? আমার কোনও দুঃখ নেই, কোনও গ্লানি নেই। আপনিও তা' নিয়ে মনে কিছু ক'রবেন না। আপনি আপনার কাজ ক'রে যান, আমি আমার কাজ করি। সংসারে আমরা তো শুধু ভালবাসতে আসি নি, এসেছি কাজ ক'রতে। একটা ব্যর্থ ভালবাসার আপশোষ নিয়ে কাজ মাটি করা, জীবনকে ব্যর্থ হ'তে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।"

অজয় আবার কি বলিতে যাইতেছিল। সরমা বাধা দিয়া বলিল, "আপনার কাছে আমার সুধু একটা ভিক্ষা, আপনি শরীরটাকে মিছেমিছি অত কষ্ট দেবেন না। শরীরের প্রতি যদি আপনি একটু দৃষ্টি না দেন তবে আমার দুঃখ কিছুতেই যাবে না।"

অজয় বলিল, "আপনার এ অনুরোধ যদি রক্ষা না করি তবে আপনার করুণার—ভালবাসার অপমান করা হবে। আমি কথা দিচ্ছি, শরীরের যত্ন ক'রবো এর পর।"

সরমা তার পর আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

তার মনের ভিতর যে উল্লাস হইল, নির্জ্জনে বসিয়া সে আনন্দ উপভোগ করিল। অজয় তাকে ভালবাসে। সে নিজমুখে তাহা বলিয়াছে, তার মুখ চোখ তাহা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছে। ভালবাসিয়াই সে তাকে ছাড়িয়াছে। তার এ প্রতিজ্ঞায় যেমন প্রকাশ পাইয়াছে তার ভালবাসা, তেমনি ফুটিয়া উঠিয়াছে তার মহত্ত্ব, তার চরিত্র-গৌরব। এই কথায় অজয়ের প্রতি তার শ্রদ্ধা বহুগুণে বাড়িয়া গেল। তার এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া সে গৌরব সরমা ক্ষুণ্ণ করিবে না।

আহারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া অজয় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। তখন সরমা আসিয়া অজয়ের হাতে তার দোকানের চাবিটা দিল।

অজয় বলিল, "যাবার সময় একটা ভিক্ষা পাব কি?"

ঈষৎ ম্লান হাসি হাসিয়া সরমা বলিল, "কি চান?"

অজয় কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "চাইতে ভরসা হয় না, চাইবার অধিকার আমি অর্জ্জন করি নি, তবু চাইতে সাহস ক'রছি—সুধু আপনার করুণার সীমা নেই ব'লে।"

সরমা বলিল, "কি চান বলুন না?"

কম্পিত হস্তে সরমার একখানি হাত ধরিয়া অজয় বলিল, "আপনার এই হাতখানির উপর, জন্মের শোধ, একটি চুম্বন"—

সরমার শরীরের ভিতর বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহিয়া গেল। অত্যন্ত ধীরে ধীরে হাতখানা টানিয়া লইয়া সে আত্মস্থ হইয়া বলিল, "থাক। ও সব কথা ভুলে যান।"

অজয় ত্রস্তে-ব্যস্তে তার হাত টানিয়া লইয়া বলিল, "অপরাধ ক'রেছি, বেয়াদবী মাপ ক'রবেন।"

সে যখন গিয়া গাড়ীতে উঠিল, তখন সরমা তাকে বলিল, "আমার একটি ভিক্ষা আছে।"

অজয় বলিল, "আদেশ করুন।"

"মাঝে মাঝে আপনি এক-আধবার এসে আমাকে দেখা দিয়ে যাবেন।"

অজয়ের বুকটা কাঁদিয়া উঠিল। ইহার উত্তরে অনেক কথা তার ঠোঁটের গোড়ায় আসিল। সে কথা ফিরাইয়া দিয়া সে বলিল, "আচ্ছা আসবো।"

দোকানে গিয়া অজয় দুয়ার খুলিয়া দেখিল ঘরটা অত্যন্ত নোংরা হইয়া রহিয়াছে। এই ঘরের দীনতা ও অপরিচ্ছন্ন শ্রীহীনতা আজ যেন তার চোখের ভিতর কাঁটার মত ফুটিল। সরমার বাড়ীতে সে আরামে ছিল, সম্পদে বেষ্টিত ছিল। কিন্তু সে সম্পদের চেয়ে বড় ছিল সরমার কল্যাণ-হস্তের রচিত এতটি অপূর্ব্ব শ্রী, আর গৃহের বায়ু ও আকাশের ভিতর পরিব্যাপ্ত তার অনর্ঘ প্রেম। সেই শ্রী ও সেই প্রীতির স্পর্শলেশশূন্য এই গৃহটী তার চোখে আজ অত্যন্ত কুৎসিত মনে হইল।

দুয়ার খুলিয়া সে ঝাঁটা হাতে করিয়া ঘর পরিষ্কার করিতে প্রস্তুত হইল। একটুতেই সে ক্লান্তি বোধ করিল। তার স্মরণ হইল সরমাকে সে প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছে যে শরীরের যত্ন করিবে। তাই সে অতিশ্রম হইতে বিরত হইল। তার ছোকরাকে ডাকিয়া ঘর ঝাঁট দিতে বলিয়া সে জিনিষ-পত্র একটু গুছাইতে চেষ্টা করিল।

সে দেখিতে পাইল একটা জানালার কাছে মেঝের উপর কয়েকখানা চিঠি ছড়াইয়া রহিয়াছে। তার অনুপস্থিতিতে ডাকপিয়ন জানালা দিয়া চিঠিগুলি গলাইয়া দিয়াছিল, সেগুলি অমনি পড়িয়া ছিল।

চিঠি কয়খানা কুড়াইয়া লইয়া সে একে একে পড়িতে

লাগিল। দুই একখানা চিঠির পর সে পড়িল মায়ার চিঠি। পড়িয়া সে স্তম্ভিত হইল।

চিঠিখানার তারিখ পরীক্ষা করিয়া সে দেখিল যে, যেদিন সরমা তার কাছে আসিয়াছিল সেই দিনকার লেখা এ চিঠি, আসিয়াছে তার পরদিন।

মায়ার পত্রের কঠোরতা তার বুকে বিষম আঘাত করিল। অজয় যে সরমাকে ভুলাইয়া বিবাহ করিবার চেষ্টা করিতেছে এই তার অভিযোগ। এ অভিযোগের ভিত্তি বোধ হয় এই যে মায়া জানিয়াছে যে সরমা তার কাছে আসিয়াছিল। কি নিষ্ঠুর অবিচার!

তার পর সে মনে করিল, সরমা যে অজয়ের কাছে সেদিন আসিয়াছিল সে কথাটা তবে মায়ার কাছে প্রকাশ হইয়া গিয়াছে; আর সরমা যে প্রণয়-সম্ভাষণে আসিয়াছিল এ অনুমান মায়া করিয়াছে। কি ভয়ানক কথা! সরমার তবে মায়ার কাছে লজ্জার আর অবধি নাই। সরমার মানরক্ষার জন্য অজয়ের যত্ন ব্যর্থ হইয়াছে।

মায়ার অভিযোগ ও তিরস্কারের ভিতর যে নির্ম্মম অবিচার ছিল তাহা তাকে যতই আঘাত করুক, কিছুক্ষণ চিন্তার পর সে স্থির করিল যে মায়ার উপদেশটা অশ্রদ্ধেয় নয়। সে এখানে থাকিলে সরমার সঙ্গে দেখা হইবে। কে জানে তাহা হইতে কোন দিন কোন বিপদ উপস্থিত হইবে! কয় দিন সরমার কাছে থাকিয়াই তো তার প্রতিজ্ঞা টলমল হইয়া উঠিয়াছিল—সে পারে নাই সম্পূর্ণ আত্মসংবরণ করিতে। সুধু সরমার দৃঢ়তায় তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা সম্ভব হইয়াছে। কে জানে আবার দেখা হইলে কি হইবে? সুতরাং এখানকার কারবার গুটাইয়া স্থানান্তরে—দূরদেশে যাওয়ার পরামর্শ মন্দ নয়!

গভীরভাবে এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অজয় বাকী চিঠিগুলি খুলিয়া পড়িল। সর্ব্বশেষে সে খুলিল অভয়ের চিঠি।

এই চিঠি পড়িয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

অভয় অত্যন্ত শান্তপ্রকৃতি, উদার ও স্থিরবুদ্ধি লোক। তার হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় এমন একখানা চিঠি লেখা সম্ভব নয়। নিশ্চয় সে এমন কথা শুনিয়াছে যাহাতে তাহার স্থির বিশ্বাস হইয়াছে যে সরমা তাহার দ্বারা কলঙ্কিত হইয়াছে।

অজয় চিন্তিতভাবে চিঠির তারিখ পরীক্ষা করিল। দেখিল যে, সরমা যেদিন তার কাছে আসিয়াছিল তার পর দিন অভয় লিখিয়াছে। সুতরাং মায়া ও অভয়ের অভিযোগের ভিত্তি এক—সরমার অজয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ। অজয় অনুমান করিল যে মায়া যখন লিখিয়াছিল তখন কথাটা ছিল এই যে, অজয় সুধু সরমাকে ভুলাইয়া বিবাহ করিবার চেষ্টা করিতেছে। পরের দিনই কথাটা এইভাবে প্রকাশ হইয়াছে যে অজয় সরমাকে কলঙ্কিত করিয়াছে, কিন্তু তাকে বিবাহ করিতে চায় না!

কথাটা নিশ্চয়ই সরমার আত্মীয়-সমাজে বেশ ভাল করিয়াই রটিয়াছে। এমনভাবে বিকৃত হইয়া তাহা রটিয়াছে যে সরমার এখন আত্মীয়-সমাজে মুখ দেখান অসম্ভব!

মায়া ও অভয় দুইজনেই তাকে শাসাইয়াছে। মায়া বলিয়াছে সরমাকে ত্যাগ করিতে, অভয় বলিয়াছে তাকে বিবাহ করিতে! এই প্রভেদের হেতু অজয় ইহাই অনুমান করিল যে মায়া যখন লিখিয়াছে তখন সরমার কলঙ্কিত হইবার কথা রটে নাই, অভয় যখন লিখিয়াছে তখন তাহা রটিয়াছে। মায়া ও অভয় উভয়ের শাসন ও ভয় প্রদর্শন সে অগ্রাহ্য করিল। কিন্তু তারা যাহা লিখিয়াছে সেই কথা গভীর ভাবে ভাবিতে লাগিল।

এখন তার কর্ত্তব্য কি? মায়ার উপদেশ অনুসারে পলায়ন, না অভয়ের আদেশ অনুসারে বিবাহ? যদি সরমার নামে অত বড় কলঙ্ক রটিয়া থাকে, তবে ত্যাগ করিয়া যাওয়ায় সরমার কোনও হিত হইবে না, সে কলঙ্ক তার ঘুচিবে না। বিবাহ করিলে ঘুচিবে কি? সে সরমাকে বিবাহ করিয়া তার মান বাড়াইতে পারিবে না—সুধু কলঙ্ক মোচনের জন্য তাকে খাটো করা সঙ্গত হইবে কি?

অজয় ভাবিল সরমাকে বিবাহ করিতে সম্মত হয় নাই সুধু সরমার তাতে সম্মানহানি হইবে বলিয়া। এখন তার হইয়াছে এত বড় কলঙ্ক যার কাছে সে সম্মানহানি তুচ্ছ। সে কলঙ্ক হইতে মুক্তির এক উপায় সরমাকে বিবাহ করা! এ কল্পনায় সে তৃপ্তি অনুভব করিল না। কেন না সরমাকে অজয় যতই ভালবাসুক, এ বিশ্বাস তাহার বদ্ধমূল ছিল যে সে সরমার যোগ্য স্বামী কিছুতেই নয়। সে সরমাকে বিবাহ করিলে সরমাকে খাটো হইতে হইবে, হয় তো সরমা জীবনে যাহা আকাঙ্ক্ষা করে, তার তৃপ্তি সে পাইবে না।

সুতরাং এ কল্পনায় তার হৃদয় যত উল্লসিত হইল, তার অন্তরে সে সেই পরিমাণে সঙ্কোচ অনুভব করিল।

হউক, কিন্তু পরস্পরকে ভালবাসিয়া তারা জীবন চরিতার্থ করিতে পারে। অজয় সরমাকে ভালবাসে, সরমা অজয়কে ভালবাসে—তাদের দুজনের কারও জানিতে বাকী নাই যে অপরে তাকে ভালবাসে। এতক্ষণ তাদের মধ্যে ছিল সুধু একটা সম্মানের ব্যবধান। সে ব্যবধান হঠাৎ এমনি করিয়া চুরমার হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। ইহাতে সঙ্কোচ যতই হউক, অজয়ের উল্লাস হইল। একটা ক্লেশকর কর্ত্তব্যের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া প্রাণের পিপাসার পরিতৃপ্তির স্বাধীনতা পাইয়া তার হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

কিন্তু সরমা? এত বড় কলঙ্কের পর সে কি করিবে? ভাবিতে অজয়ের হৃদয় ব্যথায় পীড়িত হইল। দেবীর মত মেয়ে সরমা, তার অদৃষ্টে এই নিদারুণ কলঙ্ক! ভগবানের রাজ্যে কি বিচার নাই? না জানি সরমা ইহাতে কি নিদারুণ মর্ম্মপীড়া অনুভব করিতেছে!

অজয় স্মরণ করিল, এ কয় দিনের মধ্যে সে সরমার ভিতর কোনও বৈলক্ষণ লক্ষ্য করে নাই। সে অজয়ের প্রত্যাখ্যানের অসম্মান যেমন উপেক্ষা করিয়াছে, তেমনি উপেক্ষা করিয়াছে তার এ কলঙ্ক! মায়া ও অভয় অজয়কে যে কথা লিখিয়াছে সে কথা যে সরমার কাছে পৌঁছায় নাই এমন সম্ভাবনা তার মনে হইল না। সে মনে করিল যে তাদের চিঠি লিখিবার পূর্ব্বেই সরমা এজন্য তিরস্কৃত হইয়াছে। কিন্তু এ কথা জানিয়াও সরমা অনায়াসে অজয়কে তার গৃহে লইয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে তার সেবা করিয়াছে, অসামান্য স্নেহ দেখাইয়া তার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছে—প্রশান্ত বিকারহীন চিত্তে।

কিন্তু—হাঁ একটু বৈলক্ষণ্য দেখিয়াছে বই কি অজয়? প্রেম সম্বন্ধে সে একটু ঔদাসীন্য দেখাইয়াছে, সে কথা অজয়কে তুলিতে বারণ করিয়াছে—ভুলিবার কথাও বলিয়াছে! সরমার এই ঔদাসীন্য ও বৈরাগ্য অজয় তখন ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু এখন তার মনে হইল যে তার নামে এই কলঙ্ক রটিয়াছে বলিয়াই সরমা তার উদ্দাম প্রেমকে সহসা সংযত করিয়া ফেলিয়াছে। সুধু এইটুকু,—জগতের অসম্মান, অশ্রদ্ধা বা কলঙ্ককে সে ইহার বেশী আমল দেয় নাই! কি মহীয়সী এই নারী—কি অপূর্ব্ব তার চরিত্র! শ্রদ্ধায় ভক্তিতে অজয়ের অন্তর সরমার কাছে নত হইয়া পড়িল।

এই কথা ভাবিয়া অজয়ের মনে একটু সংশয় হইল। কলঙ্কের কথা শুনিয়া যদি সরমা ইহাই স্থির করিয়া থাকে যে সে অজয়ের প্রতি প্রেম ভুলিয়া যাইবে, তবে কি সে আজ অজয়ের মুখে বিবাহের প্রস্তাব খুসী হইয়া গ্রহণ করিবে? অজয়ের ভয় হইল, বুঝি-বা সরমা তাকে প্রত্যাখ্যান করিবে—স্নিগ্ধভাবে সে প্রত্যাখ্যান করিবে, কিন্তু দৃঢ়তার সহিত।

আজই আসিবার সময় সে অজয়ের মত্ত ভিক্ষা যে স্নিগ্ধ দৃঢ়তা ও প্রশান্ততার সহিত বিমুখ করিয়াছিল সে কথা অজয়ের স্মরণ হইল। এখন তার ভয় হইল যে অজয় যদি এখন বিবাহের প্রস্তাব করে তবেও সে এমনি ভাবে প্রত্যাখ্যান করিবে।

তাই অজয় সঙ্কুচিত হইল।

অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া, কি করিবে সে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। শেষে সন্ধ্যাবেলায় সে মন স্থির করিয়া সরমার সঙ্গে দেখা করিতে চলিল।

(২১)

অভয় মায়াকে লইয়া উপস্থিত হইলে নিরুপম তাহাদের সঙ্গে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল, হীরালাল একটু পশ্চাতে রহিল।

অভয়কে সে বলিল, "অভয়দা, দেখবে আজ অজয়বাবুর স্ত্রীকে—আজকের স্ত্রী নয়, হয়তো চার বছরের পুরোনো স্ত্রী—সুধু বিয়েটা হয় নি—দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে যাবে।"

সরমা তার পড়িবার ঘর গুছাইতেছিল। অজয়ের বিছানাটা তখনও সেখানে পাতা ছিল। ঘর গুছাইতে গুছাইতে সে বার বার সেই বিছানার দিকে চাহিতেছিল। এক একবার হঠাৎ তার ভুল হইতেছিল—বুঝি অজয় এখনও সেখানে শুইয়া আছে!

হঠাৎ সে দেখিতে পাইল অভয়, মায়া ও নিরুপম বাগানের ভিতর দিয়া আসিতেছে। দেখিয়া সে বাহির হইয়া সিঁড়ির তলায় দাঁড়াইল।

সরমা হাসিয়া বলিল, "কি সৌভাগ্য!—এ ক' দিন খবরই নেই—আজ যে বড় মনে প'ড়লো?"—তার পর তার

চোখ পড়িল পশ্চাতে হীরালালের উপর। সরমার মুখ চূণ হইয়া গেল—সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

সরমার মনে হইল তার মাথায় যেন খড়্গাঘাত হইল। আজ অভয় ও নিরুপমের সম্মুখে তার সেই লজ্জার কথাটা প্রকাশ হইয়া যাইবে, এই কথা ভাবিয়া সে একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গেল। কথঞ্চিৎ আত্মসংবরণ করিয়া সে তার পর বলিল "আসুন।" বলিয়া তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া ঘরে লইয়া বসাইল।

ঘরে বসিয়াই নিরুপম বলিল, "অভয়দা', বউদি, তোমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি। ইনি হ'চ্ছেন অজয়বাবুর স্ত্রী—তিন বছর আগে অজয়বাবু এঁকে নিয়ে হীরালালবাবুর দোকানে গিয়েছিলেন। তার পর অজয়বাবুর নামে যখন মোকদ্দমা হয়, তখন ইনি সব স্বীকার ক'রে হীরালালবাবুর পায় ধ'রে তার মুক্তি ভিক্ষা ক'রে নিয়েছিলেন।—হীরালালবাবু, আমার কথা ঠিক তো?"

হীরালাল বড় সঙ্কোচ অনুভব করিল—তার মনে হইল এ-সব কথার তাৎপর্য্য ভাল নয়,—ইহার ভিতর তার আসা উচিত হয় নাই। কিন্তু নিরুপায় হইয়া সে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

নিরুপমের কথার আরম্ভ হইতেই সরমা একেবারে ফ্যাকাসে হইয়া গেল। সে শক্ত হইয়া তার আসনে বসিয়া রহিল—কিন্তু হাত-পা তার ঠক-ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মায়া তার পাশে বসিয়া ছিল। তার বুক আগেই শুকাইয়া গিয়াছিল, এখন সে মরণ কামনা করিতে লাগিল। শঙ্কা-বিস্ফারিত চক্ষু দুটি দিয়া সে কাতর ভাবে সরমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল—সরমার মুখের ভাব দেখিয়া তার ভয় হইল—সরমার দুঃখে সে দুঃখ পাইল—কিন্তু সব চেয়ে বেশী হইল তার নিজের জন্য ভয়।

অভয় একেবারে হতভম্ব হইয়া প্রস্তর-মূর্ত্তিবৎ বিস্ফারিত নয়নে নিরুপমের দিকে চাহিয়া রহিল। নিরুপম তার বক্তব্য সমাপন করিলে সে চাহিল সরমার মুখের দিকে—সরমার মুখ দেখিয়া তার দয়া হইল। কিন্তু সে কোনও কথা বলিতে পারিল না। তার বাক্‌শক্তি এই অপ্রত্যাশিত সংবাদের আঘাতে একেবারে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল।

কিছুক্ষণ পর নিরুপম শ্লেষের সুরে বলিল, "কি বলেন সরমা দেবী—এ সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?"

এই শ্লেষে প্রস্তর-মূর্ত্তিতে যেন প্রাণ-সঞ্চার হইল। সরমা যেন মূর্চ্ছাভঙ্গে জাগিয়া উঠিল।

সে তার অন্তরের সকল শক্তি সংহত করিয়া অনৈসর্গিক প্রশান্ততার সহিত বলিল, "হীরালালবাবু, আপনার বোধ হয় আর দরকার নেই, আপনি এখন যেতে পারেন।"

হীরালাল অত্যন্ত অপ্রস্তুত ভাবে উঠিয়া নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিল। সে নিদারুণ অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল—এমনি ভাবে বহিষ্কৃত হইয়া যেন বাঁচিল।

সরমা তেমনি ধীরভাবে বলিল, "কি জিজ্ঞাসা ক'রছিলেন নিরুপমবাবু?"

নিরুপম তীব্রকণ্ঠে বলিল, "আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম যে এ সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?"

সরমা বলিল, "তার আগে, আপনার এ কথা জিজ্ঞাসা ক'রবার কি অধিকার আছে জানতে পারি কি?"

নিরুপম এ প্রশ্নে যেমন অপ্রস্তুত হইল, তেমনি হইল রুষ্ট। সে বলিল, "আমি জিগ্‌গেস ক'রছি অভয়দা'র হ'য়ে, বউদির হ'য়ে।"

"ওঁরা তো নাবালক নন?"

এ কথার জবাব নাই। কিন্তু নিরুপম হটিবার পাত্র নয়। সে বলিল, "বেশ, আপনি যদি কিছু না বলেন, সে আপনার ইচ্ছে—আমরা এ থেকে যা সিদ্ধান্ত হয় ক'রবো।"

সরমা বলিল, "তা অবশ্যই ক'রবেন। কিন্তু আপনার এ প্রশ্ন জিগ্‌গেস করবার অধিকার নেই ব'লছি ব'লে যে প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি কুণ্ঠিতা, তা মনে ক'রবেন না। আমার উত্তর এই যে আমি যে অজয়বাবুর স্ত্রী এ কথা হীরালালবাবুকে কেন, কারও কাছে ব'লতে আমার লজ্জা নেই।"

শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে সরমা কথা কয়টি বলিল, কিন্তু অশনি-সম্পাতের পর যেমন তীব্র গভীর নিস্তব্ধতা জগৎকে আচ্ছন্ন করে, এ কথার পর তেমনি একটা স্তব্ধ নীরবতা যেন ঘরখানাকে আবৃত করিল।

এক মুহূর্ত্ত কেহ কথা বলিতে পারিল না—নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত ফেলিতে পারিল না।

কথাটা এত বিস্ময়কর—এত অপ্রত্যাশিত যে ইহা যেন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহের মত অভয়ের মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া

গেল; সে কিছুক্ষণ ইহার তাৎপর্য্য সম্যক অনুভব করিতে পারিল না। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সে সরমার প্রশান্ত পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তার সেই মুখের দিকে চাহিয়া কোনও কথা তার মুখে আসিল না। নিরুপমের কথা শুনিয়া সে যেমন বিস্মিত হইয়াছিল, তেমনি সে অভিভূত হইয়াছিল তার অনুচিত ও অকরুণ কঠোরতায়। আর সে বিস্মিত ও অভিভূত হইল সরমার এই অপ্রত্যাশিত উত্তরের গাম্ভীর্য্য ও অপূর্ব্বতায়। সরমার মুখের দিকে চাহিয়া সে বুঝিল কত বড় আঘাত নিরুপম তাকে দিয়াছে—তার ব্যথা যেন অভয়ের বুকের ভিতর গিয়া লাগিল। কিন্তু সব চেয়ে বেশী অভিভূত হইল সে সরমার মূর্ত্তি ও কণ্ঠের ভিতর ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে অপূর্ব্ব মহত্ত্ব ও গৌরব তাহাতে!

মায়া নিরুপমের প্রশ্ন শুনিয়া যেন তার আসনের ভিতর মিশিয়া গিয়াছিল। লজ্জায় আত্মগ্লানিতে তার মনে হইতেছিল যে সে যদি কোনও অলৌকিক উপায়ে হঠাৎ সে স্থান হইতে বিলুপ্ত হইতে পারিত তবে সে বাঁচিত। নিদারুণ আশঙ্কায় সে যেন মরিয়া গেল, তীব্র ঔৎসুক্যের সহিত সে তার ব্যথিত দৃষ্টি সরমার দিকে ফিরাইল। প্রতি মুহূর্ত্তে তার মনে হইল বুঝি বা সরমা এখনি সত্য কথাটা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়া তার মাথায় বজ্র হানিয়া বসিবে। সরমার অগোচরে সে নিজে সরমার প্রতি নিদারুণ অবিচার করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই—সরমার অন্তরের সব চেয়ে গোপন কথা অভয়ের কাছে প্রকাশ করিয়া সরমার চরিত্রের উপর আক্ষেপ করিতে তার বাধে নাই—সরমা যে এত বড় বিপদের ভিতর পড়িয়া মায়ার মান রক্ষা করিয়া আপনাকে লাঞ্ছিত করিবে এ আশা তার হইল না। ঔৎসুক্য, আশঙ্কা, হতাশা তার দৃষ্টির ভিতর ফুটিয়া উঠিল। তার পর, সরমা যতক্ষণ নিরুপমের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করিল, ততক্ষণ সে নিদারুণ উৎকণ্ঠার সহিত প্রতীক্ষা করিল। সরমার মুখের অস্বাভাবিক প্রশান্ততার ভিতর সে তার অন্তরের নিষ্পিষ্ট ক্রোধাগ্নির গর্জ্জন শুনিতে পাইল। মায়া প্রমাদ গণিল। তার হৃৎপিণ্ড যেন স্তব্ধ হইয়া গেল।

তার পর সরমা যখন সমস্ত কথাটা মাথা পাতিয়া স্বীকার করিল, তখন মায়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। সরমার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার অন্তর আপ্লুত হইয়া গেল—ভুলিয়া গেল সে এ কয় দিন ধরিয়া সরমার উপর মনে মনে যত অবিচার করিয়াছিল। সরমার উপর তার সকল আক্রোশ বিলুপ্ত হইয়া গেল—সরমাকে তার কৃত কর্ম্মের জন্য ঘৃণা করিতে পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেল। সরমার এই কথায় তার অন্তরের যে অপরিসীম স্নেহ-বন্যা রুদ্ধ হইয়া ছিল ঘৃণায় ও ক্রোধে—তাহা মুক্ত হইয়া তাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল—তার ইচ্ছা হইল সরমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে, তার পদতলে লুটাইয়া পড়িতে। সরমার প্রতি সহানুভূতিতে তার অন্তর ভরিয়া গেল, তার জন্য সরমার যে এত বড় লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইল তাহাতে তার বুকের ভিতর ভয়ানক খোঁচা লাগিল—নিদারুণ আত্মগ্লানিতে তার মন ভরিয়া গেল। নিরুপমের উপর তার ভয়ানক ক্রোধ হইল—কিন্তু সাহস হইল না তার মুখ ফুটিয়া কথা বলিতে। তার মনে হইল সে ক্ষুরধার সূক্ষ্ম পথের উপর কোনও মতে টায়টোয় দাঁড়াইয়া আছে, সামান্য একটা ধাক্কায় সে হয় তো টলিয়া পড়িবে অতলস্পর্শ গহ্বরে। সত্য কথা যদি কোনও মতে প্রকাশ হয়, তবে যে কত বড় সর্ব্বনাশ হইবে তাহা ভাবিতে তার অন্তর শিহরিয়া উঠিল।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল নিরুপম, নিদারুণ হিংসা ও ক্রোধ তার মুখের প্রতি রেখায় রেখায় বিকটভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল—কিছুক্ষণ সে রাগে কথা বলিতে পারিল না। তার পর সে বলিল, "লজ্জা নেই আপনার তা' আমি জানি। নইলে যখন আপনার বোনের সঙ্গে অজয়ের বিয়ের কথা হ'চ্ছে অন্ততঃ তখন আপনি অজয়কে নিয়ে এমনি ঢলাঢলি ক'রতে পারতেন না। কিন্তু অজয় আপনার স্বামীটি কি রকম শুনি? একটা বিবাহ অনুষ্ঠানের বোধ হয় কোনও প্রয়োজন হয় নি আপনার, কেমন?"

কথাগুলি মায়ার বুকের ভিতর যেন শেলের মত বিঁধিল। সরমার এ অন্যায় নির্য্যাতন আর সে সহিতে পারিল না, তার অপরাধে তার সামনে যে সরমা এমন কঠিন শাস্তি পাইতেছে তাতে তার আপনাকে একেবারে ক্রিমিকীটের মত হীন ঘৃণ্য মনে হইল। সে তার সমস্ত সঙ্কোচ জয় করিয়া মাথা নাড়া দিয়া বসিয়া বলিল, "আসল কথা তুমি জান না ঠাকুরপো,"

মায়া মুখ খুলিতেই সরমা বুঝিয়া ফেলিল সে কি কথা বলিতে যাইতেছে। ধপ করিয়া মায়ার হাত চাপিয়া ধরিয়া

সে বলিল, "থাম মায়া, আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছেন, আমাকে উত্তর দিতে দে।"

মায়া স্তব্ধ হইয়া, অবাক হইয়া সরমার দিকে চাহিল। সরমা বলিল, "ঠিক কথা নিরুপমবাবু—লজ্জা নেই আমার। কিন্তু কিই বা জানেন আপনি যে, ব'লছেন আমার লজ্জা নেই বা তা' ব'লে আমায় লজ্জা দেবেন। আমি বলছি শুনুন, আমি অজয়বাবুর সঙ্গে গোপনে নির্জ্জনে অনেক সময় কাটিয়ে এসেছি। তা ছাড়া, এ কয় দিন অজয়বাবু এখানেই ছিলেন, আমি তাঁর সেবা ক'রেছি—এক রাত্রি তাঁর বিছানায় কাটিয়েছি—এই কিছুক্ষণ হ'ল তিনি বেরিয়ে গেছেন—এখনও আমার পড়বার ঘরে তাঁর বিছানা পাতা আছে। শুনলেন? এতে আমার লজ্জা নেই—কেন না আমি তাঁর স্ত্রী—বিয়ে হ'য়েছে কি না হ'য়েছে সে কথা নিষ্প্রয়োজন, ভগবানের চক্ষে ধর্ম্মের চক্ষে আমি তাঁর স্ত্রী!"

তার পর সে এক মুহূর্ত্ত থামিয়া বলিল, "শুনলেন তো? বুঝলেন তো যে আমার উপর লোভ ক'রে আমার বাড়ীতে ঘুর ঘুর ক'রে আসায় আপনার কোনও সার্থকতা নেই? এখন আপনি যেতে পারেন।"

সরমার এ বক্তৃতায় নিরুপম পর্য্যন্ত স্তব্ধ হইয়া গেল। এই স্পষ্ট স্বীকারোক্তির স্পর্দ্ধায় সকলেই স্তম্ভিত হইল—তার ভাল মন্দ বিচার করিবার শক্তি কারও রহিল না।

অভয় ও মায়া মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।

নিরুপম আপনাকে প্রহৃত ও পরাজিত অনুভব করিয়া নত মস্তকে বসিয়া দন্তে অধর দংশন করিতে লাগিল।—সরমা যে তাহাকে বিদায় হইতে বলিল তাহা সে গ্রাহ্য করিল না, সরমার কথার একটা উপযুক্ত উত্তর কল্পনা করিতে থাকিল।

অজয় ঠিক সেই সময় আসিয়া দুয়ারের কাছে দাঁড়াইল—কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিল না।

সে একটু পূর্ব্বে আসিয়াছিল। গেটে ঢুকিবার সময় সে দেখিল হীরালাল গাড়ীতে উঠিতেছে। ঘরে আসিয়া দেখিল সরমার কাছে মায়া, অভয় ও নিরুপম। এক মুহূর্ত্ত সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। প্রবেশ করিতে তার সঙ্কোচ হইল। অবস্থাটা বুঝিতে তার বিলম্ব হইল না। হীরালালকে সরমার সম্মুখীন করিয়া ইহারা সরমাকে তার কল্পিত অপরাধের জন্য তিরস্কার করিতে আসিয়াছে এ কথা সে বুঝিল, কিন্তু এ অবস্থায় তার কর্ত্তব্য কি তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া সে অল্পক্ষণ দুয়ারের বাহিরে দাঁড়াইল।

সেইখানে দাঁড়াইয়া সে নিরুপমের শেষ কথা শুনিল, মায়ার কথা বলিবার চেষ্টা দেখিল, আর পরিশেষে শুনিল সরমার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি। নিরুপমের কথা শুনিয়া সে রাগে ফুলিয়া উঠিল। মায়ার কথা শুনিয়া তার উপর তার শ্রদ্ধা হইল—সরমার কথা শুনিয়া গর্ব্বে আনন্দে তৃপ্তিতে তার হৃদয় প্লাবিত হইয়া গেল।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সে প্রবেশ করিয়া সরমার পাশে দাঁড়াইল। সরমা অগ্নিময় দৃষ্টিতে নিরুপমের দিকে চাহিয়াছিল। সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া তীব্রস্বরে বলিল, "ব'সে রইলেন যে? উঠুন, যান। এটা আমার বাড়ী, এখানে আসবার কোনও অধিকার নেই আপনার, জানেন? বেরিয়ে যান!"

নিরুপম উঠিল। একটা তীব্র কথা বলিয়া বিদায় হইবার জন্য উঠিল। মুখ তুলিয়াই সে দেখিল অজয়!

অজয় বাহুবেষ্টনে সরমাকে জড়াইয়া ধরিল। সরমা চমকিত হইয়া তার দিকে চাহিল, তার পর সে অজয়ের কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তখন সকলেই অজয়ের দিকে চাহিল।

অজয় দৃঢ় বাহুবন্ধনে সরমাকে আশ্রয় দিয়া বলিল, "সরমা, আমাকে ক্ষমা কর। আমি তোমার সম্মানের দিকে চেয়েই তোমায় দুঃখ দিয়েছি, আপনি দুঃখ পেয়েছি।—তার ফলে আজ তোমার এই অপমান! আমাকে ক্ষমা কর—আমিও বলছি আজ তোমার সঙ্গে—ভগবানের কাছে, ধর্ম্মের কাছে আমি তোমার স্বামী, তুমি আমার স্ত্রী!"

সরমা ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

অজয়কে দেখিতে পাইয়াই নিরুপম দম্ দম্ করিয়া পা ফেলিয়া বেগে প্রস্থান করিয়াছিল। অভয়ও বিব্রত ভাবে, কি করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল—কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত! মায়া তার কৌচের উপর এলাইয়া পড়িয়া চক্ষু ভরিয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল, তার মুখ চোখের জলে প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল।

অজয় সরমাকে বাহুবেষ্টনে জড়াইয়া ধরিয়া,—অভয়

ও মায়াকে বলিল, "আপনাদের দুজনেরই চিঠি আমি পেয়েছি—আপনারা এঁর সম্বন্ধে যা শুনেছেন সব ভুল। সরমা কি আমি এমন কোনও কাজ করি নি বা কোনও কথা বলি নি যা' সমস্ত জগতের কাছে মাথা খাড়া ক'রে বলা না যায়। কি ভগবানের বিধি, কি মানুষের বিধি, কোনওটাই আমরা উল্লঙ্ঘন করি নি।"

সরমার কান্নার বেগ যখন কমিয়া আসিল তখন তার খেয়াল হইল যে এমনি করিয়া সবার সামনে অজয়ের কণ্ঠলগ্ন হইয়া থাকাটা বড় অশোভন; সে তখন ধীরে ধীরে আপনাকে অজয়ের বাহুমুক্ত করিয়া আসনে বসিয়া পড়িল। অজয় অভয়কে সঙ্গে করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল—সরমার পড়িবার ঘরে বসিয়া সে অভয়কে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিল। শুধু বলিল না মায়ার সঙ্গে হীরালালের ব্যাপারের সম্পর্কের কথা।

অশ্রুমুখী মায়া সরমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "দিদি আমার, আমায় মাপ কর। আমার বুদ্ধির দোষে তোর এই লাঞ্ছনা হ'ল, তুই ক্ষমা কর। মিথ্যে তোর নামে আমি মন্দ কথা মনে ঠাঁই দিয়েছিলাম। আমার অপরাধের শেষ নেই ভাই। কিন্তু তুই আমার উপর রাগ করিস নে।"

সরমা মায়াকে বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া তাকে চুম্বন করিয়া বলিল, "পাগস? তোর উপর আমি কোনও দিন রাগ ক'রতে পারি? আর এখন—এখন যে পৃথিবীর কারও উপর আমার রাগ নেই ভাই—আনন্দে যে বুক ছাপিয়ে প'ড়ছে।"

কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পরে মায়া হাসিয়া বলিল, "যা ব'লেছিলি শেষ তাই করলি তুই? অজয়কে নিয়ে elope করবি ব'লেছিলি—এ তো প্রায় তাই হ'ল।"

সরমা স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, "হাঁ ভাই, আমরা এক কথা ভেবে একটা কথা বলি, ভগবান সে কথা শুনে সেই মুখের কথাই সত্য ক'রে দেন অন্য ভাবে।"

হঠাৎ সরমার একটা কথা মনে পড়িল। সে বলিল, "ওঃ যা! আমার যে একটা ভুল হ'য়ে গেছে। চল অভয় বাবুকে খুঁজে বের করি।"

সরমা মায়াকে লইয়া অভয়ের কাছে গেল।

অভয় তখন অজয়ের কাছে সকল কথা শুনিয়া উৎফুল্ল অন্তরে অজয়ের সঙ্গে কথা কহিতেছিল।

সরমা তার কাছে আসিয়া লজ্জারক্ত, স্মিত মুখে বলিল, "অভয়বাবু, আপনাকে কথা দিয়েছিলাম, তাই বলছি, এঁকে বিয়ে ক'রবো। অনুমতি করুন।"

আনন্দে অভয় কথা কহিতে পারিল না, সে শুধু বলিল, "বেশ, বেশ, বেশ।"

শেষ

জীব-বধূ

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

যৌবন-সুধা আহরি',
দেহের দুয়ারে দাঁড়াইল বধূ—
বক্ষে বহিয়া গাগরী।

রূপ-রহস্যে দিঠি বিব্রত,
দুটি আঁখি-পাতা শিহর-আনত,
অনব্যক্ত রসাভাসে উঠে
কপোল-কোরকে ভা ভরি'।

মায়াময় মন মৃদুহাসে দিল
মৌন ওষ্ঠ আবরি',
অনুপ্রবেশী প্রেমিক পরাণ
প্রণয়ে বাঁধিল আঁকড়ি'।
জীবনের জরা দূরমপগত,
মরণ—অমৃত-উৎসব-রত,
অন্তরশায়ী পরম আত্মা
চাহিল চমকি' জাগরি'।

হরপ্রসাদ-স্মৃতি-তর্পণ

অধ্যাপক শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বেদশাস্ত্রী, এম-এ

তর্পণ

পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা স্মরণ করিলেই আমার মনে মহাকবি কালিদাসের দুষ্মন্তের একটি উক্তি উদিত হয়। অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের সপ্তম অঙ্কে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার মিলন হইবার পরে দুষ্মন্ত মহর্ষি মারীচের দর্শন লাভ করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

ভগবন্ প্রাগভিপ্রেতসিদ্ধিঃ পশ্চাদ্দর্শনম্ অতোঽপূর্ব্বঃ খলু বোঽনুগ্রহঃ, কুতঃ—

উদেতি পূর্ব্বং কুসুমং ততঃ ফলং
ঘনোদয়ঃ প্রাক্ তদনন্তরং পয়ঃ।
নিমিত্তনৈমিত্তিকয়োরয়ং ক্রম-
স্তব প্রসাদস্য পুরস্ত সম্পদঃ॥

হে ভগবন্, প্রথমেই আমার অভিলষিত বস্তু লাভ হইয়াছে, পরে আপনার দর্শন পাইয়াছি, অতএব আপনার এই অনুগ্রহ অপূর্ব্ব; কেন না বৃক্ষাদিতে প্রথমে পুষ্প (কারণ) দেখা দেয়, পরে ফল (কার্য্য) হয়, আকাশে প্রথমে মেঘ (কারণ) দেখা যায়, পরে বৃষ্টি (কার্য্য) হয়; কার্য্যকারণের এইরূপ পৌর্ব্বাপর্য্য সর্ব্বজনবিদিত; কিন্তু আমার বিষয়ে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতেছে, কেন না আপনার দর্শনরূপ অনুগ্রহ পাইবার পূর্ব্বেই তাহার ফল শকুন্তলা লাভ আমার ঘটিয়াছে।

দুষ্মন্তের এই উক্তির অনুরূপ উক্তি করিয়া শাস্ত্রী মহাশয়কে (১) মনে মনে সম্বোধন করিয়া অনেকবার বলিয়াছি—হে গুরুদেব, আপনার দর্শন পাইবার পূর্ব্বেই আমি আপনার অনুগ্রহ পাইয়াছি। সেই অনুগ্রহের বিষয় বলিয়াই আমি আজিকার কথা আরম্ভ করি।

বাঙ্গালা ১৩১১ সাল, বৈশাখ মাস; বাঙ্গালদেশে বিবাহের ধূম লাগিয়াছে। প্রায় ১॥ মাস পূর্ব্বে (ইংরাজী ১৯০৪ সালের মার্চ্চ মাসে) প্রবেশিকা (Entrance) পরীক্ষা দিয়াছি। হাতে কাজকর্ম্ম তেমন নাই, বিবাহের বরযাত্রিরূপে ২।১টা বিবাহের সাক্ষী হইয়াছি। আর একটা বিবাহ উপস্থিত ১৯শে বৈশাখ তারিখে। চন্দননগরের সরিষাপাড়ায় আমাদের এক সহপাঠীর বিবাহ। কন্যাদান আরম্ভ হইয়াছে, আমরা দেখিতেছি; হঠাৎ একজন লোক আমাকে বলিলেন "তোমাকে আশুবাবু ডাকিতেছেন।" আশুবাবু—শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় —আমাদের আশু'দাদা'—আমাদের প্রতিবেশী; যখন বর যাত্রা করেন তখন তিনি আমাদের সঙ্গে আসিতে পারেন নাই, কলিকাতায় গিয়াছিলেন। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গণিতের অধ্যাপক—আমাদের সকলেরই পূজ্য, গুরুস্থানীয়। তাঁহার আহ্বান! বিলম্ব না করিয়া বাহিরে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলাম। তিনি বলিলেন—"তুমি সংস্কৃতে"—"নম্বর পাইয়াছ এবং অমুক স্থান অধিকার করিয়াছ। শাস্ত্রীমহাশয় বলিয়াছেন—তোমাকে সংস্কৃত কলেজে পড়িতে হইবে।" শাস্ত্রীমহাশয় সংস্কৃতের প্রধান পরীক্ষক ছিলেন এবং আশুদাদা আমার পরীক্ষা ফল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় আনন্দের সহিত উক্তরূপ আদেশ করিয়াছিলেন। পরীক্ষার ফল শুনিয়া তখন আমার আনন্দিত হইবার বয়স। কিন্তু আমার আনন্দের সঙ্গে জাগিয়া উঠিল বিষাদ। বলিলাম "আপনি ত জানেন আমার বাবা কত গরীব, আমি কলিকাতায় পড়িবার টাকা কোথায় পাইব! কলিকাতায় পড়িবার ভাগ্য আমার নাই; হুগলী কলেজেই পড়িব, 'হাঁড়ির ভাত' চারিটি খাইয়া কলেজে যাইব, যেমন করিয়াই হৌক বাবা কলেজের মাহিনা ৬৲ টাকা দিবেন।" আশুদাদা উত্তর করিলেন "আচ্ছা, মামা (আমার বাবাকে আশুদাদা মামা বলিতেন) যেন তোমাকে ৬৲ টাকাই দেন। তুমি তাঁহাকে বলিবে, তোমাকে কলিকাতায় যাইতেই হইবে।"

১ বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলে যেমন কেহ ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষকে বা ৺জীবানন্দ ভট্টাচার্য্যকে বুঝেন না, এক ঈশ্বরচন্দ্রকেই বুঝেন, তেমনই আমাদের পঠদ্দশায় এবং তাহার পরেও আমরা শাস্ত্রীমহাশয় বলিলে অন্য কাহাকেও না বুঝিয়া হরপ্রসাদকেই বুঝিতাম।

সে রাত্রিতে কথা ঐ পর্য্যন্ত। তখন জানিতাম না—আমার মঙ্গলের জন্য শাস্ত্রীমহাশয় ও আশুদাদা কিরূপ পরামর্শ করিয়াছিলেন। আমার মত লোকের পক্ষে কলিকাতায় পড়ার আশা অন্য অনেকেরই বিলাতে পড়িবার আশার ন্যায়।

উক্তরূপ কথাবার্ত্তার পর আমার মনে অপ্রাপ্য বস্তুর প্রতি অতিলোভের ন্যায় একরূপ লোভ জাগিল; কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে সেই লোভকে পর্য্যুদস্ত করিয়া ভীষণ মূর্ত্তিতে দেখা দিতে লাগিল আমার দারুণ দারিদ্র্য। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ায় বন্ধুর বিবাহের আমোদ আমার নিকট ফিকা বোধ হইতে লাগিল।

যথাসময়ে গৃহে ফিরিয়া বাবাকে সব কথা বলিলাম। বাবা আশুদাদার সহিত পরদিন দেখা করিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া অশ্রুপ্লাবিত নয়নে আশুদাদাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে আমাকে যাহা বলিলেন তাহা হইতে আমি সংগ্রহ করিলাম এই যে, শাস্ত্রীমহাশয় আমাকে ২৲ মাহিনায় কলেজে পড়িতে দিবেন এবং আশুদাদা নিজ বাসায় আমাকে রাখিয়া আমার আহার্য্যের ব্যয় বহন করিবেন; বাবা আমাকে যে ৬৲ দিবেন তাহা হইতে আমি কলেজের মাহিনা দিব, কাগজ-কলম কালী ও পুরাতন পুস্তক কিনিব, প্রয়োজন মত একখানা ধুতি ও একটা টুইলসার্ট কিনিয়া লইব এবং কোনও কোনও শনিবারে বাড়ী যাইব। বাবার চোখে সেদিন জল দেখিয়াছিলাম, তখন ভাল বুঝি নাই আমি কলিকাতায় পড়িতে যাইব, ইহাতে চোখে জল কেন; আজ শাস্ত্রীমহাশয়ের শ্রাদ্ধবাসরে এ কথা লিখিতে বসিয়া তাঁহার অযাচিত অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া আমার চোখে জল আসিতেছে, এই জলের একবিন্দু শাস্ত্রীমহাশয় স্বর্গ হইতে গ্রহণ করুন।

১৯০৪ সালের গ্রীষ্মাবকাশের পর সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইলাম। আমি পণ্ডিতের বংশোদ্ভূত বলিয়া কর্ত্তা (২) আমার কলেজের মাহিনা ২৲ স্থির করিয়া দিলেন। কিন্তু ইহার জন্য আমাকে তাঁহার সম্মুখে হাজির হইতে হইয়াছিল। তিনি স্বাভাবিক মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোমার নাম কি'? উত্তরে কৌলিক উপাধি 'চট্টোপাধ্যায়' শুনিয়া তিনি আশুদাদার মুখের প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—'ভট্টাচার্য্য নয়?' উত্তর আমিই দিলাম—'না; আমার বাবা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কর্ম্ম এবং কথকতা করেন বলিয়া ভট্টাচার্য্য লেখেন; আমার পিতামহ লিখিতেন তর্কবাগীশ, আমার প্রপিতামহ লিখিতেন ন্যায়বাগীশ—তাঁহাদের ন্যায়ের টোল ছিল; আমরা—ভায়েরা—এখনও পণ্ডিত হই নাই বলিয়া এবং কুলীনের সন্তান বলিয়া কৌলিক উপাধিই ব্যবহার করি।' কর্ত্তা আমার মুখের দিকে একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইলেন; তাঁহার মধুর স্বর আগেই শুনিয়াছি, ভয় পাইলাম না; তিনি কি বুঝিলেন জানি না, কিন্তু আর কোনও প্রশ্ন করেন নাই।

(২) সংস্কৃত কলেজের ভিতরে শাস্ত্রীমহাশয়কে আমরা কর্ত্তা বলিতাম, তিনি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন বলিয়া।

কাব্যরসিক শাস্ত্রীমহাশয়।

কর্ত্তা ছিলেন বিবিধবিদ্যাহৃদয়গ্রাহী, বিশেষ করিয়া কাব্যরসিক। তাঁহার কাব্যসমালোচনার পরিচয় আমরা প্রথমে সাক্ষাৎ ভাবে পাই নাই। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িবার সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের অতিরিক্ত কোনও কোনও পুস্তক আমাদিগকে পড়িতে হইত, সিনিয়ার বৃত্তিপরীক্ষার জন্য। কথা ছিল কর্ত্তা আমাদিগকে কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র পড়াইবেন। আফিসের কার্য্যে ব্যস্ততা প্রযুক্ত সময়াভাব হওয়াতে তিনি আমাদিগকে ঐ পুস্তক পড়াইতে পারেন নাই, ইহা আমাদেরই দুর্ভাগ্য। আমাদের মনে একটা ক্ষোভ থাকিয়া গিয়াছিল। এই ক্ষোভ পরে দূর হইল কর্ত্তার দ্বারা পরিচালিত মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের অভিনয়ের মহলা (rehearsal) ও পরে অভিনয় দেখিয়া। এই অভিনয়াভ্যাস দেখিয়া যাহা শিখিয়াছি, তিনি আমাদিগকে পড়াইলে তদপেক্ষা বেশী শিখিতে পারিতাম বলিয়া মনে হয় না।

নাটক কাব্য বটে, কিন্তু দৃশ্যকাব্য। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণকে নাটক পড়াইবার সময়ে রাজা=নৃপতিঃ অথ=অনন্তরং ইত্যাদি প্রতিশব্দ দিবার বা সরলার্থ দিবার আবশ্যকতা ছিল না; এটুকু ছাত্রেরা নিজেরাই করিয়া লইতে পারিত। ইহাদিগকে বুঝাইবার প্রয়োজন ছিল—নাটকের কাব্যত্ব, রস, সন্ধি এবং নাটকীয় পাত্রের চরিত্র-বিশ্লেষণের জন্য কোন্ উক্তির কতটুকু আবশ্যক। কর্ত্তা

TIGHT BINDING

এই কাজ করিয়াছিলেন মালবিকাগ্নিমিত্রের মহল্লায়। আহার ও বিশ্রাম ভুলিয়া তিনি কলেজের ছুটির পরে এই কার্য্যে রত হইতেন এবং নিজে বৃদ্ধ হইলেও যুবকের উদ্যমে rehearsal চালাইতেন। তিনি যে কলেজের অধ্যক্ষ, এ কথা ভুলিয়া যাইতেন এবং সকল ছাত্রের সহিত বন্ধুভাবে মিশিয়া ভাব অনুভাব বিভাব ইত্যাদি তন্ন-তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিতেন এবং আবৃত্তির ভঙ্গী (বাচনিক অভিনয়), অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়িবার ভঙ্গী (কায়িক অভিনয়) এবং ভাবপ্রকাশের (সাত্ত্বিক অভিনয়) প্রণালী শিখাইয়া দিতেন। এবং 'আহার্য্য' অভিনয়ও যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় এই উদ্দেশ্যে "পাথুরে প্রমাণ" (৩) সংগ্রহ করিবার জন্য মাঝে মাঝে ৺অমৃতলাল বসুকে (তখন ষ্টার থিয়েটারের ম্যানেজার), একজন চিত্রকরকে ও একজন বেশকারককে সঙ্গে লইয়া যাদুঘরে (Indian Museum) গিয়া প্রাচীন কালের ঘরবাড়ীর আকৃতি ও সাজ-পোষাকের ধরণ বুঝাইয়া দিতেন এবং অমৃতবাবুর ইঙ্গিতমত চিত্রপট ইত্যাদি আঁকিতেন এবং বেশকারক সাজ-পোষাক তৈয়ারি করিতেন। (৪) সখ করিয়া অভিনয় করিতে গিয়া এত যত্ন লওয়া ও এত অর্থব্যয় করা এক বেলগাছিয়া নাট্যশালার পরিচালকগণ (রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি) ভিন্ন অন্য কেহ করিয়াছেন, ইহা বড় দেখা যায় না।

কলেজের ছুটির পরে অভিনয়ের মহল্লা চলিত এবং কর্ত্তা নিজ ব্যয়ে সকলের জলযোগের ব্যবস্থা করিতেন। ছাত্রেরা অভিনয়ের মহল্লায় যোগ দেওয়া একটা তামাসা বা হুজুগ মনে করিত না; তাহারা মনে করিত যেন ক্লাশের পাঠ গ্রহণ করিতেছে; মহল্লার সময়ে সংযম বিনয় প্রভৃতি কোনটিরই অভাব থাকিত না, অথচ কর্ত্তা কোনও দিন নিজের প্রভুত্ব খাটান নাই, কাহাকেও শাসন করেন নাই; বরং সকল সময়েই বন্ধুর ন্যায় সরস ব্যবহার করিতেন। ভাটপাড়ার শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য (এক্ষণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) অগ্নিমিত্রের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রথম-মহল্লা-দিন হইতেই—কর্ত্তা ডাকিতেন "রাজা" বলিয়া এবং জীবনের শেষ পর্য্যন্তই 'রাজা' বলিয়া গিয়াছেন। রাজার সকল আবদার কর্ত্তা শুনিতেন, এ জন্য আমাদের কোনও কথা কর্ত্তাকে বলিতে হইলে আমরা রাজাকে ধরিতাম (৫)। আমরা অভিনয়ের মহল্লায় উপস্থিত থাকিয়া যাহা দেখিতাম ও শুনিতাম, তাহা হইতে যে কেবল মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক আমাদের সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে পড়া হইয়াছে তাহা নহে, সংস্কৃত নাটকসমূহ পড়িবার কৌশলও আমাদের অধিগত হইয়াছে। কর্ত্তার নিকট শিক্ষিত কৌশল আমাদের অনেকেরই কর্ম্মজীবনে আজ পর্য্যন্ত সহায়তা করিতেছে (৬)।

মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রথম অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন—অক্সফোর্ডের বোডেন (Boden) প্রফেসার ম্যাকডোনেল সাহেব। ১৯০৭ সালে এই নাটকের দ্বিতীয়বার অভিনয় হয়; বঙ্গের ছোটলাট স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজার ও তৎপত্নী এই অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন। অভিনয়ের পূর্ব্বে

(৩) প্রস্তর-খোদত মূর্ত্তি আদি এবং শিলালেখকে শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেন পাথুরে প্রমাণ।

(৪) মালবিকাগ্নিমিত্রের অভিনয়ে যে দৃশ্যাবলী ও সাজপোষাক ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহার ২।১টির চিত্র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের 'কালিদাস' গ্রন্থের মধ্যে আছে। আজকালকার বাঙ্গালা নাট্য-পরিচালকদের মধ্যে প্রথমে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয় সময়োপযোগী সাজ পোষাক ও দৃশ্যাবলীর দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন।

(৫) কলেজের বৃদ্ধ দপ্তরীকে কর্ত্তা খাতির করিতেন; কর্ত্তা যখন কলেজের ছাত্র, তখন এই ব্যক্তিই দপ্তরী ছিল; এই দপ্তরী কর্ত্তার ছাত্রজীবনের ২।৪ কথা মাঝে মাঝে আমাদিগকে বলিত। আমাদের অর্দ্ধাবকাশের খেয়াল হইলে বা একদিন ছুটির ঝোঁক হইলে—আমরা ধরিতাম এই দপ্তরী মিঞাকে। দপ্তরী কর্ত্তাকে বুঝাইয়া দিত, অমুক লোক অমুক সময়ে কলেজ দেখিতে আসিয়াছিলেন, সে ছুটিটা পাওনা আছে, ইত্যাদি, কর্ত্তা এমন ছুটি মঞ্জুর করিতেন। সেই বুড়ামিঞার পুত্র এখন সংস্কৃত কলেজের দপ্তরী হইয়াছে।

(৬) অভিনয় করিয়া ছেলে খারাপ হইয়া যায়—এরূপ উক্তির প্রতিবাদস্বরূপে আমি অভিনেতাদের ২।৪ জনের নাম করিব। একজনের নাম পূর্ব্বেই করিয়াছি—রাজা গুরুপ্রসন্ন; নাটকের সঙ্গীতাচার্য্য-দ্বয়ের ভূমিকা যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন সম্প্রতি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে সমাসীন ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত; রাণী ইরাবতী কুমিল্লা কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন; মালবিকা সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলকে রক্ষা করিয়াছেন এবং এক্ষণে ঐ মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টার ও গৌহাটী শিলং মোটর কোম্পানীর সেক্রেটারি।

একটি ক্ষুদ্র ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া রাখা মন্দ নহে। অমূল্যরতন অধিকারী (পরে কুমিল্লা কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক হইয়াছিলেন) বিদূষকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইঁহার অভিনয়কৌশল দেখিয়া অমৃতবাবু ভূয়সী প্রশংসা করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, পেশাদারী থিয়েটারে ওরূপ বিদূষক এ পর্য্যন্ত হয় নাই এবং তিনি বিদূষকের ওরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় কল্পনা করিতে পারেন না। অমূল্যবাবু সেবার এম-এ পরীক্ষা দিয়াছেন; তাঁহার প্রতি সকলেরই দৃষ্টি—কারণ যাঁহারা এই নাটক পড়িয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে, বিদূষকই এই নাটকের প্রাণস্বরূপ। এহেন-যে বিদূষক অমূল্যবাবু—তিনি পরীক্ষার পাশ-নম্বর হইতে ২।১ নম্বর কম পাইয়াছেন। চারিদিকে শিহরণ উঠিয়াছে। লাটসাহেব অভিনয় দেখিবেন, তার পূর্ব্বে পরীক্ষার ফল বাহির হইলে নিশ্চয়ই অমূল্যবাবুর মন খারাপ হইয়া যাইবে এবং তিনি হয় অভিনয় করিবেন না, বা না হয় খারাপ অভিনয় করিবেন। এ এক সমস্যা! পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্ব করা হউক,—কেহ কেহ এরূপ ভাবিলেন; এক অমূল্যবাবুর জন্য সকলের ফল আটকাইয়া রাখা উচিত নহে, কেহ কেহ ইহাও বলিলেন। কথা কেমন করিয়া মুখুজ্জে মহাশয়ের (Sir Asutosh) কাণে উঠিল। তিনি ব্যাপারটা জানিয়া লইয়া না কি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, বিদূষক কখনও ফেল হয়? পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইলে দেখা গেল—গেজেটে অমূল্যবাবুর নাম আছে। অমূল্যবাবু এক্ষণে পরলোকে।

বিপত্নীক শাস্ত্রী মহাশয়

মালবিকার অভিনয়ের পরে উত্তরচরিতের অভিনয়ের কথা উঠিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের তখন পত্নীবিয়োগ হইয়াছে। 'রাজা' গুরুপ্রসন্ন প্রস্তাব করিলেন, কালিদাসের একখানা নাটক অভিনয় করা গেল, ভবভূতির একখানা নাটক অভিনয় করা উচিত। উত্তররামচরিত অভিনয় হইবে এরূপ স্থির করিয়া রাজা শাস্ত্রী মহাশয়ের খাস-কামরায় একদিন দেখা করিতে গেলেন এবং বলিলেন, আপনি আমাদের উত্তরচরিতখানি অভিনয় করাইয়া দিন। শাস্ত্রী মহাশয় উত্তরচরিতের নাম শ্রবণ করিয়া বাষ্পাকুল হইয়া বলিলেন—"রাজা, উত্তরচরিতের আর অভিনয় কেন? আমার জীবনেই ত উত্তরচরিত আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।" রাজা নিঃশব্দে বাহিরে আসিয়া এ কথা সকলকে বলিলেন; তখন ভবভূতির,

> একো রসঃ করুণ এব নিমিত্ত-ভেদাদ্
> ভিন্নঃ পৃথক্ পৃথগিবাশ্রয়তে বিবর্ত্তান্।

করুণরসাত্মক নাটক অভিনয় করিয়া শাস্ত্রী মহাশয়কে কষ্ট দিবার সংকল্প পরিত্যক্ত হইল।

মেঘদূত-ব্যাখ্যাতা

কাব্যসমালোচনা-প্রসঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয়ের মেঘদূত-ব্যাখ্যার উল্লেখ একান্ত আবশ্যক। অমর কবি কালিদাসের অপূর্ব্বসুন্দর মেঘদূত কাব্যের পূর্ব্বমেঘ 'কবিত্বের একটি ভাবময় লহর, উহাতে জড় প্রকৃতিকে চৈতন্যময় করিয়া তুলিয়াছে',—আর উত্তরমেঘ পার্থিব কলুষবিবর্জ্জিত অদ্ভুত সৌন্দর্য্যময় চৈতন্যময় প্রকৃতির প্রেমে আঁটা মানবহৃদয়ের চিত্র। 'মেঘদূতে সব নূতন সৃষ্টি, পৃথিবী, গাছা, পালা, বন, জঙ্গল, স্ত্রী, পুরুষ, সমাজ, সামাজিক সব ছাড়িয়া নূতন সৃষ্টি।—অলকা এক নূতন সৃষ্টি। এত বড় ভারতবর্ষটা ইহাতে কালিদাসের কুলাইল না। তিনি ভারতবর্ষ ছাড়া অনেক দেশ জানিতেন। পারস্য জানিতেন, যবনদেশ জানিতেন, যে সকল দ্বীপ হইতে লবঙ্গপুষ্প কলিঙ্গদেশে আনীত হইত তাহাও জানিতেন; এ সকল দেশে তাঁহার পছন্দমত জায়গা পাইলেন না। তাই তিনি হিমালয়ের তুঙ্গতম শৃঙ্গে—মনুষ্যের অগম্য—কেবল তাঁহার কল্পনা-মাত্রের গম্য—স্থানে অলকানগর বসাইলেন'। এ এক নূতন সৃষ্টি—'কবির সৃষ্টির' এক 'প্রকাণ্ড খেলা।' শাস্ত্রী মহাশয়ের মেঘদূত-ব্যাখ্যা আর এক নূতন সৃষ্টি—এক অদ্ভুত সৃষ্টি, বাঙ্গালা সাহিত্যে এক প্রকাণ্ড দান। শাস্ত্রী মহাশয়ের নিজের ভাষায়—'সংস্কৃত কাব্যের বাঙ্গালা ব্যাখ্যা নূতন, ভাষা ছাড়িয়া, ব্যাকরণ ছাড়িয়া, অলঙ্কার ছাড়িয়া, শুদ্ধ সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা নূতন। সৌন্দর্য্য বুঝাইতে গিয়া, ভূগোল, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, স্বভাব, নরচরিত প্রভৃতির কথা নূতন।' কিন্তু এই নূতনের জন্য তিনি 'ত্রিশ বৎসর ধরিয়া প্রস্তুত' হইতেছিলেন। তাঁহার উক্তি—'প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়াছি, নানা দেশে ভ্রমণ করিয়াছি, নানা গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি; দৃষ্টির মণ্ডল যতই বাড়িতেছে, সৌন্দর্য্যের চমৎকারিতাও ততই বাড়িয়া যাইতেছে।' মেঘদূত কাব্যখানি আকারে ছোট—ইহাতে মাত্র ১২০টি

শ্লোক আছে। ('পার্শ্বাভ্যুদয়' নামক জৈনচরিত গ্রন্থের প্রত্যেক শ্লোকের শেষ চরণ মেঘদূতের শ্লোকেরই শেষ চরণ, মেঘদূতের অনুকরণে জিনসেন কর্ত্তৃক পার্শ্বাভ্যুদয় রচিত; পার্শ্বাভ্যুদয়ে ১২০ শ্লোক আছে বলিয়া মেঘদূতে ১২০টি মাত্র শ্লোক ছিল এইরূপ বলিতেছি)। এই ক্ষুদ্র কাব্যের ব্যাখ্যার জন্য শাস্ত্রী মহাশয়ের পরিশ্রমের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইতে হয়। অপূর্ব্ব কাব্য, ব্যাখ্যাতার অনন্য-সাধারণ প্রতিভা, অদ্ভুত ব্যাখ্যা!

এই অদ্ভুত নূতন ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া তিনি 'এক কথায় বড় ঠেকিয়া' গিয়াছিলেন—তাহা রুচি। 'রুচি দেশ-কালপাত্র অনুসারে বদলায়, সৌন্দর্য্য বদলায় না।' কালিদাসের কাব্যের সৌন্দর্য্য বুঝাইতে গিয়া শাস্ত্রীমহাশয়কে কালিদাসের বশেই যাইতে হইল, কিন্তু 'অনেক জিনিষ এখনকার রুচিসঙ্গত হইবে না বেশ বোধ হইল'। প্রথমে ইচ্ছা ছিল না পুস্তক ছাপাইবেন, পরে বন্ধুবান্ধব ও ছাত্রগণের অনুরোধে ছাপাইয়াছিলেন। পুস্তক ছাপাইবার পূর্ব্বে তিনি দুইজন সুপণ্ডিত, সুরসিক বিচক্ষণ লোকের হাতে রুচি পরীক্ষার ভার দিয়াছিলেন। একজন এফ্, ই, পার্জ্জিটার, আর একজন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। ইঁহাদের উপদেশমত অনেক স্থান উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে ও অনেক স্থান বদলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। 'সৌন্দর্য্যের হানি হইয়াছে। কিন্তু সুরুচির অনুরোধে তাহা' শাস্ত্রীমহাশয় 'স্বীকার' করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি তিনি রুচিবাগীশদের হাত হইতে নিস্তার পান নাই। এইবার সেই কথাই বলিব, এই কথা তাঁহার মুখ হইতেই শুনিয়াছি।

আমরা যখন কলেজের ছাত্র তখন 'মেঘদূতব্যাখ্যা' বাজারে পাওয়া যায় না। আমরা লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, ঐ গ্রন্থের বিক্রয় গবর্ণমেণ্ট বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ব্যাপারটা তখন ঐরূপই মানিয়া লইয়াছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া একদিন সাহস করিয়া শাস্ত্রীমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম—'মেঘদূতব্যাখ্যা বাজারে পাওয়া যায় না কেন?' তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি নিজে উহার বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারিতে সমস্ত বই জমা আছে। আমি সকল কথা জানিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করায় তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এইরূপ—

মেঘদূতব্যাখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩০৯ সালে। কাব্য-রসপিপাসুগণ তন্ময়চিত্তে মেঘদূতের রস পান করিতে লাগিলেন। কিন্তু একদল উৎকট রুচিবাগীশ—যাঁহাদের নিকট নীতিবোধ, বোধোদয়, জ্ঞানাঙ্কুর বা ঐরূপ গ্রন্থ ভিন্ন সকল গ্রন্থই অশ্লীল—মেঘদূতব্যাখ্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, অযথা কর্কশ-সমালোচনা করিলেন এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিলেন যেন ঐ বইএর বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজার তখন বাঙ্গালার ছোটলাট। তিনি শাস্ত্রীমহাশয়ের বড় খাতির করিতেন। একদিন শাস্ত্রীমহাশয়কে ডাকাইয়া তিনি হাসিয়া নালিশের কাগজপত্র সব দেখাইলেন। সেদিন শাস্ত্রীমহাশয় লাটসাহেবকে ছাত্ররূপে কল্পনা করিয়া বুঝাইলেন, কালিদাস কিরূপ কবি, মেঘদূত কিরূপ কাব্য এবং তাঁহার নিজের ব্যাখ্যার বিশেষত্ব কি। লাটসাহেব মহা খুসী। বই বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিবার আবেদনের কি দশা হইল তাহা অনুমেয়। লাটসাহেব না কি বলিয়াছিলেন—আপনি দেখিবেন যেন ছোট ছেলেপিলের হাতে বইটা না পড়ে অর্থাৎ দাম (দাম ছিল ॥৵ মাত্র) কিছু বাড়াইয়া দিবেন। লাটপ্রাসাদ হইতে ফিরিয়া আসিয়া শাস্ত্রীমহাশয় বইএর বিক্রয় একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন! এই পর্য্যন্ত শুনিয়া আমি সাহস করিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলাম—অভিমানে বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিলেন? তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, হাঁ, বাঙ্গালাদেশে এরূপ বই না চলাই ভাল, এরা নীতিবোধ আর বোধোদয় পড়ুক! বাঙ্গালাদেশ একটা অপূর্ব্ব রসাস্বাদনে বঞ্চিত হইল, বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য! আমি সেদিন ক্ষীণ আবেদন জানাইয়াছিলাম—আমি একখানা বই পাইতে পারি না? তখন তাঁহার ইঙ্গিত মত সন্তোষ (জ্যেষ্ঠপুত্র) চামড়া দিয়া সুন্দর করিয়া বাঁধান একখানি বই আনিয়া আমাকে দিল, আমি তাহা মস্তকে ধারণ করিলাম। দুঃখের বিষয়, আমি গৌহাটীতে আসিবার পর কোনও ভদ্র (?) লোক সেই পুস্তক পড়িবার জন্য লইয়া গিয়া আর আমাকে ফেরত দেন নাই, বোধ হয় নিজের লাইব্রেরীতে তাহা সাজাইয়া রাখিয়াছেন। (৭)

(৭) এই প্রসঙ্গে, শাস্ত্রীমহাশয়ের পর বৎসরের গ্রাজুয়েট (১৮৭৭) রায় বাহাদুর প্রসন্ন নারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের 'প্রমোদ' নামক পুস্তিকা হইতে দুইটি উক্তি পাঠককে উপহার দিতেছি—

শাস্ত্রীমহাশয়ের ইচ্ছা ছিল—কালিদাস ও ভবভূতির কাব্যের সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা লিখিয়া যাইবেন। এইরূপ ইচ্ছা, তিনি মেঘদূতের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৯১৭ সালের মে মাসে আমি তাঁহার সহিত দেখা করিয়া তাঁহার সংকল্পিত বিষয়ের উত্থাপন করি। তিনি প্রথমেই আল্‌গা ভাবে বলিলেন—তুমি 'নারায়ণ' পড় না, তাহাতে যে আমি সে কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছি। আমি উত্তর দিলাম—'নারায়ণে' প্রকাশিত হইতেছে কাব্য-কথা, আমরা চাই কাব্য-সমালোচনা। তিনি বলিলেন—আমাকে খোঁচাইয়া বাহির করিয়া লইতে না পারিলে নিজে আর কিছু লিখিব না। আমি মনে মনে স্থির করিলাম—রেলের একটা মাসিক টিকেট কিনিয়া প্রতিদিন চুঁচুড়া হইতে কলিকাতায় যাইব, শাস্ত্রীমহাশয় বলিয়া যাইবেন ও আমি লিখিয়া লইব, পরে তিনি তাহা সংশোধন করিয়া দিবেন। তাঁহাকে এইরূপ বলিলে তিনি সম্মত হইলেন। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য,—সাংসারিক কাজকর্ম্মে ও অসুখ-বিসুখে এমন বিব্রত হইয়া পড়িলাম যে, এ কার্য্য আর হইয়া উঠে নাই।

এই সময় একদিন তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম যে, তাঁহার আশীর্ব্বাদী পুস্তক মেঘদূতব্যাখ্যাখানি খোওয়া গিয়াছে, আমাকে আর দুইখানি দিতে হইবে। তিনি ত হাসিয়া অস্থির; বলিলেন—একখানি হারাইয়াছ, তাই দুইখানি দিতে হইবে! আমি বলিলাম—চোরের উপর ত কাহারও হাত নাই, আমি ইচ্ছা করিয়া হারাই নাই। আর, এবার দুখানি দিতে হইবে—ইহার একখানি বনমালী বাবুকে দিব। পূজনীয় বনমালী বেদান্ততীর্থ মহাশয় তখন কটন কলেজের দর্শনের অধ্যাপক, ইনি সংস্কৃত কলেজে আমার অধ্যাপক ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে ইনি একদিন বলিয়াছিলেন—যদি মেঘদূতব্যাখ্যা সংগ্রহ করিয়া দিতে পার তবে ভাল হয়। আমার কথা শুনিয়া শাস্ত্রীমহাশয়, বলিলেন—ওহে! ও বই আজকাল কিনিতে পারা যায়, দাম ২৲ টাকা। কয়েকদিন পূর্ব্বে বোম্বাই থেকে অর্ডার আসিয়াছিল, দাম চড়াইয়া বিক্রয় করিতে বলিয়া দিয়াছি; সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারিতে গেলেই বই পাইবে। ২৲ টাকা খরচ করিয়া বই কিনিতে পারি—তখন আমার সে সামর্থ্য হইয়াছে; কিন্তু শাস্ত্রীমহাশয়ের হাত হইতে পাওয়া ও কিনিয়া পাওয়ার মধ্যে যে অনেক প্রভেদ! শাস্ত্রীমহাশয় একটা কাগজে ২খানা পুস্তকের কথা লিখিয়া দিয়াছিলেন (১৯১৭ সালের ৩০শে মে তারিখে), সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারি হইতে ২খানা পুস্তক পাইয়াছিলাম; একখানি পূজনীয় বনমালীবাবুকে দিয়াছি, একখানি আমার কাছে আছে। এখানি অনেকে আমার বাসায় বসিয়া পড়িয়াছেন, কাহাকেও এই বইখানি লইয়া গিয়া নিজের লাইব্রেরী সাজাইতে দিই না।

কাব্যস্রষ্টা

শাস্ত্রীমহাশয় যে কেবল মহাকবির কাব্য-সমালোচনা করিয়াই কাব্যরসজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন তাহা নহে; তিনি কাব্যসৃষ্টি করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার অপূর্ব্ব দান "বাল্মীকির জয়।" অনেক আধুনিক শিক্ষিত পাঠকের এই গ্রন্থের সহিত পরিচয় নাই। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বেই আমি সকলকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, এই ৮৪ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র গ্রন্থের বঙ্কিমবাবু ১৫ পৃষ্ঠাব্যাপী সমালোচনা লিখিয়াছিলেন এবং এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, —"ইহার গুণসকল বলিয়া উঠি এমন সময়ও নাই। কাব্যের প্রধান উৎকর্ষ কল্পনায়। ইহার কল্পনা অতিশয় মহিমাময়ী। ঋতুদিগের আগমন, বিশ্বামিত্র, বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি, বিশ্বামিত্রের অধঃপাত, কৌশাম্বীর যজ্ঞ, অন্তে বিরাট দর্শন—যাহা দেখ সকলই মহিমাময়ী কল্পনায় সমুজ্জ্বল।··· যেমন কল্পনা, তেমন বর্ণনা।···আমরা এই গ্রন্থের বাঙ্গালাকে উৎকৃষ্ট 'বাঙ্গালা বলি।···গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র, কিন্তু গ্রন্থখানি বাঙ্গালা ভাষায় একটি উজ্জ্বলতম রত্ন। আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থকার এত অল্প বয়সে (৮) এরূপ প্রতিভা ও মানসিক

(ক) অনেকের স্বভাব এই যে, অন্যের নিকট হইতে পড়িবার জন্য পুস্তক চাহিয়া আনিলে তাহা ফেরত দেন না। ইহার কারণ এই যে, পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় মস্তিষ্কে রাখা অপেক্ষা পুস্তকখানি নিজের নিকট রাখা সহজ।

(খ) একজন তাহার বন্ধুর লাইব্রেরী হইতে একখানি পুস্তক নিজ বাড়ীতে লইতে চাহিলে, তাঁহার বন্ধু বলিল, আমি পুস্তক ধার দিতে পারিব না—আমি ঐরূপ করিয়া লাইব্রেরী করিয়াছি।

(৮) ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে শাস্ত্রীমহাশয় এই গ্রন্থ লেখেন, তখন তাঁহার বয়স ২৯ বৎসর মাত্র। ঠিক ২৯ বৎসর বয়সে বঙ্কিমবাবু তাঁহার অন্যতর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কপালকুণ্ডলা রচনা করিয়াছিলেন।

শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, এমন আমাদের স্মরণ হয় না।" (৯)

বাল্মীকির জয়ের মূল-কথা এই—

বশিষ্ঠ জ্ঞানী ধার্ম্মিক, বিশ্বামিত্র কৌশলী রাজনীতিক রাজর্ষি, বাল্মীকি হৃদয়বান্ কবি। ইঁহারা "তিনজনে রাম-অবতারের ষাটি হাজার বৎসর পূর্ব্বে, রাম কি করিবেন তাহার যুক্তি করিতে বসিলেন।"

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম যেন ধার্ম্মিকচূড়ামণি হয়েন। তাঁহার শরীরে যেন পাপের লেশমাত্র থাকে না।

বিশ্বামিত্র বলিলেন—শুদ্ধ তাহা হইলেই হইবে না, রাম ক্ষত্রিয় হইবেন, রাম রাজা হইবেন, সুতরাং রামের বীরত্ব ও রাজনীতিজ্ঞতা বিশেষরূপে প্রকাশিত থাকা আবশ্যক।

বাল্মীকি বলিলেন, ব্রহ্মর্ষিগণের আজ্ঞা শিরোধার্য্য। আমি রামকে ধার্ম্মিকও করিব না; বীরও করিব না; রাজনীতিজ্ঞও করিব না। স্বয়ং নারায়ণ অবনীতে অবতীর্ণ হইতেছেন। তিনি আদর্শ মনুষ্য হইবেন। তাঁহার চরিত্র-বর্ণনাক্রমে আমি আদর্শ মনুষ্য, আদর্শ রমণী, আদর্শ দম্পতী, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ পরিবার, আদর্শ বন্ধু, আদর্শ রাজা, আদর্শ শাসনপ্রণালী, আদর্শ ভৃত্য ও আদর্শ শত্রু দেখাইব। আপনারা আশীর্ব্বাদ করিলে আমি এই সুযোগে এমন একটি মনুষ্যচরিত্র চিত্রিত করিব, দর্শনে সর্ব্বদেশীয়, সর্ব্বজাতীয় ও সর্ব্বকালীন মানবগণ আনন্দ ও উপদেশ লাভ করিতে পারিবেন।

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র যুগপৎ কহিয়া উঠিলেন—তথাস্তু। তোমার রাম যেন চিরদিন নরজাতির আদর্শস্বরূপ হইয়া থাকেন।"

রামচরিত্রের এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন শাস্ত্রীমহাশয়। এইখানেই বাল্মীকির সত্যকার জয়।

আমার নিজের সৌভাগ্য এই যে, কৈশোরেই বাল্মীকির জয়ের সন্ধান পাইয়াছিলাম। যে পরিমাণে তাহা বুঝিয়াছিলাম সেই পরিমাণে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। চুঁচুড়া হিন্দু-সমিতির বার্ষিক-প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় পুরস্কাররূপে বাল্মীকির জয় উপহার দিবার ব্যবস্থা ১৯০৪।৫ সালে করিয়াছিলাম। ১৯১৩ সালে গৌহাটীতে আসিবার পর সংস্কৃত অধ্যাপনার সঙ্গে বাঙ্গালা অধ্যাপনার ভারও আমার উপর পড়ে। এই সময় বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালায় অবশ্যপাঠ্য কোনও পুস্তক নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন না। ভিন্ন ভিন্ন নীতি ও চরিত্র প্রদর্শনের জন্য কয়েকখানি পুস্তকের নাম গেজেটে প্রকাশিত হইত (Books recommended as presenting models of style and ideals of character)। দুঃখের বিষয় বাল্মীকির জয় সে তালিকায় কখনও স্থান পায় নাই। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকার ২।১ খানি পুস্তক পড়াইতাম এবং বাল্মীকির জয় পড়াইতাম। শাস্ত্রীমহাশয় একদিন এ কথা আমার মুখে শুনিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন—'তোমার চাকরি যাইবে।' এ তাঁহার অভিমানের উক্তি; অভিমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা-প্রণেতাদের উপর। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য বাঙ্গালা সঙ্কলন গ্রন্থের মধ্যে বাল্মীকির জয় হইতে খানিকটা অংশ অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। শাস্ত্রী-মহাশয় ইহা জানিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি—বাঙ্গালাদেশে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজীতে এবং ভারতের একাধিক প্রদেশের ভাষায় ইহার অনুবাদ বাহির হইয়াছিল।

ভারতমহিলার উৎকর্ষ প্রকাশক

বাল্মীকির জয় রচনার পূর্ব্বে শাস্ত্রীমহাশয় লিখিয়াছিলেন—'ভারতমহিলা'। প্রাচীন কালে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকগণের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাঁহাদিগের চরিত্র বিষয়ে আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতেরা কতদূর উৎকর্ষ কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন—তাহা শাস্ত্রী মহাশয় দেখাইয়াছেন—ভারতমহিলায়। গ্রন্থের প্রথম ভাগে তাৎকালীন স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে এবং পরে বাল্মীকি বেদব্যাস কালিদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিগণের গ্রন্থ হইতে কতকগুলি প্রসিদ্ধ নারীচরিত্রের সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথম ভাগে আলোচিত বিষয় হইতে জানা যায়—

১। স্ত্রীলোকদিগকে সাবধানে রক্ষা করা হইত।

২। স্ত্রীলোক অবরোধবর্ত্তী ছিলেন না।

৩। স্ত্রীলোক বিদ্যাশিক্ষা করিতেন।

৪। অপাত্রে কন্যাদান নিষিদ্ধ ছিল। বরকে যত্ন-পূর্ব্বক পরীক্ষা করা হইত—তিনি যেন যুবা ধীমান্ ও জনপ্রিয় হন।

৫। স্ত্রীলোকগণের প্রতি সস্নেহ ব্যবহার করা হইত। তাঁহাদিগকে পবিত্র বলিয়া গণনা করা হইত। "সোম তাঁহাদিগকে শৌচ প্রদান করিয়াছেন, গন্ধর্ব্ব তাঁহাদিগকে মধুর বাক্য প্রদান করিলেন, পাবক তাঁহাদিগকে সর্ব্ব-প্রকারে পবিত্র করিয়াছিলেন।"

৬। স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য। "তাঁহার ব্রত, ধর্ম্ম, উপাসনা, উপবাস কিছুই নাই। শিল্পাদি কার্য্যে দক্ষ হউন, সে তাঁহার কর্ত্তব্যের মধ্যে নহে, গুণের মধ্যে। গৃহকার্য্যে দক্ষ হওয়া তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য।" পুত্রের পালনভার স্ত্রীলোকের হস্তে অর্পিত ছিল। কলাবিদ্যা তাঁহার অন্যতম শিক্ষনীয় বিষয় ছিল।

৭। স্ত্রীলোকের ধনাধিকার। তাঁহার পিতৃ-দত্ত ধনে স্বামীর অধিকার নাই। সে ধন স্বামী লইলে তাঁহাকে সুদ দিতে হইবে। "স্ত্রীলোকের ধনাধিকার বিষয়ে ভারতীয় ঋষিগণ যত সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন এত অন্য কোন দেশে আজিও হইয়াছে কি না সন্দেহ।"

৮। বিধবার কর্ত্তব্য।

৯। দুষ্টচরিত্রাদিগের দণ্ড।

গ্রন্থের পরভাগে আলোচিত হইয়াছে নিম্নলিখিত স্ত্রীলোকগণের চরিত্র—লোপামুদ্রা, শকুন্তলা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়ন্তী, সীতা, চিন্তা, গান্ধারী, মালবিকা, মালতী, শৈব্যা, পার্ব্বতী। ইঁহাদের বিশুদ্ধতা, মনোহারিত্ব, তেজস্বিতা, দৃঢ়তা—পতিপরায়ণতা, ঈর্ষাশূন্যতা প্রভৃতি গুণ ইঁহাদিগকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। "দক্ষ বলিয়াছেন, সাধ্বী রমণী পাইলেই স্বর্গ, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।"

এই গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল ১৮৮২ সালের Calcutta Review পত্রিকায়। এই গ্রন্থ বাঙ্গালা দেশের বিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যতালিকায় স্থান পাইয়াছিল কি না জানি না।

প্রত্নতত্ত্ব গবেষণাকারক

শাস্ত্রীমহাশয় জগতে বিখ্যাত হইয়াছেন তাঁহার প্রত্নতত্ত্ব-গবেষণার জন্য। তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত খ্যাতির জন্য বিলাতের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি বিশজন মাত্র বিশিষ্ট সভ্যবর্গের (Honorary Members) মধ্যে তাঁহাকে একজন বলিয়া নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন ১৯২১ সালে। তাঁহার গবেষণা বিষয়ে আলোচনা করিবার অধিকার আমার নাই। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ তাহা করিবেন, আমি দুই চারিটি কথামাত্র বলিব।

(১) আমরা যখন বি-এ শ্রেণীতে পড়ি—তখন দেখিতাম একটি সুদর্শন যুবক প্রায় প্রত্যহই সংস্কৃত কলেজে যাইতেন এবং কোনওরূপ সংবাদাদি না দিয়া শাস্ত্রী-মহাশয়ের খাসকামরায় প্রবেশ করিতেন এবং কোনও দিন এক ঘণ্টা, কোনও দিন ততোঽধিক কাল থাকিয়া চলিয়া যাইতেন। পরে জানিয়াছি—ইনি (পরে সুপ্রসিদ্ধ) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়; অনেক দিন হইতেই শাস্ত্রী-মহাশয়ের নিকট হইতে প্রত্নতত্ত্ব গবেষণা বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করিতেছিলেন। শাস্ত্রীমহাশয়ের উপদেশ অনুসারেই 'চাপরাশ' সংগ্রহ করিবার জন্য ইনি বি-এ, ও পরে এম-এ পরীক্ষা দেন। মহেঞ্জো দাড়োর আবিষ্কার যে রাখাল-দাসের নাম ইতিহাসে অক্ষয় করিয়া রাখিল, সেই রাখাল-দাসের গবেষণা-শিক্ষার হাতে-খড়ি হইয়াছিল শাস্ত্রীমহাশয়ের নিকট।

(২) ১৯০৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইল। ১৯০৮ সালে শাস্ত্রীমহাশয় সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এই বৎসর সংস্কৃত কলেজ হইতে সুরেন্দ্র দাসগুপ্ত প্রভৃতি কয়েকজন ছাত্র কলেজের ছাত্ররূপে সংস্কৃতে এম-এ পাশ করিলেন। তার পর আর কেহ সংস্কৃত কলেজের ছাত্র হিসাবে এম-এ পরীক্ষা দিতে

(৯) Calcutta Reviewএর সমালোচনা—1882 Mr. Sas'ri is really grand in his execution.

1891. The Valmikair Jaya is instinct with the profoundest criticism of life and society, and of schemes of regeneration of humanity, the myth being grouped round a central idea or regulative conception.

It is the most glorious phantasmagory in literature known to us.

Goethe's Helena.....displays a fine critical insight; but it pales before the Valmikir Jaya, not only in moral profundity, but also in grandeur of design. a sense of primitive elemental freedom, and an intoxication of the creative imagination.

পারেন নাই, কারণ, বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত কলেজকে এম-এ পড়াইবার উপযুক্ত বিবেচনা করিলেন না (affiliation দিলেন না)। শাস্ত্রী মহাশয় আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—"ভাষাবিজ্ঞান (philology) পড়াইবার লোক নাই বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় affiliation দিতেছেন না; আমি ভাষা বিজ্ঞান পড়াইব; ভাষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা প্রবন্ধ পরীক্ষা করিতে আমাকে উপযুক্ত মনে করা হয়, আর ভাষা-বিজ্ঞান পড়াইতে আমি সমর্থ—এ কথা বিশ্ববিদ্যালয় কেন মনে করেন না! যাহাই হৌক, বিশ্ববিদ্যালয় এম-এ পড়াইবার অনুমনি দিলেন না। এই সময়ে আমরা এম-এ পড়িবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম লেখাইলাম। শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস পড়িব—এই আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাহা প্রায় নির্ম্মূল হইল। বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁহাকে লেকচারার নিযুক্ত করিলেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজকে এম-এ পড়াইবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই, বোধ হয় এই অভিমানে তিনি একটি দিনও আমাদিগকে লেকচার দিলেন না। আমরা তাঁহার বাড়ীতে (২৬ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট) ধরণা দিতে আরম্ভ করিলাম। তিনি একদিন বলিলেন,—'তোমাদের তিন জনকে (আমরা পূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলাম) পড়াইব, অন্য কাহাকেও নহে। পড়াইব কি জান? ম্যাকডোনেল সাহেবের বইখানা (History of Sanskrit Literature by A. A. Macdonell) কাটিয়া কুটিয়া ঠিক করিয়া দিব।' সুরেন (৺ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, শাস্ত্রী—বিহারে অধ্যাপক হইয়াছিলেন) আই গ্রুপ (I Group) লইয়াছিলেন,—শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রিয় গ্রুপ; তিনি সুরেনকে কয়েকদিন বাড়ীতে পড়াইয়াছিলেন; পশুপতিকে (৺ ডক্টর পশুপতিনাথ ভট্টাচার্য্য, শাস্ত্রী Ph. D.—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইয়াছিলেন) ও আমাকে হদিশ্ বাৎলাইয়া দিয়াছিলেন—কেমন করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস পড়িতে হয়; আর তাঁহার নিজের লিখিত গবেষণা প্রবন্ধাদি পড়িতে বলিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি বিষয়ক তাঁহার প্রবন্ধ আমাকে পড়িবার জন্য দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়া গবেষণা প্রণালীর ইঙ্গিত পাই। সংস্কৃত নাটকের ইতিহাস সম্বন্ধে আমার যতটুকু অনুপ্রবেশ হইয়াছে, তাহা শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুগ্রহে। ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত একটি কথা বলার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। এম-এ পরীক্ষা দিলাম ১৯১০ সালে; মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস-পত্রের প্রথমার্দ্ধের পরীক্ষক। একদিন পূজনীয় রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় হঠাৎ আমাকে বলিলেন—'ওহে, কালীপ্রসন্ন বাবু তোমার উত্তরে ভারী খুসী হইয়াছেন; তুমি কত নম্বর পাইয়াছ মনে কর?' প্রথমার্দ্ধের প্রবন্ধের বিষয় ছিল দুইটি, আমি বাছিয়া লইয়াছিলাম 'সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতি ও পরিণতি'; কারণ, শাস্ত্রী মহাশয়ের কৃপায় প্রায় ১।১॥ বৎসর আমি এ বিষয়ে চিন্তা করিয়াছিলাম এবং পরীক্ষার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এ বিষয়ে যেখানে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা পড়িয়া লইয়াছিলাম। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে হাসিয়া বলিয়াছিলাম '৫০এর মধ্যে ৫০ পাইব, আশা করি।' আজ পর্য্যন্ত জানি না কত পাইয়াছিলাম।

(৩) শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত একদিন ট্রেণে এক কামরায় বসিয়া যাইতেছি; তিনি নৈহাটী যাইবেন, আমি তাহার পূর্ব্বের ষ্টেসনে নামিয়া গঙ্গা পার হইয়া চুঁচুড়া যাইব। গাড়ীতে নানা বিষয়ের আলোচনা হইতেছে। শ্যামনগরে গাড়ী উপস্থিত। শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন—'রিসার্চ্চ করিবে বলিতেছ, বল ত শ্যামনগর নাম কেন হইল?' শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রশ্ন, হঠাৎ উত্তর দিয়া বেকুব বনিয়া যাইব! মন ছুটিল মূলাজোড়ের শ্যামাসুন্দরীর মন্দিরে ("করুণাময়ী"র মন্দির), সেখানে শ্যাম কই? আশে পাশে কোনও শ্যামের মন্দির আছে কি না খোঁজ করিতে লাগিলাম; শাস্ত্রী মহাশয় মুখ টিপিয়া হাসিতেছেন, আমার কোনও উত্তর না পাইয়া বলিলেন—"এটা শ্যাম-নগর নহে, সাম্‌নে-গড়"। ষ্টেশনের পূর্ব্বদিকে কোথায় গড় আছে, কোন্ রাজার গড়, ভারতচন্দ্র কবে এখানে বাস করিয়াছিলেন - ইত্যাদি সকল কথা তিনি বুঝাইলেন। মনে মনে লজ্জিত হইলাম, সঙ্গে সঙ্গে মন তাঁহার পায়ের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। কয়েক বৎসর পরে রেণেল সাহেবের (১০) মানচিত্রে দেখিয়াছি স্থানটার নাম লেখা

(১০) Map of Bengal * * by James Rennell F. R. S. published under the authority of the East India Company 1781, maps Nos. 1, 7, 19.

আছে—Samukgur—সমুখগড় এবং নামের পাশে কেল্লার চিহ্ন দেওয়া আছে। কথাটা ছিল বাঙ্গালা সাম্‌নে-গড়, রেণেল সাহেবের মানচিত্রে কিছু জাতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে সমুখ-গড়, পরে আভিজাত্য লাভ করিয়া আমাদের নিকট রূপ পাইয়াছে শ্যামনগর। রূপ বদলাইয়াছে, অর্থ বদলাইয়াছে, এখন আসল বস্তুকে চেনা অসাধ্য হইয়াছে। বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহার কদর আমরা বাঙ্গালী হইয়াও করি না, হয়ত সংস্কৃত (অর্থাৎ বাঙ্গালার কাছে বিদেশী) হইলে কদর করিতাম। শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর কদর করিতে জানিতেন।

(৪) বাঙ্গালাদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের অস্তিত্ব-বিষয়ে প্রবন্ধ প্রথম লিখিয়াছিলেন শাস্ত্রী মহাশয়। বাঙ্গালীর পূজা পার্ব্বণ আচার ব্যবহারের ভিতর কত বৌদ্ধ আচার যে লুকাইয়া আছে, তাহা প্রথম দেখাইয়াছিলেন শাস্ত্রী মহাশয়। তাঁহার প্রবন্ধ পড়িবার পর রামাইপণ্ডিতের শূন্যপুরাণ দেখিবার আগ্রহ জন্মে। পরে হুগলীজেলায় কোনও এক গ্রামে ধর্ম্মপূজা দেখিয়া ও ধর্ম্মমঙ্গল (ঘনরামের) গান শুনিয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের—বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্ম আছে—এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করি এবং এ বিষয়ে এক প্রবন্ধ লিখিয়া ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়কে প্রদান করি; তিনি তৎসম্পাদিত "পূর্ণিমা" পত্রে (বাঁশবেড়িয়া হইতে প্রকাশিত) তাহা প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধের মূলে শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুপ্রেরণা ছিল।

বঙ্কিম যুগে শাস্ত্রী মহাশয়

বঙ্কিম-যুগের প্রারম্ভে শাস্ত্রী মহাশয় বয়সে প্রবীণ না হইলেও সে যুগের পূর্ণচন্দ্র বঙ্কিমের লিখন-প্রণালীর (Style) পরিবর্ত্তনে প্রথম প্রেরণা দিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু যখন দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশ করেন, তখন শাস্ত্রী মহাশয়ের বয়স ছিল ১২ বৎসর মাত্র; কপালকুণ্ডলা প্রকাশিত হইবার সময়ে তিনি ১৬ বৎসরের বালক; বিষবৃক্ষ প্রকাশিত হইবার সময়ে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ২০ বৎসর। তিনি ঐ সকল পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। বঙ্কিমবাবুর বাড়ী কাঁটালপাড়ায়, শাস্ত্রী মহাশয়ের বাড়ী নৈহাটীতে,—দুইগ্রামের মধ্যে দূরত্ব প্রায় এক মাইল মাত্র। বালক হরপ্রসাদ মাঝে মাঝে বঙ্কিমের নিকট যাতায়াত করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন পূর্ণ-জ্যোতিতে বঙ্গের সাহিত্য-গগনে বিরাজমান, তাঁহার নিকট কোনও কথা বলিতে বিজ্ঞজনও ইতস্ততঃ করিতেন। তখন বঙ্কিমবাবু যে গ্রন্থাদি লিখিতেন, তাহা সংস্কৃত-বহুল শব্দে পূর্ণ থাকিত। শাস্ত্রীমহাশয় একদিন সাহস করিয়া বলিয়া ফেলিলেন যে, যদি সংস্কৃত-বহুল শব্দে বঙ্কিমবাবু তাঁহার গ্রন্থ লেখেন, তবে তাহা শিক্ষিত বাঙ্গালীর সম্পত্তি থাকিয়া যাইবে, তাঁহার ন্যায় গ্রন্থকারের গ্রন্থ বাঙ্গালীমাত্রেরই অধিগম্য যাহাতে হয় এমন ভাষায় তাঁহার লেখা উচিত; সংস্কৃতভাষা বাঙ্গালার দিদিমা (প্রাকৃত, মা), নাতিনী কি চিরকালই দিদিমার হাত ধরিয়া চলিবে? কখনও কি সে নিজে চলিতে সমর্থ হইবে না? বালকের (বঙ্কিমের তুলনায় হরপ্রসাদ তখন বালক) এই কথা বঙ্কিম হাসিয়া উড়াইয়া দেন নাই। পরে তাঁহার লেখায় আমরা যে সহজ সরল বাঙ্গালা দেখিতে পাই, তাহার মূলে শাস্ত্রী-মহাশয়ের এই প্রস্তাব ছিল—এ কথা স্মরণ রাখিলে আমরা বুঝিতে পারিব—বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা কত দিক হইতে শাস্ত্রীমহাশয় করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে শাস্ত্রী মহাশয়

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ও বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের সংশ্রবে শাস্ত্রী মহাশয় যে সকল প্রবন্ধ (১১) ও অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন সেগুলি সাহিত্য-সেবিগণকে এক নূতন পথ দেখাইয়াছে। দু একজন ভিন্ন কেহ সে পথে এখনও যাইতেছেন না, ইহাই দুঃখ। সায়ণাচার্য্যের পূর্ব্বে বাঙ্গালী বেদব্যাখ্যা করিয়াছে ইহা শাস্ত্রী মহাশয় শুনাইয়াছেন; বিদেশে গিয়া বাঙ্গালী সেই দেশকে শিক্ষা, সভ্যতা ও সাহিত্য দিয়াছে, এ কথা শাস্ত্রী মহাশয়ই শুনাইয়াছেন; বাঙ্গালী তন্ত্রের ধর্ম্ম-প্রচার করিয়াছে এ কথা তিনিই শুনাইয়াছেন; বাঙ্গালী বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছে এ কথাও

(১১) এ বৎসরের (১৩৩৮) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে "রত্নাকর শান্তি" (বিক্রমশিলার বৌদ্ধ ভিক্ষু)। আগামী ২৭শে অগ্রহায়ণের পরিষদের অধিবেশনে তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ থাকিবে "বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার"। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি পরিষদের জন্য পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন।

তিনিই শুনাইয়াছেন; আবার 'বাঙ্গালা দেশে কিরূপে হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মকে গিলিয়া ফেলিয়াছে'—তাহাও তিনিই বলিয়াছেন; বুদ্ধ কোন্ ভাষায় বক্তৃতা করিতেন তাহার সন্ধান করিতে গিয়া "পাঁথুরে প্রমাণ" বাহির করিয়া তিনিই দেখাইয়াছেন যে, সে ভাষা সংস্কৃত নহে, প্রাকৃতও নহে, সাধারণের পরিচিত পালিও নহে,—তাহাতে ট, ঠ, ড, ঢ, শ, য, হ, ক্ষ নাই, যুক্তাক্ষর নাই—সে ভাষার নমুনাও দেখাইয়াছেন—

ইয়ং সলিললিখনে বুধস ভগবতে সকিয়নং সুকিতিভতিনং সভগনিকনং সপুতলনং—অর্থাৎ এই যে শরীর নিধান অর্থাৎ ছাই বা হাড়গোড় ভগবান্ বুদ্ধের, শাক্যদের, ভাই ভগিনী ও সুতদারার সহিত (১৩৩৩ পরিষৎ পত্রিকা পৃঃ ৯৪); যোগী জাতি, কৌলধর্ম্ম ও কৈবর্ত্তজাতি বাঙ্গালার তিনটি মহা সমস্যা তিনিই সমাধানের জন্য দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন (১৩৩৭ পত্রিকা, ২য় সংখ্যা—শেষ অভিভাষণ); "আমাদের দেশের ইতিহাসটা ঢালিয়া সাজিতে হইবে।...শুধু ইংরাজী পড়িয়া আর সাহেবদের বই পড়িয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস জমিবে না, জমাইতে পারিবে না।—এখনকার ইতিহাসবাগীশেরা সাহেবের বই ছাড়া পড়িতে পারেন না। সংস্কৃত তাঁহাদের একেবারেই বাধ বলিয়া মনে হয়।"...কিন্তু "সংস্কৃত সাহিত্যের বই পড়িতে পড়িতে অনেকের স্থান ও কাল ঠিক হইয়া যাইবে"—এ কথা তিনিই জোর করিয়া বলিয়াছেন (১৩৩২ পত্রিকা ১৯৫ পৃঃ);—"কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইতে আমাদের ইতিহাস আরম্ভ হওয়া উচিত"—এ কথা তিনিই স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন (১৩৩৫ পত্রিকা ৪ পৃঃ); বঙ্গের সহজিয়া সম্প্রদায়ের কথা, নাঢ়া-নাঢ়ীর কথা তিনিই শুনাইয়াছেন; প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত 'বৌদ্ধ গান ও দোহা' তিনিই নেপাল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন; নেপালে বাঙ্গালা নাটকের সন্ধান তিনিই দিয়াছেন; বাঙ্গালা সমাজে বৌদ্ধভাবের প্রভাবের কথা তিনিই শুনাইয়াছেন। কত কথা তিনি শুনাইয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ১৩ বৎসর ধরিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি থাকিয়া নিঃস্বার্থভাবে যথাসাধ্য সাহিত্যপরিষদের সেবা করিয়া তিনি গত বৎসর অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। আশা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন—"সাহিত্যপরিষৎ বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালী জাতির মুখ উজ্জ্বল করিবে। কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ও তাহার মিউজিয়াম পৃথিবীর অন্যান্য পরিষৎ ও মিউজিয়ামকে ছাড়াইয়া উঠিবে, কারণ বাঙ্গালা অতি প্রাচীন দেশ। এইরূপ নদীমাতৃক দেশেই সভ্যতার প্রথম উৎপত্তি—বাঙ্গালা সভ্যতা যে কত প্রাচীন তাহা বলিয়া উঠা যায় না।"

জানি না শাস্ত্রী মহাশয়ের আশা কতদিনে পূর্ণ হইবে।

পরলোকে শাস্ত্রী মহাশয়

বাং ১২৬০ (ইং ১৮৫৩) সালে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৩৩৮ সালের ১লা অগ্রহায়ণ (ইং ১৯৩১-১৭ই নবেম্বর) শাস্ত্রী মহাশয় পরলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে তিনি ভালবাসিয়াছিলেন বাঙ্গালীকে, বাঙ্গালার শিক্ষা দীক্ষা আচার ব্যবহারকে, চেষ্টা করিয়াছিলেন বাঙ্গালীকে উন্নত করিতে, উদ্ধার করিয়াছেন বাঙ্গালীর ইতিহাসকে এবং স্বয়ং বঙ্গমাতার মুখ সমুজ্জ্বল করিয়াছেন। বয়সে, বিদ্যায়, জ্ঞানে, সম্মানে তিনি মহান্ হইয়াছিলেন। মহাকাল তাঁহাকে লইয়া গিয়াছে, মহাকালের প্রভাব এড়াইবার সাধ্য কাহারও নাই। আরও কিছুদিন তিনি থাকিলে আমরা সুখী হইতাম, কিন্তু তাহা ত হইবার নহে। অনিচ্ছাসত্ত্বে গভীর দুঃখে তাঁহাকে বিদায় দিতে হইয়াছে।

তাঁহার সাধনোচিত ধামে তিনি শান্তিতে বিরাজ করুন এবং বাঙ্গালীকে আশীর্ব্বাদ করুন—বাঙ্গালী যেন বাঙ্গালীকে তাঁহার মত চিনিতে শেখে।

চিরন্তনীর জয়

কুমার শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

একাদশ পরিচ্ছেদ

"চলুন অনিলবাবু। বীরেশবাবু বিলম্ব দেখে ব্যস্ত হতে পারেন।"

অনিলচন্দ্র ভগিনীপতির তাড়া দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "এখনও সন্ধ্যার ঢের দেরী, প্রতুলবাবু।"

"তা না হ'ক। ওঁর বাড়ীটা নদীর ধারে। জায়গাটা ভারী সুন্দর। নদীর শোভা এমন চমৎকার সেখানে। অস্তগামী সূর্য্যের দৃশ্যটা উপভোগ করা যাবে, চলুন।"

"তরলিকাও যাবে ত। সে কি এর মধ্যে তৈরী হয়ে নিয়েছে?"

প্রতুলচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "আপনার বোন্ কি বাড়ী আছেন না কি? দুপুরবেলা বীরেশবাবুর ওখানে তিনি চলে গেছেন।"

অনিলচন্দ্র চরকার সূতা নাটাইয়ে গুটাইয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। তার পর প্রতুলচন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিল, "বীরেশবাবুর বাড়ী আজ কিসের উৎসব? অনেক লোকজন হবে না কি?"

"কিছু না; শুধু আমরা। আপনাকে তাঁর বড় ভাল লাগে। তাই আমাদের ক'জনকে নিয়ে ছুটির দিনের সন্ধ্যাটা আনন্দে কাটাবার ইচ্ছে হয়েছে।"

বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে করিতে অনিলচন্দ্র বলিল, "বাস্তবিক বীরেশবাবু বড় চমৎকার লোক। যেমন পূত চরিত্র, তেমনই সদালাপী ও পণ্ডিত। সত্যি আমারও তাঁকে খুব ভাল লাগে।"

কি একটা কথা বলিতে গিয়া প্রতুলচন্দ্র থামিয়া গেলেন।

খদ্দরের চাদরখানা খুলিয়া গায় দিয়া অনিলচন্দ্র বলিল, "তবে চলুন।"

উভয়ে রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বীরেশবাবুর বাড়ী অর্দ্ধ মাইল দূরে অবস্থিত। অপরাহ্ণের আলোকে উভয়ে পথ চলিতে লাগিলেন। সূর্য্য তখনও পশ্চিম আকাশে আবীর ছড়াইতেছিলেন।

নানা প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে করিতে দীর্ঘ পথ অতিক্রান্ত হইল।

প্রতুলচন্দ্র নদীর তীরবর্ত্তী নাতিবৃহৎ প্রস্ফুটিত কুসুম-চিত্রিত, লতাবেষ্টিত প্রবেশ-পথের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাজপথের দক্ষিণ দিকে যে সাধারণ দ্বার বিদ্যমান, সে দিক দিয়া না প্রবেশ করিয়া এই পথটি তিনি বাছিয়া লইলেন। বীরেশবাবুর গৃহে নদীর দিকের এই মনোজ্ঞ পথে তিনি দুইবার অধ্যাপকের সঙ্গে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

অন্তঃপুরের উদ্যানের একাংশ এই দিকে থাকা সত্ত্বেও বাহিরের লোকের পক্ষে এ দিক দিয়া প্রবেশের বিশেষ বাধা নাই।

অপরাহ্ণের স্তিমিত সূর্য্য তখন নদীর অপর পারের বৃক্ষরাজির অন্তরালে ঢলিয়া পড়ে নাই। সোণার কিরণে হেমন্তের সায়াহ্ন স্বপ্নলোকের মায়ায় মোহাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল।

কঙ্করাকীর্ণ পথে একটু অগ্রসর হইতেই অনিলচন্দ্র সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল। প্রতুলচন্দ্র শ্যালকের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "দাঁড়ালেন যে?"

অনিলচন্দ্র মৃদুস্বরে বলিল, "আমাদের এ পথে আসা উচিত হয় নি। ঐ দেখুন।"

প্রতুলচন্দ্র দেখিলেন, অদূরে রজনীগন্ধার ঝাড় হইতে একটি তরুণী নিবিষ্টমনে সন্তর্পণে ফুল সংগ্রহ করিতেছে। তাহার এলাইত সুচিক্কণ কৃষ্ণ কেশরাজির একাংশ দেখা যাইতেছে। মস্তকে অবগুণ্ঠন নাই। পরিহিত বাসন্তী বর্ণের বসনের উপর অস্তগামী সূর্য্যের আলোক-সম্পাতে তরুণীর দেহ-সুষমা যেন অপ্সরোলোকের দেবকন্যাগণের মাধুর্য্য-মহিমায় প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রতুলচন্দ্র মৃদুস্বরে বলিলেন, "মেয়েটি বীরেশবাবুর। অনূঢ়াকে দেখে, চিরকুমারের সঙ্কোচ বড় বিস্ময়ের বিষয়।"

অনিলচন্দ্র বলিল, "অন্য রাস্তা আছে ত; চলুন সেই দিক দিয়েই যাই।"

এমন সময় গৌরী ফিরিয়া দাঁড়াইতেই তাহার দৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্য চকিত হইয়া উঠিল। লজ্জার অরুণ রেখা আননে ফুটিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে সংযত লঘু পদক্ষেপে অন্তঃপুরের প্রবেশ-পথের দিকে চলিয়া গেল। তাহার গতিভঙ্গীতে যে বিচিত্র মাধুর্য্য লীলায়িত হইয়া উঠিল, তরুণদিগের দৃষ্টি তাহাতে আকৃষ্ট হইয়াছিল কি?

শ্যালকের মুখের দিকে একবার অপাঙ্গে চাহিয়া প্রতুলচন্দ্র সহজভাবে চলিতে লাগিলেন। অনিলের মুখ-ভঙ্গীতে গাম্ভীর্য্যের অটুট ছায়া দেখিয়া তাহার অন্তরের ভাব-বৈচিত্র্যের কোন আভাস তাঁহার তীক্ষ্ণ, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি আবিষ্কার করিতে পারিল না।

"মেয়েটি বড় ভাল বলে শুনেছি। বীরেশবাবু নিজে বাড়ীতে শিক্ষা দিয়ে ওঁকে বিশেষ গুণবতী করে তুলেছেন, কিন্তু ভাল পাত্র আজও জুটল না।"

অনিলচন্দ্র সংক্ষেপে বলিল, "বাঙ্গালার ঘরে ঘরেই এম্‌নি অবস্থা।"

প্রতুলচন্দ্র কিছু বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় বীরেশ-বাবু বাহু প্রসারিত করিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

"এই যে, আপনারা এসেছেন। আজ বড় আনন্দ পেলাম।"

উভয় বাহুর সাহায্যে উভয়কে আবেগভরে কাছে টানিয়া আনিয়া সরলপ্রাণ শিক্ষক মুহূর্ত্ত কাল উভয়ের দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিলেন। তার পর, পথ দেখাইয়া অতিথি যুগলকে বসিবার ঘরের দিকে লইয়া চলিলেন।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে চারি দিকের শোভা দেখিতে দেখিতে অনিলচন্দ্র বলিল, "আপনার এই বাগান, বাড়ী, এদের অবস্থান শিল্পীর কলাভবনের উপযোগী। আমার এক চিত্র-শিল্পী বন্ধু আছেন, তাঁকে এখানে আন্‌তে পারলে, এই রমণীয় দৃশ্যের মর্য্যাদা তিনি তুলিতে অমর করে তুলতে পারেন।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "আপনার কোন্ বন্ধু, অনিলবাবু? আমি কি তাঁকে দেখেছি?"

মৃদুশ্বাস ত্যাগ করিয়া অনিল বলিল, "না, তাঁকে আপনি দেখেন নি, তবে নাম হয় ত শুনেছেন। বর্ত্তমান যুগের তরুণ চিত্রশিল্পীদিগের মধ্যে তাঁর তুল্য আমি আর কাউকে মনে করি না।"

চিত্রশিল্পের দিকে বীরেশ বাবুরও সমধিক অনুরাগ ছিল। কন্যা গৌরীকেও চিত্র-বিদ্যার অনুরাগিণী দেখিয়া তিনি তাহাকে নিজের সামর্থ্যানুসারে চিত্রাঙ্কনে সাহায্য করিতেন।

বীরেশবাবু বলিলেন, "কার কথা বল্‌ছেন, অনিলবাবু?"

সোপান পথে বারাণ্ডায় উঠিতে উঠিতে অনিল বলিল, "মনীশ গুহের নাম হয় ত আপনারা শুনে থাক্‌বেন। আজকাল—"

বাধা দিয়া বীরেশবাবু বলিয়া উঠিলেন, "মনীশ গুহ ত সত্যি একজন দক্ষ চিত্রকর। খুব নাম শুনেছি। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ মাসিকগুলিতে মনীশবাবুর ছবি প্রায়ই দেখ্‌তে পাই। তিনি আপনার বন্ধু?"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "এ নাম আমারও অপরিচিত নয়। কাগজে দেখ্‌ছিলাম এবার কলকাতার চিত্র-প্রদর্শনীতে তাঁর ছবির খুব প্রশংসা হয়েছে।"

অনিলচন্দ্র গাঢ়স্বরে বলিল, "তাঁর শিল্প-সাধনার নিষ্ঠা ও একাগ্রতার কথা আপনারা জানেন না। আমি গোড়া থেকেই জানি। মনীশের প্রতিভা একদিন বাঙ্গালী জাতিকে শিল্পরসিক বলে সভ্যসমাজে পরিচিত করে দেবে, এই আমার বিশ্বাস।"

বীরেশবাবু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অতিথিযুগলকে বসাইয়া বলিলেন, "আমার মেয়ে গৌরীও মনীশবাবুর চিত্রের ভারী অনুরাগিনী।"

প্রতুলবাবু বলিলেন, "আপনার মেয়েকে চিত্র-বিদ্যাও শেখাচ্ছেন না কি?"

স্মিত-হাস্যে বীরেশচন্দ্র বলিলেন, "মা আমার সকল প্রকার ললিত কলারই অনুরাগিনী; কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে তার শক্তির অনুযায়ী শিক্ষা দিতে পাচ্ছিনে।"

প্রতুলচন্দ্র অনিলের মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কি দেখিলেন। তার পর গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কলকাতায় থাক্‌লে আপনি যোগ্য শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী হয় ত পেতেন!"

বীরেশবাবু বলিলেন, "যোগ্য শিক্ষকের হয় ত অভাব

নেই; কিন্তু একটা কথা হয় ত আপনি লক্ষ্য করছেন না। শিক্ষা দিবার যোগ্য শক্তি থাক্‌লেও যুবতী কন্যাদের কাছে শিক্ষকের পবিত্র দায়িত্ব রক্ষা করে চলবার মনোবৃত্তি-সম্পন্ন লোকের সংখ্যা অতি সামান্য নয় কি?"

অনিলচন্দ্র এতক্ষণ নীরব ছিল। দৃঢ়কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, "বীরেশবাবুর সহিত আমি এ বিষয়ে একমত। পৌরুষসম্পন্ন পুরুষের সংখ্যা বিংশ শতাব্দীর ধর্ম্ম-বিশ্বাস-হীন শিক্ষাপদ্ধতির ফলে বাঙ্গালা দেশে অত্যন্ত বিরল হয়ে পড়েছে।"

প্রতুলচন্দ্র কোন প্রতিবাদ করিলেন না। বোধ হয় অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান এই মতবাদের বিরুদ্ধে কোনও যুক্তি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার আকাশে সপ্তমীর চাঁদ, সন্নিহিত নদীর চঞ্চল বক্ষে লক্ষ চূর্ণ রেখা! অনিলচন্দ্র মুগ্ধভাবে সেই দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনার এ জায়গাটি সত্যই লোভনীয়। বড় আনন্দে আছেন আপনি, বীরেশবাবু।"

প্রতুলচন্দ্র আলবোলার নলটি তুলিয়া বলিলেন, "সে কথা সহস্রবার।"

বীরেশবাবু মৃদুস্বরে বলিলেন, "ঐশ্বর্য্যের সাধনা কোন দিন করিনি, তবে শান্তিতে দিন যাপনের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাই। তিনি এইটুকু করেছেন বলে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা পাইনে, প্রতুলবাবু।"

কথাগুলির মধ্যে ভক্ত-হৃদয়ের যে অভিব্যক্তি বীণাগুঞ্জনের ধ্বনিতে ব্যক্ত হইল, তাহাতে অনিল মুগ্ধ হইল। সে বলিল, "যিনি সকল অবস্থাতেই মনকে শান্ত রাখবার সাধনা করেন, ভগবানের দয়া তাঁর উপর অজস্রধারেই বর্ষিত হয়।"

প্রতুলচন্দ্র কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু পার্শ্বের কক্ষ হইতে বীণাধ্বনিবৎ মধুর কণ্ঠের তরঙ্গ উত্থিত হইতেই তিনি থামিয়া গেলেন। সুস্পষ্ট সঙ্গীতধ্বনি ভাসিয়া আসিল—

"আমার সাধ না মিটিল, আশা না পূরিল,
সকলি ফুরায়ে যায় মা!"

তরুণীর মধুস্রাবী কণ্ঠে এইরূপ ধরণের সঙ্গীত কি বিস্ময়কর নহে—বিশেষতঃ বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রগতিপরায়ণ যুগে?

প্রতুলচন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন, অনিলচন্দ্র বাতায়নের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া আছে। তাঁহার অন্তরে যে প্রশ্ন জাগিয়া উঠিয়াছে, তাঁহার শ্যালকের মনে বয়োধর্ম্মের সামঞ্জস্য হেতু কি অনুরূপ প্রশ্ন উদিত হইয়াছে?

"জনমের শোধ ডাকি মা তোরে
কোলে তুলে নিতে আয় মা।"—

এ সঙ্গীত তাঁহার পত্নী তরলিকার কণ্ঠনিঃসৃত নহে নিশ্চয়ই। বীরেশবাবুর কন্যাই এমন কণ্ঠস্বরের অধিকারিণী। কিন্তু এই তরুণ বয়সে গানের অভিব্যক্তিতে কুমারী কন্যার হৃদয়ব্যথা এমন ঔদাস্যব্যঞ্জক কেন? গান নির্ব্বাচনের সহিত অন্তরের কি কোন যোগাযোগ আছে?

প্রতুলচন্দ্র আইনজ্ঞ বিচারক। মনস্তত্ত্বের রাজ্যভূমিতে তিনি দীর্ঘকাল বিচরণ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার চিত্ত অভিভূত হইল।

"পৃথিবীর কেউ ভাল ত বাসে না,
এ পৃথিবী ভাল বাসিতে জানে না,—
যেথা আছে শুধু ভালবাসাবাসি
সেথা যেতে প্রাণ চায় মা!"

প্রতুলচন্দ্র দেখিলেন, অনিলচন্দ্র প্রস্তর-মূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে। তিনি একবার আসনের উপর নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন।

এস্রাজের সুরকে ছাপাইয়া—অতিক্রম করিয়া কণ্ঠধ্বনি উচ্চ সপ্তকে উঠিল—

"বড় দাগা পেয়ে বাসনা ত্যজেছি,
বড় জ্বালা সয়ে কামনা ভুলেছি,
অনেক কেঁদেছি, কাঁদিতে পারি না,
(আমার) বুক ফেটে ভেঙ্গে যায় মা!"

ক্রন্দনের সপ্তসমুদ্র যেন সত্যই সে কণ্ঠস্বরে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। ভাদ্রের কূলভরা জাহ্নবীর পবিত্র প্রবাহ-ধারার ন্যায় যেন সে সঙ্গীত-স্রোত শ্রোতৃবৃন্দকে ভাসাইয়া, অভিভূত করিয়া বহিয়া চলিল।

প্রতুলচন্দ্রের হৃদয় অশ্রুসিক্ত হইল। নয়নেও মুক্তা বিন্দু দুলিয়া উঠিল। অপাঙ্গে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার এ মানসিক দুর্ব্বলতা বীরেশবাবু অথবা অনিলচন্দ্রের দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছে কি না।

বীরেশবাবু মৃত্তিকা-নিক্ষিপ্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন।

অনিলচন্দ্র ক্ষিপ্রহস্তে খদ্দরের রুমাল বাহির করিয়া মুখের উপর বুলাইয়া লইল।

গান থামিয়া গেলে কয়েক মুহূর্ত্ত কেহ কোন কথা কহিলেন না। সঙ্গীতের সুর তখনও যেন একটি ব্যথাদীর্ণ নারীর অন্তরের ক্রন্দন-গুঞ্জন বাতাসে এলাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতেছিল।

প্রতুলচন্দ্র সহসা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "বীরেশবাবু, এ গান নিশ্চয়ই আপনার মেয়ে গৌরী গেয়েছেন?"

অধ্যাপক মৃদুস্বরে বলিলেন, "হাঁ, আমার মা লক্ষ্মী সেবার কি একখানা নাটকের অভিনয় দেখে এসে এই গানটা শিখেছিল। সাহিত্যের দিকে মার আমার বিশেষ ঝোঁক। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি মার আমার অচলা ভক্তি।' কপালকুণ্ডলা চরিত্রটি ওর কাছে নাকি বড় প্রিয়।"

অনিলচন্দ্র এবার ফিরিয়া বসিয়া ঔৎসুক্যপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "বলেন কি, স্যার! এ যুগে—এই বিচিত্র প্রগতির স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে নরনারী যখন উদ্দাম হয়ে উঠেছে,—তখন আপনার মেয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি ভক্তি অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে পেরেছেন? আশ্চর্য্য!"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "তার মানে?"

মৃদু হাসিয়া অনিলচন্দ্র তীব্রকণ্ঠে বলিল, "মানে খুব সহজ। বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরং' দেশবরেণ্য, পৃথিবীবরেণ্য হলেও, নব যুগের অনেকের ধারণা তাঁর সাহিত্য-প্রতিভা যুগোপযোগী নয়। নিতান্ত সেকেলে তিনি—মনস্তত্ত্বের চিত্রকর হিসাবে তৃতীয় শ্রেণীতেই তাঁকে রাখা না কি সঙ্গত!"

বীরেশচন্দ্র এবার উচ্চ হাস্যধ্বনিতে কক্ষতল মুখরিত করিয়া তুলিলেন। তারপর বলিলেন, "আপনারও কি সেই মত নাকি, অনিলবাবু?"

অনিলচন্দ্র সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমার সমস্ত জীবনটা ঐ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের আদর্শে গঠিত। উপন্যাস পাঠের ফলে তরুণ যুবকের চরিত্রনিষ্ঠা বজায় থাকে না বলে, আমাদের অভিভাবকদের মত ছিল; কিন্তু আমি গর্ব্ব করে বল্‌তে পারি, বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্র আমাকে মনুষ্যত্বের পথে এগিয়ে দিয়েছে।"

ভাবাতিশয্যে যুবকের আননে একটা অপূর্ব্ব দীপ্তি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে গভীর আবেগভরে বলিয়া চলিল, "তাঁকে কখনও দেখি নি। আমার জন্মের বহু আগেই তিনি লোকান্তরে চলে গেছেন। কিন্তু তাঁর সৃষ্ট চরিত্র ও রচনা আমার সমগ্র জীবনকে প্রভাবিত করে রেখেছে। প্রতুলবাবু হয় ত এ কথা শুনে হাস্‌বেন; কিন্তু—"

অনিলচন্দ্র বক্তব্য শেষ করিল না। ধীরে ধীরে আসনে বসিয়া পড়িল।

হাসিতে হাসিতে প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "ও বিষয়ে একচেটে অধিকার যে শুধু একলা আপনারই আছে অনিলবাবু, তা মনে কর্‌বেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার একনিষ্ঠ ভক্ত পাঠকের সংখ্যা আরও অনেক আছে।"

আকাশপটের চন্দ্রের স্নিগ্ধ দীপ্তির মাধুর্য্য সম্মুখের পুষ্পবনে ইন্দ্রজাল রচনা করিতেছিল। অনিল বলিল, "বাহিরে আসলে কেমন হয়, প্রতুলবাবু?"

বীরেশবাবু বলিলেন, "তা খানিক বসা চল্‌তে পারে। তবে বেশীক্ষণ বাহিরের শিশির আপনাদের সহ্য হবে কি?"

প্রতুলচন্দ্র বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তার পর চারি দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, "এখনো হিমের প্রতাপ তেমন প্রবল হয় নি, বীরেশবাবু। তা ছাড়া সাম্‌নে নদী। আপনি বৈজ্ঞানিক, সুতরাং এখানে শিশিরের উৎপাত তত বেশী হবে না, এ আপনি ভালই জানেন।"

এক পাশে যুঁই ঝাড়ের ধারে খানিকটা স্থান বাঁধান ছিল। সেখানে মাদুর পাতিয়া বীরেশবাবু অতিথি যুগলকে বসাইলেন।

কথায় কথায় গৌরীর প্রসঙ্গ প্রতুলচন্দ্র তুলিলেন। এমন গুণবতী কন্যার জন্য একটি গুণবান, সৎপাত্র বীরেশবাবু এখনও পান নাই, এজন্য প্রতুলচন্দ্র অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন।

বীরেশবাবু স্নিগ্ধ প্রশান্তভাবে হাসিয়া বলিলেন, "বর্ত্তমান যুগে মানুষ রূপ এবং রূপেয়ার সম্মেলন চায়, মুন্সেফবাবু। আমার ঘরে এ দুয়েরই অভাব। সুতরাং গুণবান সৎপাত্র আমার কাছে দুর্লভ হয়েই আছে।"

অনিলচন্দ্র মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিল, "আপনার মেয়েকে বোধ হয় আমি দেখেছি। তিনি ত রূপহীনা নন, স্যার।"

অর্চ্চনা

শিল্পী—শ্রীযুক্তা শান্তি দেবী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

COLOURED ILLUSTRATION

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "আমিও দেখেছি। ওঁর মেয়েকে দেখে যে কোন মানুষ মুগ্ধ হবে, এ আমার ধারণা। কিন্তু তবু আপনি কেন ভাল পাত্র পাচ্ছেন না বীরেশবাবু, আমি এখনও বুঝতে পাচ্ছি না।"

"আমার ভাগ্য।"

সঙ্গে সঙ্গে প্রৌঢ় অধ্যাপক একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া অন্দরের দিকে গমন করিলেন।

ভৃত্য তামাক সাজিয়া দিয়া গিয়াছিল। গড়গড়ার নল তুলিয়া লইয়া টানিতে টানিতে প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "আজকাল দেখছি, অনেকেরই ধারণা, প্রচুর উপার্জ্জন না করে বিয়ে করা উচিত নয় বলে, যৌবনের শ্রেষ্ঠভাগ যে ভাবে অবহেলা করে তাতে বাঙ্গালীর ন্যায় স্বল্পকাল-জীবী জাতির পক্ষে আদৌ শুভ নয়।"

অনিল বলিল, "আপনিও ত সেই যুগেরই মানুষ, প্রতুলবাবু। আপনি এখনও বুড়ো হন নি।"

"কিন্তু আমার মনোবৃত্তি স্বতন্ত্র। যথাসময়েই বিবাহের নাগপাশে নিজেকে ধরা দিয়েছি। আপনাদের মত কৌমার্য্যকে বরণ করে জীবনকে বিফল করে তুলি নি।"

উচ্চ হাস্যে প্রতুলচন্দ্র কাননতল মুখরিত করিয়া তুলিলেন।

অনিলচন্দ্র সহসা গম্ভীরভাবে বলিল, "যাদের একদিন বিয়ে করতেই হবে, যৌবনকে কল্পনার স্বপ্নে ব্যর্থ করে দিয়ে তাদের শেষকালে বিয়ে করার বিরুদ্ধে আমি চিরদিন লড়াই করে যাব। যারা ঐ রকম মত প্রকাশ করে, তারা বিদেশের অক্ষম অনুকরণ ক'রে সভ্য সাজতে চায়। ভারতবর্ষ যে ইয়োরোপ নয়, এ জ্ঞান তাদের নেই। কিন্তু যারাই কৌমার্য্যকে বরণ করে চলে, তাদের সকলের জীবনের বা মনের ইতিহাস ত আমরা জানি না। হয় ত বিয়ে না করবার অন্য কারণও থাকতে পারে!"

প্রতুলচন্দ্র দেখিলেন, অনিলচন্দ্রের আননে একটা বিষাদের ছায়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি চমকিয়া উঠিলেন। শ্যালকের মনের মধ্যে কি তবে কোন গোপন ব্যথা আছে? ব্যর্থ প্রণয়?—না, সে রকম কোন আভাস ত এ পর্য্যন্ত তিনি পান নাই। তাঁহার পত্নীর নিকট হইতেও এমন কোন কথা তিনি জানিতে পারেন নাই, যাহাতে অনিলচন্দ্রের বিবাহে বিতৃষ্ণার কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে।

ধীরে ধীরে তিনি ধূমপান করিতে লাগিলেন; কিন্তু চিন্তা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না।

বীরেশবাবু তখনও বাহিরে আসিতেছেন না দেখিয়া অনিলচন্দ্রের দিকে একটু সরিয়া বসিয়া প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "বীরেশবাবুর মেয়েটি কি গুণবতী বলে মনে হচ্ছে না?"

ভগিনীপতির দিকে ফিরিয়া চাহিয়া অনিল বলিল, "বরং ঠিক তার বিপরীত। এমন চমৎকার চেহারার মেয়ে আমি কমই দেখেছি, এমন কণ্ঠস্বর শুনিই নি। ইনি যার গৃহলক্ষ্মী হবেন, সে ভাগ্যবান সন্দেহ নাই।"

প্রতুলচন্দ্র মনে মনে একটু আশান্বিত হইলেন। একদিনে বেশী বাড়াবাড়ি ভাল নয় মনে করিয়া তিনি ও প্রসঙ্গ ত্যাগ করিলেন।

এমন সময় বীরেশবাবু আসিয়া বলিলেন, "এইবার ভিতরে চলুন, আপনারা—সব প্রস্তুত।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সেদিন ঘন ঘটা করিয়া মেঘমালা শূন্যে শূন্যে দৈত্যের ন্যায় বিরাট দেহ বিস্তৃত করিয়া দিয়াছিল। ছিদ্রশূন্য মেঘ—মৃদু বারিপাতের বিরাম নাই। ঝটিকার গর্জ্জন, বিদ্যুতের দীপ্তি প্রথম প্রহর রাত্রিতে বিভীষিকা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। হেমন্ত ঋতুর প্রথম পাদে বাঙ্গালা দেশে প্রায় প্রতি বৎসরই ঝটিকার আবির্ভাব হইয়া থাকে, ইহা আবহবিদ্যাবিদগণ বলিয়া থাকেন।

নির্জ্জন কক্ষে, অনিলচন্দ্র রাত্রির আহার শেষ করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। আজ কলেজ বন্ধ ছিল বলিয়া সমস্ত দিন, সে নিয়মিত সূতা কাটার পর, গ্রন্থপাঠেই অতিবাহিত করিয়াছে। এখন আর পাঠে তাহার স্পৃহা ছিল না। জানালা খুলিয়া দিয়া প্রকৃতির রণরঙ্গিণী মূর্ত্তির দিকে সে নিবিষ্ট মনে চাহিয়া রহিল। প্রকৃতির অশান্ত রূপ তাহার কাছে কখনও প্রচণ্ড বলিয়া মনে হয় না। এই উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যেও সে বিশ্বস্রষ্টার বিচিত্র রূপ ও লীলা দেখিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া উঠে। সে শান্ত নিয়ম শৃঙ্খলার ভক্ত হইলেও মাঝে মাঝে প্রকৃতির উদ্দাম খেয়াল দেখিয়া তাহার

মধ্য হইতে সৌন্দর্য্য-লীলার ধারাবাহিকতা ও শৃঙ্খলার তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে।

আজও তরুণ অধ্যাপক প্রকৃতির এই সংহারিণী মূর্ত্তি দেখিয়া শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধে মহাকালীর তাণ্ডব নৃত্যলীলার ছন্দ অনুভব করিতে লাগিল। না, বিশৃঙ্খলতা বিশ্ব-সৃষ্টিতে নাই, থাকিতে পারে না। নিয়ম অমোঘ, অপ্রতিহত গতিতে জড় ও চেতন জগতে বিদ্যমান। উন্মদগতিতে মেঘমালা ছুটিতেছে,—আকাশের বক্ষ চিরিয়া সুন্দরীর নিষ্ঠুর হাস্যজ্বালার মত যে প্রদীপ্ত শিখা জ্বলিয়া উঠিতেছে, তাহাতেও একটা শৃঙ্খলা আছে। মানুষের মনও কি প্রকৃতির প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারে?

অনিলচন্দ্র চিন্তাজগতে আপনাকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিল। মানব-মনের বিচিত্র ও বিশিষ্ট পার্থক্য সত্ত্বেও একের সহিত অপর মনের সূক্ষ্ম সাদৃশ্য কোথায়—সে সম্বন্ধে মনস্তত্ত্ববিশারদ পণ্ডিতগণ কোথায় কি বলিয়াছেন, এই সকল বিষয়ের আলোচনায় সে তন্ময় হইয়া গেল। বিভিন্ন পণ্ডিতের বিভিন্ন মতবাদ সত্ত্বেও যে চিরন্তন সত্য মানব-জীবনে আত্মপ্রকাশ করে, তাহাকে ভুল করিয়া বুঝিলে চলিবে কেন?

মানুষের মন সুখ চাহে, আনন্দ প্রার্থনা করে—শান্তি-পূর্ণ জীবনযাত্রা সংসারী মানব মাত্রেরই কি একান্ত প্রার্থনার বস্তু নহে? নিশ্চয়ই। কে তাহা অস্বীকার করিতে পারে? তবে?

অনিলচন্দ্র মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল। এমন প্রশ্ন সহসা তাহার অন্তর মধ্যে জাগিয়া উঠিল কেন? চিন্তার কোন্ সূত্র ধরিয়া মন এমন প্রশ্ন উত্থাপিত করিল? ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের কোঠায় আসিয়া মন এমন ভাবে বিচারের আলোচনায় ব্যগ্র হইয়া উঠিল, ইহার হেতু কি?

অন্তরের মধ্যে দৃষ্টিকে প্রসারিত করিয়া দিয়া সে দেখিল, বাহিরের এই দুর্য্যোগময়ী রজনীর মত সেখানেও প্রলয় ঝটিকার সূচনা হইয়াছে। মেঘ জমিয়া বিদ্যুৎদীপ্তি ও বজ্রগর্জ্জনের প্রতীক্ষা করিতেছে। ইহা কি শুধুই খেয়াল, না নিয়মতান্ত্রিক অবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল?

বিগত জীবনের কার্য্যধারা এবং মনোবৃত্তির হিসাব নিকাশ করিতে গিয়া সে দেখিল, অসঙ্গতভাবে, উচ্ছৃঙ্খলতার সহিত সে কোন কাজই করে নাই। কোন কোন কার্য্যের দ্বারা সে পিতা মাতার মনে দুঃখ দিয়াছে; নিজেও সেজন্য হৃদয়ে বেদনা পাইয়াছে সত্য; কিন্তু সে সকল ব্যাপারে তাহার কোন হাতই ছিল না। কর্ম্মফলের অবশ্যম্ভাবী পরিণামকে ন্যায়নিষ্ঠ চিত্ত কি অস্বীকার করিতে পারে?

ঝটিকার প্রচণ্ড গর্জ্জন চলিতে লাগিল। মাঝে মাঝে প্রবল ধারায় বারিপাতও হইতেছিল। অনিলচন্দ্রের দার্শনিক চিত্ত প্রকৃতির এই রণরঙ্গিণী নৃত্যলীলার মধ্যে যে বিচিত্র মাধুর্য্য অনুভব করিতেছিল, তাহাতে সহসা তাহার চিত্ত অভিভূত হইয়া পড়িল।

কিন্তু আজ এক একবার তাহার মনে হইতেছিল, একা একা সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া তেমন তৃপ্তি পাওয়া যায় না। কাহারও সহিত এই সৌন্দর্য্যানুভূতির রস ভাগ করিয়া লইতে পারিলে বোধ হয় একটা সান্ত্বনা পাওয়া যায়।

মনের মধ্যে এই চিন্তা সমুদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বীরেশ বাবুর কন্যার উদ্যানপথবর্ত্তিনী মূর্ত্তি তাহার মানস-দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। তাহার পরিপূর্ণকণ্ঠের সঙ্গীতধারার স্মৃতি তাহার মনে আজিকার এই বাদলধারার ছন্দে যেন মূর্ত্তি গ্রহণ করিল!

অনিলচন্দ্রের মন কয়েক মুহূর্ত্ত সেই স্মৃতির তরঙ্গদোলায় দোল খাইয়া সহসা যেন প্রকৃতিস্থ হইল। তাহার দার্শনিক চিত্ত মনের গতিবেগ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া দেখিল, তাহা ত স্বাভাবিক অবস্থায় নাই।

বাতায়ন সন্নিধান হইতে উঠিয়া অনিলচন্দ্র গৃহমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিল। এই গৌরী তন্বঙ্গী, সুদর্শনা, সুকেশা—এক কথায় সে সুন্দরী। জনশ্রুতি বলে শুধু সুন্দরী নহে, গুণবতী—শিক্ষিতা!

কক্ষমধ্যস্থলে সহসা স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া অনিলচন্দ্র গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিল।

কোনও নারী সম্বন্ধে সে এমনভাবে কখনও ত মনের মধ্যে আলোচনা করে নাই! সে নারী-বিদ্বেষী কোন দিনই নহে, নারীসঙ্গ পুরুষ জীবনকে সম্পূর্ণ ও সার্থক করিয়া তুলে, ইহা ত সে কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করে। কিন্তু জীবনের পঁচিশটি বসন্ত তাহার হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত করিয়া বিষণ্ণ মনে ফিরিয়া গিয়াছে, ইহাও ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই!

সে সৌন্দর্য্যের উপাসক, তত্ত্বরসের ভক্ত। তাহার সমগ্র জীবন, শিক্ষা সবই ত এই সৌন্দর্য্যতত্ত্বের অনুশীলনে নিযুক্ত। মহিমময়ী নারীকে বাদ দিয়া কি সৌন্দর্য্যানুশীলন সম্পন্ন হইতে পারে? তথাপি সে এখনও পর্য্যন্ত কোনও নারীকে হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিবার আয়োজন করে নাই কেন?

আকাশ চিরিয়া বিদ্যুতের দীপ্তশিখা হাসিয়া উঠিল।

অনিলচন্দ্র মনে করিল, উহা নারীরই বিদ্রূপজ্বালা। তাহার চিন্তাধারাকে বিদ্রূপ করিবার জন্যই যেন উহা আকাশপটে মুহূর্ত্তের জন্য দীর্ঘ রেখা আঁকিয়া দিয়া গেল। পরমুহূর্ত্তেই ভীম গর্জ্জনে সমগ্র বাড়ীখানি কম্পিত হইয়া উঠিল।

দূর অতীতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত হইল। কিশোর জীবনের অনাবিল বন্ধুত্ব—প্রাণের আশা ও আনন্দের রঙ্গীণ চিত্রগুলি স্মৃতির পটে ধীরে ধীরে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। সরলহৃদয়ের রিপুকলঙ্কবর্জ্জিত নির্ম্মল মনোভাবগুলি কল্পনার ললিত তুলিকার সঞ্জীবনস্পর্শে বিচিত্রভাবে ফুটিয়া উঠিতেছিল। প্রথম যৌবনে তাহার গতিবেগ স্বচ্ছন্দ ও প্রবল।

কিন্তু প্রবাহধারায় সহসা বাধা প্রচণ্ড হইয়া উঠিল। অদৃষ্টের নির্ম্মম বাহু বিরাট লৌহপ্রাচীর তুলিয়া সে গতি-বেগের প্রবাহকে রুদ্ধ করিয়া দিল। তরুণ হৃদয়ের সে নৈরাশ্য সে জীবনে বিস্মৃত হইতে পারে নাই। গভীর সহানুভূতিতে তাহার সমগ্র অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। অলক্ষ্য দেবতার চরণোদ্দেশে গভীর নতি জানাইয়া সে কি অঙ্গীকার করে নাই, যতদিন—যে পর্য্যন্ত ব্যথিত, নৈরাশ্য-পীড়িত হৃদয়ে আশা ও আনন্দের আলোক জ্বলিয়া না উঠে ততদিন তাহার মুক্তি নাই? ততদিন সাংসারিক জীবের প্রার্থনীয় মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনার বস্তু হইতে সে আপনাকে দূরে নির্ব্বাসিত রাখিবে?

ঝটিকার তরঙ্গ কক্ষমধ্যে উন্মদ উচ্ছ্বাসে ছুটিয়া আসিল। গৃহের আলোক আত্মরক্ষার ক্ষীণ চেষ্টা করিয়া অন্ধকারে আত্মবিসর্জ্জন করিল।

অনিলচন্দ্র আলো জ্বালিবার কোন চেষ্টা না করিয়া ধীরে ধীরে আবার অন্য দিকের খোলা জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল।

দ্রুততর বেগে, উন্মত্তভাবে মেঘের পর মেঘ ছুটিয়া চলিয়াছে, ঘনান্ধকারেও তাহা অনিলের দৃষ্টি এড়াইল না।

বুকের উপর বাম হস্ত স্থাপন করিয়া শূন্য নয়নে অনিলচন্দ্র মহাশূন্যের দিকে চাহিয়া রহিল।

তাহার সে দিনের সে অঙ্গীকার, সে প্রতিজ্ঞার কথা কোন মানুষই শুনে নাই; কিন্তু সকলের অন্তর্যামী চির-সুন্দর কি সেদিন আশীর্ব্বাদ-ধারায় অভিষিক্ত করিয়া তাহার প্রাণের মধ্যে বলিয়া উঠেন নাই—"তথাস্তু"?

না, তাহার ব্রত এখনও অনুদ্‌যাপিত রহিয়াছে, তাহার কর্ম্ম অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। আত্মতৃপ্তি, আত্মসুখ ভোগ করিবার ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত অধিকার এখনও তাহার হয় নাই।

কিন্তু সে কথা প্রকাশ করিবার অধিকারও তাহার নাই। লৌকিক জীবনে তাহার এ মনোবৃত্তির কোনও মর্য্যাদা হয় ত নাই। তাহার এমন সঙ্কল্প সাধারণ মানুষের কাছে উদ্ভট, হাস্যোদ্দীপক বলিয়া উপেক্ষিত হইবে।

ঝটিকার তরঙ্গে সে কাণ পাতিয়া কি যেন শুনিতে লাগিল। তাহার মনে হইল দূর হইতে যেন গানের সুরে ধ্বনিত হইতেছে—

বড় দাগা পেয়ে বাসনা ত্যজেছি,
বড় জ্বালা সয়ে কামনা ভুলেছি,—"

সত্য, অতি সত্য। মানব-জীবনের এই অনতিক্রমনীয় সত্যকে সেদিন তরুণীর কণ্ঠে মূর্ত্তি গ্রহণ করিতে সে দেখিয়াছে। তাহার অতীত ও বর্ত্তমান সেই সত্যকে বহন করিয়া অনুক্ষণ দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে না কি?

অনিলচন্দ্র স্তব্ধভাবে ঝটিকাবিক্ষুব্ধ রজনীতে তেমনই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ম্যাজিষ্ট্রেট-গৃহিণী সমাদরে অনিলচন্দ্রকে কাছে বসাইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "তার পর, সকালবেলা কি মনে করে, মিঃ বোস্?"

অনিলচন্দ্র বলিল, "আমাদের একটু সাহায্য করতে হবে আপনাকে।"

মিসেস্ টমসন্ সহাস্যে বলিলেন, "আপনাকে সাহায্য করতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত, কারণ আমি জানি আপনি

নিজের জন্য কোন কিছু করেন না। আর যা কিছু করেন, তাতে কোন অন্যায়ের সংস্রব নেই।"

এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় লজ্জিত হইয়া অনিলচন্দ্র বলিল, "আমার সম্বন্ধে আপনার এমন উচ্চ ধারণার জন্য আমি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাক্‌ব। কিন্তু মিসেস্ টমসন্, আপনি এমন ভাবে আমায় লজ্জা দিলে কোন কথা বলাই আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠ্‌বে না।"

প্রৌঢ়া ইংরাজ মহিলা অনিলচন্দ্রের পৃষ্ঠদেশে মৃদু করাঘাত করিয়া বলিলেন, "অনিল, তোমার মত বয়সের একটি ছেলে আমি হারিয়েছি। সে যদি তোমার মত মনোবৃত্তি নিয়ে বেঁচে থাক্‌ত, আমার বুক্ মাতৃগর্ব্বে ভরে উঠ্‌ত। তোমার সম্বন্ধে সহরের পদস্থ ভদ্র লোকদের উচ্চ ধারণার কথা তুমি হয় ত জান না। তোমার গুণের প্রশংসায় মিঃ টমসন্ পঞ্চমুখ, সুতরাং লজ্জার কোন কারণই তোমার নেই।"

কথার মোড় ঘুরাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে অনিলচন্দ্র বলিল, "যে জন্য আজ আপনার কাছে এসেছি, সে কথা নিবেদন কর্ত্তে পারি কি?"

"অনায়াসে, তুমি যা বল্‌বে আমি তাই করতে প্রস্তুত।"

অনিলচন্দ্র তখন তাহার বক্তব্য বিষয়টি বুঝাইয়া দিল। সহরে আগামী শীতঋতুতে একটি স্বদেশী শিল্পমেলা বসাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। দেশের কুটীর শিল্প, কৃষিজ পণ্য, দেশীয় ললিতকলার নিদর্শনসমূহ লইয়াই মেলার প্রতিষ্ঠা হইবে। কর্ম্মের দিক দিয়া, চিন্তার অনুশীলনে বাঙ্গালী কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, এ অঞ্চলের নরনারীর সম্মুখে যদি তাহা ধরিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে উৎসাহ পাইয়া অনেক বিষয়ে বাঙ্গালী আত্মনিয়োগ করিতে পারিবে। বস্তুতান্ত্রিকতার দিক দিয়া ইহা জাতির পক্ষে কল্যাণকর। মিসেস্ টমসনের চিত্র-বিদ্যার বিশেষ খ্যাতি আছে। ইংলণ্ডের চিত্রশালায় তাঁহার অঙ্কিত একখানি প্রসিদ্ধ চিত্র রক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং তিনি যদি মেলার চিত্রকলা বিভাগের প্রেসিডেণ্টের পদ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে মেলার অনুষ্ঠাতৃবর্গ কৃতার্থ হইবেন। মিঃ টমসন্ মেলার উদ্বোধন করিবেন এবং যাহাতে বাঙ্গালীর এই জাতীয় শিল্পপ্রচেষ্টা স্বদেশী মেলা সার্থক হয় সে বিষয়েও তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না।

মিসেস্ টমসন্ বলিলেন, "মিঃ টমসনের কাছে এ খবর আমি আগেই পেয়েছি। তোমাদের এ প্রচেষ্টা সাধু। কিন্তু অনিল, এ শিল্প মেলা প্রতিষ্ঠার মূল গায়েন কে? আমি শপথ করে বল্‌তে পারি, এ কল্পনা প্রথম তোমার মনেই উঠেছিল।"

সলজ্জকণ্ঠে অনিল বলিল, "না, মিসেস্ টমসন্, এর জন্য আমাকে প্রশংসা দিবেন না। এর প্রথম প্রেরণার জন্য একটি তরুণী—বাঙ্গালী মেয়েই সকল প্রশংসার অধিকারিণী। আমি ঘটনাক্রমে সেই কথাটা জান্‌তে পেরে সকলের কাছে প্রস্তাব করেছি। সহরের গণ্যমান্য সকলেই অবশ্য উৎসাহ ও অর্থ ব্যয় করতে রাজি হয়েছেন।"

মিসেস্ টমসন্ বিস্মিতকণ্ঠে বলিলেন, "বটে! সে মেয়েটি কে?"

অনিল বলিল, "কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক বীরেশ বাবুকে বোধ হয় আপনি জানেন। তাঁরই মেয়ে গৌরী একদিন কথায় কথায় আমার বোনএর কাছে বলেন, সারা বাঙ্গালায় কত কি হচ্ছে, আমাদের এখানে এমন একটা শিল্প মেলা বসালে মন্দ হয় কি? দেশের মেয়েরাও নিশ্চিন্ত বসে নেই—তাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করতে পারলে অনেক কাজ বোধ হয় হতে পারে। সেই কথা শুনে—"

ম্যাজিষ্ট্রেট পত্নী হাসিয়া বলিলেন, "বুঝেছি। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি কিছু মনে কর না। মেয়েটি কি বিবাহিতা?"

মিসেস্ টমসনের প্রশ্নে, কৌতুকভরা স্নেহদৃষ্টির আঘাতে অনিল কি ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল?

সে মুহূর্ত্তে দৃষ্টি নত করিল। তাহার আনন ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল। মৃদুস্বরে সে বলিল, "না, মিসেস্ টমসন্। তাঁর এখনও বিয়ে হয় নি। সুপাত্রের অভাবে বীরেশবাবু এখনও তাঁকে ঘরে রাখতে বাধ্য হয়েছেন।"

"তুমিও এখন কুমার অবস্থায় আছ? হ্যাঁ, আমি তাই শুনেছি। এ কথা ঠিক?"

অনিল পূর্ব্ববৎ মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আপনার সংবাদ সত্য। কিন্তু—"

সহসা সে থামিয়া গেল। সে এ সকল বিষয় লইয়া আলোচনা করা সঙ্গত মনে করিল না।

মিসেস্ টমসন্ তখনও তেমনই সহাস্য আননে, প্রসন্ন দৃষ্টিতে অনিলের দিকে স্থির ভাবে চাহিয়া ছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বীরেশবাবুর কথা আমি শুনেছি, তিনি যেমন পণ্ডিত, তেম্‌নি ধর্ম্মপ্রাণ। তোমার ভগিনীপতি প্রভুলের কাছে শুনেছি, তাঁর মেয়েটি অতি চমৎকার। আমি কিন্তু খুব সুখী হব, অনিল, ভারী তৃপ্তি পাব।"

অনিলের অন্তর-দেশ এই ইঙ্গিতের অর্থ বুঝিয়া ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া উঠিল। বোধ হয় ভিতরের কম্পনবেগ বাহিরেও আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকিবে। সে কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বোধ হয় আত্মসংবরণের চেষ্টা করিতেছিল।

দৃঢ়বলে সে মুখ তুলিয়া চাহিল, সংযত কণ্ঠে বলিল, "আপনি আমাদের প্রার্থনায় অনুমোদন করলেন ত, মিসেস্ টমসন্?"

ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী গাঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়। শুধু তাই নয়, তোমাদের মেলা ভাণ্ডারে আমি যৎসামান্য—হাজার টাকা দিতে চাই।"

উৎসাহভরে অনিল বলিল, "এ জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে আপনার মহত্ত্ব ও স্নেহকে বিচার করতে চাই না, মা! আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন!"

অনিলের নয়ন-যুগল ছল ছল করিয়া উঠিল। সে জানিত এই দয়াবতী মহিলা নানা সদ্‌গুণের অধিকারিণী, ধনী পিতার কন্যা। কিন্তু তাঁহার অন্তর এ-দেশীয়দিগের কল্যাণ-কল্পে এমন উন্মুক্ত তাহা সে পূর্ব্বে কল্পনাও করিতে পারে নাই!

সে আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইতেই শ্রীমতী টমসন্ হাসিয়া বলিলেন, "এই স্বদেশী মেলায়, অনিল বসুর খদ্দরের সুতায়, তাঁতের কাপড় দেখ্‌তে পাব ত?"

অনিল মাথা নত করিয়া বলিল, "আপনার আশীর্ব্বাদ থাক্‌লে এই পুণ্য-মন্দিরে আমার সামান্য অর্ঘ্য নিয়ে উপস্থিত হবার চেষ্টা করব।"

মিসেস্ টমসন্ বলিলেন, "তোমায় এ জন্যও আমি ভালবাসি, অনিল।"

অনিল নতশিরে অভিবাদন করিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পূজার ছুটীর দীর্ঘ অবকাশে বীরেশবাবু স্ত্রী ও কন্যাকে সঙ্গে লইয়া পশ্চিমে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। হৈমবতীর বহুদিনের সাধ ছিল, তিনি বৃন্দাবন, মথুরা, প্রয়াগ, কাশী প্রভৃতি তীর্থ দেখিয়া আসিবেন। কন্যা গৌরীর কৌতূহলের অন্ত ছিল না। বীরেশবাবুর কয়েকখানি গণিত পুস্তক শিক্ষাবিভাগের মনোনীত হওয়ায় তিনি উহা বিক্রয় করিয়া বিগত দুই বৎসরে কিছু মোটা টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কন্যার বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কয়েক সহস্র টাকা নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া, অতিরিক্ত অর্থ তিনি স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিলেন। এবার পূজার অবকাশে গৃহিণীর চির-সঞ্চিত বাসনার তৃপ্তিসাধন তাঁহার একান্ত লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

পল্লীভূমি হইতে বাহির হইবার তাঁহার আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল। কলিকাতাতে তাঁহার কোনও আত্মীয় থাকিতেন। কন্যার জন্য দুই একটি পাত্রের সন্ধান তিনি দিয়াছিলেন। তীর্থ ভ্রমণ সারিয়া ফিরিবার পথে সে বিষয়ে আলোচনা এবং প্রয়োজন হইলে মেয়ে দেখানর কাজ সারিয়াও যাইতে পারেন। অত্যন্ত প্রার্থিত পাত্র অনিলচন্দ্রের তরফ হইতে আকার ইঙ্গিতেও কোনও অনুকূল ভাব এ পর্য্যন্ত দেখিতে না পাইয়া কন্যার বিবাহকে আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের গর্ভে ফেলিয়া রাখিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না।

তাহা ছাড়া আগামী স্বদেশী মেলা উপলক্ষে ছুটীর পর তাঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইবে; তাহাও তিনি জানিতেন। তিনিও উদ্যোক্তাদিগের অন্যতম। বিশেষতঃ অনিলচন্দ্র তাঁহার উপর এ বিষয়ে বিশেষরূপে নির্ভর করে বলিয়া অন্ততঃ মাসখানেক ধরিয়া দেশ ভ্রমণের দ্বারা মনের ও শরীরের গ্লানি দূর করিয়া আসিতে তিনি মনস্থ করিয়াছিলেন।

কাশী, বিন্ধ্যাচল, প্রয়াগ দর্শন করিয়া বীরেশবাবু মথুরা ও বৃন্দাবনে কয়েক দিন অবস্থান করিলেন। সেখানকার দর্শনীয় যাবতীয় স্থান দর্শন করিয়া ভক্ত বীরেশবাবু অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্ত, তাই ভক্তজন-পূজিত রাধামাধবের লীলাভূমিতে কয় দিন

যাপনের পর স্থির করিলেন, কিছু বেশী দিন আগ্রায় থাকিয়া মোগল-সম্রাটগণের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দর্শন করিবেন।

সম্রাট সাজাহানের গৌরব-স্তম্ভ তাজ দেখিবার আগ্রহ গৌরীর চিত্তকে সমধিক অভিভূত করিয়াছিল। বীরেশ-বাবুও পূর্ব্বে কখনও পৃথিবীর এই অন্যতম আশ্চর্য্য বস্তু দেখিয়া ধন্য হন নাই—অথচ ইহার সম্বন্ধে দেশীয় ও বিদেশীয় পর্য্যটকগণের কত বর্ণনাই না তিনি পাঠ করিয়াছেন।

ভদ্র বাঙ্গালীর বাসের উপযোগী হোটেলের অভাব আগ্রা সহরে নাই। বীরেশবাবু পরিবার সহ বাস করিবার উপযোগী এইরূপ একটি হোটেলের একাংশ ভাড়া করিলেন। পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্যটিকে তিনি সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সহর ভ্রমণে বাহির হইলে ভৃত্যটি বাসায় প্রহরীর কার্য্য করিত।

আগ্রায় আসিবার পর প্রথমতঃ উপর্য্যুপরি কয়দিন ধরিয়া তাঁহারা সম্রাট আকবর প্রভৃতির সমাধি-ভবন দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন। স্থাপত্য-শিল্পের এমন চমৎকার নিদর্শন দেখিয়া সকলেরই চিত্ত অভিভূত হইল। আগ্রা সহরে কোনও উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর নিকট তিনি পরিচয়-পত্র আনিয়াছিলেন। ভদ্রলোকের চেষ্টায় আগ্রা দুর্গ দেখিবার ছাড়পত্রও তাঁহার পক্ষে সংগ্রহ করা দুর্লভ হইল না।

দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গৌরী মন্ত্রমুগ্ধবৎ বলিল, "বাবা, এ যে একটা প্রকাণ্ড সহরের মতই বড়।"

পিতা বলিলেন, "তাই ত দেখ্‌ছি।"

মর্ম্মরপ্রস্তর-রচিত দেওয়ানী আম, দেওয়ানী খাস দেখিয়া গৌরী বলিল, "সম্রাটের দরবার এখানেই বস্‌ত, বাবা?"

"হ্যাঁ, মা।"

"কি চমৎকার শিল্পকাজ!"

বীরেশবাবু আনমনে বলিলেন, "তবু এখন ত কিছুই নেই। শুনেছি দামী পাথরগুলো সব খুলে নিয়ে গিয়েছে।"

ক্রমে তাঁহারা সম্রাট সাজাহান যেখানে বসিয়া প্রত্যহ তাজের শোভা দেখিতেন সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মোগল সম্রাটগণের আধিপত্যের যুগে দুর্গ-প্রাসাদে যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-বিভূতি ছিল, এখন তাহা অন্তর্হিত হইলেও, অতীত গৌরবের স্মৃতি দর্শকগণের মনকে বিস্ময়রসে পূর্ণ করিয়া ফেলিল।

শিশমহলের কারুকার্য্য, সাজাহানের কারাকক্ষ প্রভৃতি দেখিয়া তাঁহারা সেদিনের মত বাসায় ফিরিয়া গেলেন।

পরদিবস দিবাভাগে তাজের সৌন্দর্য্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া গৌরী বলিল, "বাবা শুনেছি, রাত্রিতে তাজের সৌন্দর্য্য বর্ণনার অতীত রূপ ধারণ করে। জ্যোৎস্না-রাতে একদিন তাজ না দেখে আমি কিন্তু আগ্রা ছাড়তে রাজি নই।"

বীরেশবাবু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তাই হবে। পূর্ণিমার রাত্রিতে আসা যাবে।"

গৌরী চলিতে চলিতে বলিল, "সে ত এখন দেরী আছে, বাবা। এর মধ্যে ফতেপুর সিক্রি দেখে এলে হয় না?"

গাইডকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে, ফতেপুর সিক্রিতে আকবর সাহের লালপাথর নির্ম্মিত কেল্লা আছে। আগ্রার দুর্গ সেই আদর্শে নির্ম্মিত। তাঁহারা ইচ্ছা করলে যাইতে পারেন। দেখিয়া তৃপ্তিলাভ অসম্ভব নহে।

পর দিবস সকাল সকাল আহার সারিয়া বীরেশবাবু সপরিবারে রেলে চড়িয়া ফতেপুর সিক্রি ষ্টেশনে নামিলেন। ক্ষুদ্র ষ্টেশন, যাত্রীর সংখ্যাও অধিক নহে। মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্য্যালোকে তাঁহারা প্রথমতঃ সেলিমচিস্তি দেখিতে গেলেন। যে ফকীরের দৌলতে আকবর পুত্রলাভ করিয়াছিলেন, মর্ম্মর-প্রস্তর নির্ম্মিত সেই সমাধিক্ষেত্রে তাঁহারা উপস্থিত হইলেন। এই ফকিরের নামানুসারেই জাহাঙ্গীরের ডাক-নাম সেলিম হইয়াছিল। বন্ধ্যারা এখনও জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে, ফকিরের সমাধিক্ষেত্রে নানাবিধ স্মারক দ্রব্য ঝুলাইয়া রাখে।

গৌরী ইতিহাসে এ সকল কথা পড়িয়াছিল। তাহার অন্তর যে কোনও পবিত্র স্থানে আসিলেই ভক্তিতে নত হইয়া পড়িত। সে পরলোকগত মহাপুরুষের উদ্দেশে নমস্কার জানাইল।

পল্লীর শ্যামাঞ্চলে প্রতিপালিতা গৌরী পূর্ব্বে কখনও দেশের গণ্ডী ছাড়াইয়া বাহিরের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে, বাধাবন্ধহীন উদার আকাশ-তলে এমন করিয়া বাহির হয় নাই। প্রথম প্রথম যে সহজাত কুণ্ঠা তাহাকে পশ্চাতে আকর্ষণ করিত, মুক্ত বাতাসে, নানা দেশের আবহাওয়ায় কয় দিনের মধ্যে সে জড়তা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। এখন সে সকল

ক্ষেত্রেই পুরোবর্ত্তিনী হইত। মাতা হৈমবতী সময়ে সময়ে তাহাকে বাধা দিতে গেলে বীরেশবাবু বলিয়া উঠিতেন "যাক না, ওতে দোষ নেই ত। একটু সাহস হোক্। বাঙ্গালার মেয়েরা কি চেলির পুঁটুলী হয়েই চিরদিন থাক্‌বে, না সেটা বাঞ্ছনীয়?"

হৈমবতী আর আপত্তি করিতেন না।

আজও সে সর্ব্বাগ্রে উচ্চ ভূমি অতিক্রম করিয়া পরিত্যক্ত বিরাট দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিল। এক সময়ে সশস্ত্র দ্বারী প্রবেশ-পথে দাঁড়াইয়া থাকিত,—সাধারণ ত দূরের কথা, পরিচিত ব্যক্তিকেও সন্তর্পণে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইত।

কথাটা গৌরীর মনে হইতেই সে দাঁড়াইয়া পড়িল। গাইড্ সহ পিতা ও মাতা অল্পক্ষণ মধ্যে তথায় আসিলেন।

গাইড্ দেখাইয়া দিল, এইখানে বীরবলের প্রাসাদ। অদূরে সম্রাট-মহিষীর মহল। এইরূপ নানা স্থান দেখিতে দেখিতে সোপান-শ্রেণী বাহিয়া সকলে দুর্গের সমুচ্চ স্থানে উপনীত হইলেন।

ভারত-সম্রাট যে সকল কক্ষে বাস করিতেন, তাহার সম্মুখে কৃত্রিম পুষ্করিণী। একদিন এইখানে সুগন্ধি শীতল জলে সম্রাট-মহিষী ও পুরকামিনীরা লীলাভরে জলক্রীড়া করিতেন। তাতার প্রহরিণীরা তখন ভীষণ আয়ুধে সজ্জিত হইয়া চারি দিকে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। তখন মণিমাণিক্য-খচিত আলোকিত কক্ষগুলির মধ্যে নৃত্য ও সঙ্গীতের যে তরঙ্গোচ্ছ্বাস উত্থিত হইত, এখনও কি তাহার রেশ গগনে-পবনে অনুরণিত হইয়া উঠিতেছে না!

স্নিগ্ধ বাতাস শরীর জুড়াইয়া দিয়া বহিয়া গেল।

গৌরী মুগ্ধচিত্তে ষোড়শ খৃষ্টাব্দের সেই অদৃশ্য চিত্রের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে করিতে একটি প্রস্তরাসনের উপর বসিয়া পড়িল।

সম্মুখে দিগন্তপ্রসারী প্রান্তর। একদিন এই প্রান্তরে সংগ্রাম সিংহ ও বাবরের মধ্যে বল-পরীক্ষা হইয়াছিল। ফতেপুর সিক্রির রণক্ষেত্র ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া নাই কি?

অস্তগামী সূর্য্য প্রান্তর-পারে অদৃশ্য হইতেছিল। গৌরী নির্নিমেষ নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রত্যেকটি বিষয় পিতার নিকট সে যত্ন করিয়া শিখিয়াছিল। অধীত বিষয়গুলি তাহার দৃষ্টির সম্মুখে মূর্ত্তি লইয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। মানসিংহ, প্রতাপসিংহ, আকবর, বীরবল যোধাবাই, নৌরোজা—হিন্দুর ব্যক্তিগত বীরত্ব অথবা দুর্ব্বলতা, মোগল জাতির পরাক্রম, রাজনীতিক প্রতিভার বিকাশ ও অবসান।

অঙ্ক ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে সুপণ্ডিত পিতার কাছে ভারতবর্ষের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস এবং অধঃপতনের ক্রম-বিকাশের অতীত কাহিনী সে যত্ন করিয়া পাঠ করিয়াছিল। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দুর্গশিরে বসিয়া, নির্জ্জন অপরাহ্ণে তাহার নারীহৃদয় ব্যথিত ও ক্লিষ্ট হইয়া উঠিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, অদূরে তাহার জননী বসিয়া পাণের কৌটা খুলিয়া পাণ চর্ব্বণ করিতেছেন, পিতা নির্ব্বাক ভাবে সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। গাইড্ আরও কিছুদূরে দাঁড়াইয়া বিড়ি টানিতেছে।

কন্যার পদশব্দে পিতা ফিরিয়া চাহিলেন। ম্লান সন্ধ্যালোকে দেখিলেন, তাঁহার গৌরী-মার নয়নে দুই বিন্দু অশ্রু। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া কন্যার পার্শ্বে আসিলেন।

গৌরী মৃদুকণ্ঠে বলিল, "বাবা, চল নেমে যাই—ভাল লাগ্‌ছে না।"

বোধ হয় একই চিন্তা পিতা ও পুত্রীকে অভিভূত করিয়াছিল। তিনি সংক্ষেপে বলিলেন, "তাই চল, মা।"

গাইডের অনুবর্ত্তী হইয়া তিনটি প্রাণী নির্ব্বাক ভাবে দুর্গ হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন। আকাশ-পথে তখন দ্বাদশীর চাঁদ দেখা যাইতেছিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

পরিপূর্ণ চন্দ্রের কিরণ ধারায় রজনী অবগাহন করিতেছিল।

উদ্যান-তোরণের সম্মুখে গাড়ী থামাইয়া টঙ্গাওয়ালা বিনীত কণ্ঠে বলিল, "এখানে কতক্ষণ থাক্‌বেন, বাবু?"

ভাঙ্গা উর্দ্দুতে বীরেশ বাবু জানাইলেন, অন্ততঃ ঘণ্টা দুই তাঁহারা ত থাকিবেনই। কিছু বেশীও হইতে পারে। আগ্রায় আসিবার পর কয়দিন ধরিয়া এই টঙ্গাওয়ালা প্রত্যহ তাঁহাদিগকে বহন করিয়া দর্শনীয় স্থানগুলি দেখাইয়া আসিতেছিল।

সেলাম করিয়া সে জানাইল, দুই ঘণ্টা পরে আসিয়া

সে তাঁহাদিগকে বাসায় লইয়া যাইবে। রাত্রির ভোজন ব্যাপারটা সে ইতিমধ্যে শেষ করিয়া আসিতে চাহে। যদি দুই দশ মিনিট বিলম্ব হয়, তাঁহাদের কোন চিন্তার কারণ নাই। বিপদের কোন প্রকার আশঙ্কা এখানে নাই। বাঙ্গালী বাবুরা, বিদেশী সাহেবরাও জ্যোৎস্নারাত্রিতে এখানে প্রায়ই বেড়াইতে আসেন। তবে এ বৎসর তেমন ভিড় নাই। যাহাই হউক, বাবুজী যেন চিন্তিত না হন, তাহার বাড়ী বেশী দূরে নহে। এই অঞ্চলেরই সে লোক। যথাসময়ে সে আসিবে।

অর্দ্ধচন্দ্রাকারে যমুনা তাজের পাদদেশ ধৌত করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। জলতরঙ্গে জ্যোৎস্নাতরঙ্গ মিশিতেছিল। কালো জলে সে হিরণ্যদ্যুতি যেন শ্যাম-হৃদয়ে রাধার রূপ-জ্যোৎস্নার বিচিত্র বিকাশ!

মুগ্ধ হইয়া গৌরী কয়েক মুহূর্ত্ত সে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-সুধা পান করিল। তার পর কৌমুদীস্নাত তাজের শুভ্র মূর্ত্তির দিকে চাহিতেই সে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। এ কি বিচিত্র রূপ! শত শত কবি চন্দ্রালোকে তাজের যে বর্ণনা করিয়াছেন, এ সৌন্দর্য্য—এ বিচিত্র রূপ কি কাহারও লেখনীতে যথার্থ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে!

সাজাহানের জীবনব্যাপী প্রেমের স্বপ্নের এই মূর্ত্ত বিগ্রহটির তুলনা কোথায়?

অভিভূতভাবে তরুণী সেইখানে বসিয়া পড়িল। শিল্পী মানব ইহা গড়িয়াছে, সাম্রাজ্যের অতুল অর্থ বৈভব ইহার দেহের সৌন্দর্য্য-বিধানের উপকরণ অক্লান্ত ভাবে যোগাইয়াছে; কিন্তু মানবের শাশ্বত প্রেম ইহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা না করিলে, অনন্তযৌবনা তাজ যুগে যুগে নর-নারীর মনে এমন ভাবে অপূর্ব্ব মাধুর্য্যরসের তরঙ্গ তুলিতে পারিত কি?

এমন অনুপম সৌন্দর্য্য দর্শনে জীবন সার্থক করিবার জন্য আজ দর্শকের ভিড় না থাকায় নিস্তব্ধ রজনীর মৌন স্তুতি যেন অম্বরপথে বিনা বাধায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল।

হৈমবতী স্বামীর সহিত বিমুগ্ধ ভাবে ঊর্দ্ধনেত্রে তাজের উন্নত দেহের প্রতি চাহিয়া ছিলেন। মনুষ্যের উচ্চারিত ভাষা পাছে এই গম্ভীর সৌন্দর্য্যের ধ্যান ভঙ্গ করে, এ জন্য কেহই কোন কথা কহিলেন না।

এমন সময় দূরে সুবৃহৎ চত্বরের কোনও অদৃশ্য প্রান্ত হইতে মৃদু বংশীধ্বনি বাজিয়া উঠিল। অতি ধীরে প্রকৃতির মৌন স্তুতির তালে তালে বাঁশী যেন লীলায়িত শব্দতরঙ্গে মুখর হইয়া উঠিতে লাগিল।

প্রকৃতির ভাষাহীন অশরীরী বন্দনার ছন্দে ছন্দে মানুষের ফুৎকারে প্রাণহীন বাঁশীর দেহরন্ধ্র হইতে যে বিচিত্র বন্দনাগীতি বাতাসে ভর করিয়া শূন্য পথে যাত্রা করিতেছিল, তাহার মাদকতা হৈমবতী, বীরেশচন্দ্র ও গৌরীর হৃদয়তন্ত্রীকে বিমূঢ় করিয়া ফেলিল।

দণ্ডের পর দণ্ড এমনই ভাবে যেন মুহূর্ত্তের ন্যায় সরিয়া গেল। বাঁশীর ঝঙ্কার যমুনার কলোচ্ছ্বাস, মৃদু বাতাসে বৃক্ষের সর্ সর্ শব্দ যে ঐক্যতান রচনা করিতেছিল, তাহার মাধুর্য্য শুধু উপভোগ্য,—বর্ণনীয় নহে।

কথাটা গৌরীর মনে সমুদিত হইবামাত্র সে একবার পিতামাতার দিকে চাহিয়া দেখিল। না, তাঁহারাও মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতেছেন,—শুধু একা সেই অভিভূত হয় নাই।

বাঁশীর ঝঙ্কার ক্রমশঃ থামিয়া গেল।

বীরেশ বাবু ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহারা প্রায় দুই ঘণ্টা কাটাইয়া দিয়াছেন।

না, আর রাত্রি করা সঙ্গত নহে। টঙ্গাওয়ালা এতক্ষণ ফিরিয়া আসিয়াছে। এখন বাসায় ফিরিয়া যাওয়াই উচিত।

"গৌরী মা, চল এখন ফিরি।"

অনিচ্ছাসত্ত্বে উঠিয়া দাঁড়াইয়া গৌরী মৃদুকণ্ঠে বলিল, "যেতে ইচ্ছে করে না, বাবা। এ দৃশ্য দেখে তৃপ্তির শেষ নেই।"

হৈমবতী বলিলেন, "সে কথা সত্যি; কিন্তু আর রাত করা উচিত নয়। দশটা বেজে গেল প্রায়।"

তাজের চত্বর হইতে নামিয়া একটু অগ্রসর হইতেই বীরেশবাবু দেখিলেন, অদূরে দুইজন লোক মন্থর গতিতে তাঁহাদের অগ্রে চলিয়াছে। তাঁহারা ব্যতীত অন্য কোনও দর্শকের অস্তিত্ব এতক্ষণ তাঁহাদের দৃষ্টির গোচর ছিল না। ইহারাও কি এতক্ষণ তাজের অনবদ্য মহিমায় অভিভূত হইয়া বসিয়া ছিল?

দীর্ঘাকার লোক দুইটি ক্রমশঃ দ্রুত চলিয়া তাজের প্রবেশ-তোরণ উত্তীর্ণ হইল। তাহার পরেই বৃক্ষবীথির অন্ধকারে আর তাহাদিগকে দেখা গেল না॥

বীরেশচন্দ্র কন্যার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "একটু তাড়াতাড়ি এস; বড় রাত হয়ে গেছে।"

তোরণ পার হইয়া আর কিছুদূর গেলেই গাড়ী পাওয়া যাইবে। বীরেশবাবু দ্রুত চলিতে চলিতে একবার সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন—গাড়ী আসিয়াছে কি?

ভাল বুঝা গেল না, নির্দ্দিষ্ট স্থান শূন্য বলিয়াই মনে হইল।

"বাবা!"—গৌরীর শঙ্কিত কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইতেই চন্দ্রালোকে তিনি দেখিলেন, ছায়াচ্ছন্ন বৃক্ষবীথীর অন্তরাল হইতে পূর্ব্বদৃষ্ট দুইটি মূর্ত্তি তাঁহাদের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল।

দৃঢ়মুষ্টি যষ্টি ধারণ করিয়া বীরেশবাবু ভাঙ্গা হিন্দীতে বলিলেন, "কে তোমরা?"

সে কথার উত্তর না দিয়া একজন বলিয়া উঠিল, "তোফা! বহুৎ বড়িয়া চিজ, দোস্ত!"

কন্যাকে পশ্চাতে ঠেলিয়া দিয়া বীরেশবাবু যষ্টি উদ্যত করিয়া বলিলেন, "হঠ্ যাও, বদমাস্!"

অপর ব্যক্তি বাহু বিস্তৃত করিয়া ঈষৎ জড়িতকণ্ঠে বলিল, "পাকড়ো, ছোড়ো মৎ!"

উভয়ের মুখ হইতেই সুরার উৎকট গন্ধ বাহির হইতেছিল।

হৈমবতীর কণ্ঠদেশ হইতে উত্থিত চীৎকার বাহির হইতে চাহিল না। গৌরীর আনন মুহূর্ত্তে ম্লান হইয়া গেল। বীরেশবাবু ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "পাজি, বদমাস্!"

কিন্তু তাঁহার উদ্যত যষ্টি কাহারও অঙ্গ স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই—সম্মুখের জোয়ান লোকটা তাহা ধরিয়া ফেলিল এবং প্রবল আকর্ষণে কাড়িয়া লইতেই টাল সামলাইতে না পারিয়া তিনি হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেলেন।

শঙ্কিতা, বেপথুমতী নারীযুগল বীরেশ বাবুকে তুলিতে যাইবে, এমন সময় হৈমবতীকে সরাইয়া দিয়া জোয়ান লোকটা গৌরীর দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল, "মেরি পি—বাপ্—" সঙ্গে সঙ্গে আর্ত্তনাদ করিয়া লোকটা তিন চারি হাত দূরে পড়িয়া গেল।

সবিস্ময়ে ফিরিয়া চাহিতেই গৌরী দেখিতে পাইল, দীর্ঘাকার এক যুবা দ্বিতীয় ব্যক্তির কণ্ঠদেশ দুই হস্তে চাপিয়া ধরিয়া নিপীড়িত করিতে করিতে বলিতেছে, "কুত্তাকা বাচ্ছা, নারীর প্রতি অত্যাচার!"

তার পর ভীম পদাঘাতে তাহার শিথিল-প্রায় দেহকে ভূতল শায়িত করিয়া যুবক স্নিগ্ধ কণ্ঠে হৈমবতীকে বলিল, "ভয় নেই মা, আপনারা আসুন।"

প্রথম জোয়ানটা ততক্ষণ টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া যষ্টি উদ্যত করিতেই যুবক ব্যাঘ্রের মত ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার হাত হইতে উহা কাড়িয়া লইল। তার পর তাহার মুখমণ্ডলে উপর্য্যুপরি কয়েকটি প্রচণ্ড ঘুষি মারিতেই লোকটা নির্জ্জীবের মত মাটীতে পড়িয়া গেল।

বীরেশবাবু কম্পিত দেহে তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

যুবক বলিল, "আপনারা শীঘ্র এগিয়ে চলুন, আমি পেছনে আছি। আপনাদের কোন ভয় নেই।"

স্ত্রী ও কন্যার হাত ধরিয়া বীরেশবাবু বেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যুবকও মন্থর গতিতে চলিতে চলিতে এক একবার পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিতেছিল।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া বীরেশচন্দ্র টঙ্গা দেখিতে পাইলেন না। তিনি বিমূঢ়ভাবে ইতস্ততঃ দেখিতেছেন, এমন সময় যুবক বলিল, "আপনাদের সঙ্গে গাড়ী ছিল না?"

তখনও বীরেশ বাবুর হৃদ্স্পন্দন থামে নাই। তিনি স্খলিতকণ্ঠে বলিলেন, "লোকটা গাড়ী নিয়ে আস্‌বে বলেছিল; কিন্তু তাকে ত দেখ্‌ছি না।"

"আচ্ছা, আমার সঙ্গে মোটর আছে। চলুন আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসি।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে অগ্রসর হইল। অদূরে একটি বৃক্ষের ছায়ায় একখানি মোটর অপেক্ষা করিতেছিল। সে উহার দ্বার খুলিয়া বিনম্র কণ্ঠে বলিল, "আপনারা উঠুন।"

হৈমবতী ও গৌরী অগ্রে উঠিলে, বীরেশবাবু ভিতরে গিয়া বসিলেন।

যুবক ক্ষিপ্রহস্তে সম্মুখের আসনের দ্বার খুলিয়া বাম পকেট হইতে চাবি লইয়া যন্ত্রে পাক্ দিল। কল টিপিতেই আলো জ্বলিয়া উঠিল। ষ্টিয়ারীং চাকায় হাত রাখিয়া সে দক্ষিণ হস্ত পাঞ্জাবীর পকেটে রাখিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "যাঃ!"

বীরেশ বলিলেন, "কি হল?"

স্মিতকণ্ঠে যুবক বলিল, "ও কিছু না—বাঁশীটা ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় পড়ে গেছে দেখ্‌ছি।"

গৌরী পিতার মুখের দিকে চাহিল। বীরেশ বাবু বুঝিলেন যে, এই যুবকই তাজের সন্নিধানে বসিয়া বাঁশীতে উহার বন্দনা-গীতি ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছিল।

গাড়ীর মধ্য হইতে একটা মোটা বংশযষ্টি বাহির করিয়া যুবক বলিল, "আপনাদের একটু দেরী হবে—দু' মিনিট। আমি বাঁশীটা খুঁজে নিয়ে আসি। ওটা আমার বড় সখের জিনিষ।"

হৈমবতী লজ্জা ভুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "না, বাবা। তুমি আর যেও না।"

যুবক হাসিয়া বলিল, "কোন ভয় নেই, মা। ও রকম দু' পাঁচ জনকে আমি গ্রাহ্য করি না। এ গাছা হাতে থাক্‌লে অমন দশ জন লোক আমার কাছে এগুতে সাহস্ করবে না, মা। আমি এলাম বলে।"

বীরেশ বলিলেন, "আপনার সখের জিনিষ! কিন্তু না গেলেই ভাল হত।"

দ্রুতপদে চলিতে চলিতে যুবক বলিল, "কোন চিন্তা করবেন না।"

দুই মিনিটের মধ্যেই যুবক বাঁশী হস্তে ফিরিয়া আসিল। তার পর হাসিতে হাসিতে বলিল, "লোক দু'টোকে দেখ্‌লাম না। বোধ হয় ওদিকের পাঁচিল টপ্‌কে সরে পড়েছে। ভয় ত আছে। একটু আগেই পুলিস থানা।"

গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়া যুবক উঠিয়া বসিল। তার পর বলিল, "আপনাদের বাসার ঠিকানা?"

শুনিয়া লইয়া যুবক নক্ষত্র বেগে গাড়ী চালাইল।

গাড়ীর মধ্যে সকলেই নিস্তব্ধ। আজিকার এই অভিজ্ঞতা সামান্য নহে। সকলেই নীরবে বর্ত্তমানে অতিক্রান্ত ভীষণ বিপদের কথা স্মরণ করিয়া অন্তরে শিহরিয়া উঠিতেছিলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গাড়ী নির্দ্দিষ্ট হোটেলের সম্মুখে আসিয়া থামিল। যুবক এতক্ষণ একবারও ফিরিয়া কোন দিকে তাকায় নাই।

প্রভুর প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব দেখিয়া পুরাতন ভৃত্য হরিচরণ বাহিরে উৎকণ্ঠিত চিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। মোটর থামিতেই সে ছুটিয়া আসিল।

কন্যা ও স্ত্রীকে লইয়া বীরেশবাবু গাড়ী হইতে নামিলেন। ইজ্জত ও প্রাণ রক্ষকের নাম এতক্ষণ জিজ্ঞাসা করিবার মত মনের অবস্থাও তাঁহার ছিল না। যুবক তাঁহাকে নমস্কার জানাইয়া মোটর ঘুরাইয়া লইতেই বীরেশবাবু ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমাদের ইজ্জৎ, সম্ভ্রম-রক্ষাকারীর নামটা—"

বাধা দিয়া যুবক বলিল, "কোন প্রয়োজন নেই। মানুষের অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য করতে পেরেছি এই যথেষ্ট। নাম জানিয়ে কৃতজ্ঞতা আদায়ের পন্থাটা আমার ভাল লাগে না।"

যুবক চাকার হাত্‌ল ঘুরাইল।

বীরেশ বাবু উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "তবু আমাদের তরফ থেকে—"

যুবক গলা বাড়াইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "জীবনে আর হয় ত আমাদের কখনও দেখাই হবে না। কাল ভোরেই দিল্লির পথে চল্‌ব। শুধু আমার নমস্কার নিয়ে আমায় মুক্তি দিন।"

গাড়ী দ্রুত রাজপথে চলিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে পথের বাঁকে তাহা অদৃশ্য হইয়া গেল।

বীরেশ বাবু স্তব্ধ ভাবে তখনও পথের উপর দাঁড়াইয়া। হোটেলের ফটকের ধারে হৈমবতী ও গৌরী স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া ছিল।

বীরেশবাবু বলিলেন "আশ্চর্য্য ছেলে।"

হৈমবতী গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ করি বাছা আমার দীর্ঘজীবী হয়ে এম্‌নি করে দুর্ব্বলকে রক্ষা করতে থাকুক।"

বীরেশবাবু বলিলেন, "ধন্য শক্তি! ধন্য সাহস!"

গৌরী নতমুখে মাতার অনুসরণ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

(ক্রমশঃ)

পেশাওয়ার ও খাইবর পথ

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

মানুষের জীবন নাকি নদীর মত; সে উদ্দেশ্যহীন অথচ লক্ষ্যহীন নয়। নদীর মত জীবনও হয় ত আপনাকে সৃষ্টি করে' আপন পরিণতির দিকে আকৃষ্ট হয়ে ছোটে। নদীতে যেমন আবর্ত্ত, জীবনে তেমনি ঘটনা। এই ঘটনাই মানুষের বিস্ময়, মানুষের বেদনা, মানুষের সুখস্মৃতি। এই আবর্ত্তগুলিই জীবনের নাটক ও গল্প। মানুষের মন চিরদিন ঘুরে' এই নাটক ও গল্পগুলির চারিপাশে ভ্রমরের মত গুঞ্জরণ করতে থাকে।

নদীর প্রবাহটি যেমন আপন প্রাণের মধ্যে একটি বিশেষ আবর্ত্তকে বারম্বার স্মরণ করে' চলে, আমিও তেমনি ১৯২৮ সালের ১৭ই নভেম্বরের রাতটিকে ভুলতে পারিনে। সে একটি কৃষ্ণকায়া জনবিরল যন্ত্রণাদায়ক শীতরাত্রি,—ভয়ার্ত্ত ও আড়ষ্ট। রাওয়ালপিণ্ডি থেকে পেশাওয়ারের পথে শেষ প্যাসেঞ্জার ট্রেণে চলেছি,—গাড়ীর গতি মৃদু-মন্থর; তার কারণ ভোরের আগে কোনো ট্রেণের পেশাওয়ারে পৌঁছুবার হুকুম নেই,—অন্ধকারের আবরণে লুণ্ঠন ও হত্যার ভয়ে কর্ত্তৃপক্ষের এই ব্যবস্থা।

মধ্যরাত্রি। কিছুক্ষণ আগে তক্ষশীলা পার হয়ে গেছে। আমার সঙ্গী কেউ নেই,—তার মানে এমন নয় যে, আমি সাহসী,—সঙ্গীর অভাবেই আমি একা। ট্রেণের দুই পাশে ঘনবৃক্ষসঙ্কুল অরণ্য, কিম্বা সুবিস্তৃত প্রান্তর অথবা সীমাহীন সাগর, সে সব কিছুই বোঝবার উপায় নেই, অন্ধকারে সমস্তই নিশ্চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সে অন্ধকারের পারে আকাশ নেই, সৃষ্টি নেই,—তার ওপর নেমেছে হিম-কুহেলিকা! মনে হয় লক্ষ লক্ষ অন্ধ-দানবী আপন আপন পক্ষ বিস্তার করে' পৃথিবীর বুকের পরে বসে' নিশ্বাস রোধ করেছে।

গাড়ী থামে না, অথচ অতি ধীরে ধীরে এমন এক রাজ্যের দিকে চলে যা সম্পূর্ণ রহস্যময় ও ভয়সঙ্কুল, তবে সে অত্যন্ত যন্ত্রণাময়। সে কেবলই হাত্‌ড়ে চল্‌ছে আবরণের পর আবরণ সরিয়ে অন্ধকারের অন্দর-মহলে। বেগ নেই, বিচ্ছেদ নেই—শুধু অনির্দ্দিষ্ট গতি। এদিকে কঠিন ঠাণ্ডায় হাতের ঘড়ি ও নিশ্বাস দুই বন্ধ হয়ে গেছে। আমার এ ভ্রমণ সৌখীন নয়, বিষয়কর্ম্মোপলক্ষ্যে নয়, দুঃসাহসের বদ্‌খেয়ালে নয়—এ শুধু দুর্গম পথের আকর্ষণ! আমি ভীরু, তাই আমার এই দুঃসাহসিক পত্রযাত্রার পরীক্ষা; আমি অলস, তাই আমার এই অশ্রান্ত গতিবেগের আকর্ষণ। যাই হোক, গাড়ীতে একা নই, পাশাপাশি বেঞ্চিতে আপাদমস্তক আবৃত দুটি বিরাট্ দেহ,—তারা নর কি নারী জান্‌বার উপায় নেই। পরম্পরায় অবগত আছি, এ-পথে গাড়ীর মধ্যে মারামারি হ'লে, খুন-জখম হ'লে অথবা চুরি-ডাকাতি হ'লে কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ গ্রাহ্য করেন না। এ-দেশ নাকি আত্মরক্ষার দেশ, যথেচ্ছ আচার এবং অবাধ গতিবিধির স্বাধীন এলাকা। সিংহ-বিবরের মুখে শশকের মত ভীত দৃষ্টিতে তাকাতেই হঠাৎ চোখে পড়ল, গাড়ীর মধ্যে 'এলার্ম্ সিগ্‌নাল্' নেই। ভয়ার্ত্ত ভয়ে একবার আপন হৃদ্‌পিণ্ডকে অনুভব করলাম! দম আট্‌কাবে নাকি? গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে পড়বো? এই দুটি নিদ্রিত ব্যক্তি হঠাৎ উঠে যদি টুঁটি টিপে ধরে? অসহায় বাঙালীটির গলার ভিতর থেকে সে রাত্রে হঠাৎ কান্না উঠে আসতে লাগ্‌ল।

সমস্ত রাত এমনি করে' কাট্‌ল। পেশাওয়ার ষ্টেশনে যখন নামলাম তখনো চারিদিকে অন্ধকার। জানা গেল সকাল ছ'টা বাজে। শীতের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আর চিম্‌নীর ধোঁয়ার মত হিম,—এক জায়গায় স্থির হয়ে সত্যিই দাঁড়াবার উপায় নেই। কিন্তু হঠাৎ এই অজানা অপরিচিত জায়গায় যে এতগুলি বন্ধু জুট্‌বে তা আগে জানা ছিল না। গত রাত্রির ভয় তখনো সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে ছিল, গা-ঝাড়া দিয়ে ছড়ি ঘুরিয়ে একবার মাতব্বরের মত পায়চারি সুরু করলাম। দু' তিনটি হোমরা-চোমরা পাঠান্ এসে জিজ্ঞাসা করল, আমি চা খাবো কি না, পথে হয় ত কষ্ট পেয়েছি, কোথায় যেতে চাই, কোন্ ঠিকানায়, গাড়ীর

বন্দোবস্ত করে' দেবে কি না,—সমস্তটাই যেন তোষামোদের সুর। একজন বলেই ফেল্‌লো, আমার অলক্ষ্যে এবং অজ্ঞাতে তারা তিন চার জন সমস্ত পথ গাড়ীর আশপাশে আমাকে পাঁহারা দিতে দিতে এসেছে। এই কাঁচা গোয়েন্দাগুলির সানুগ্রহ প্রস্তাবাবলী সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে' চা খেতে বসলাম। শেষকালে তারা একখানি ছাপা পুলিশ অফিসের 'ফর্ম্' বা'র করল, তা'তে নাম ধাম ঠিকানা ইত্যাদি লিখে দিলাম। আমি যে রাওয়ালপিণ্ডির সৈন্যদলের লোক তাও জানাতে হ'ল। হেসে কবির কথায় তাদের বল্‌তে ইচ্ছে হ'ল—'অনুগ্রহ করে' এই ক'রো যেন অনুগ্রহ ক'রো না!'

সকাল হ'ল, রোদ উঠ্‌ল। ভয়ানক একটি দুঃস্বপ্নের পর রাজকন্যা যেমন ঘুম থেকে জেগে উঠে সুমুখেই দেখে রাজপুত্র, তেমনি করে' পেলাম সেদিনের সেই সকালটিকে। সুকঠিন দুশ্চর তপস্যা শেষে যেন বরলাভ হ'ল। অন্ধকারের পর এমন দিনের আলো—যেন এক ভীষণা রাক্ষসীর গর্ভ হতে একটি সুন্দর দেবশিশুর জন্ম হ'য়েছে; আকাশে আকাশে তার প্রভাতী উৎসব, নবসূর্য্যের রক্তরশ্মিতে তার জন্য আশীর্ব্বাদ। আনন্দে চারিদিকে একবার হেসে চাইলাম, নূতন করে' পৃথিবীর সঙ্গে শুভদৃষ্টি ঘট্‌ল।

ছোট ষ্টেশন্, যতদূর মনে হয় একটি প্লাট্‌ফরম্। এটি ছাউনী-ষ্টেশন, পেশাওয়ার সিটি-ষ্টেশনে নাম্‌লে নাকি কোনো অপ্রত্যাশিত বিপদের সম্ভাবনা থাকে। গোরা-ছাউনীতে নামাই ভালো। ষ্টেশন পার হয়ে এসে দেখা যায় শহরটিও ছোট—গুটিকয়েক দোকান, একটি বাজার, কয়েকখানি টাঙা, দু'-একটি অফিস। মানুষের বসতি আছে কিন্তু সমাজ নেই; দেনা পাওনা আছে কিন্তু শৃঙ্খলা নেই। প্রথমেই মনে হবে সমস্ত শহরটি যেন আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। একটি ভয়ের ছায়া—সন্ত্রস্ত, উদ্‌ভ্রান্ত। মানুষ এখানে বসে' অহরহ যেন হিংস্র নখর শান্ দিচ্ছে। পথে নেমে একখানি টাঙা ভাড়া করে' বাবুমহল্লার দিকে চললাম। বাবুমহল্লায় জনকয়েক বাঙালী থাকেন।

দিকে দিকে সৈন্যদের কুচ্‌কাওয়াজ সুরু হয়েছে, পথের পাশে পাশে পাহারা দিচ্ছে ঘোড়সওয়ার, উট চল্‌ছে মাল-বোঝাই নিয়ে, কোথাও কোথাও বা কাফি-খানায় পাঠানরা বসে' জটলা করছে। ভাঙা-ফুটো কতকগুলি বিচিত্র বাড়ীঘর, জীবন-যাত্রা ও গৃহস্থালী অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন, স্ত্রী-পুরুষদের অঙ্গসজ্জা অতিরিক্ত অপরিষ্কার। মনে হয় তাদের দেশ আর্য্যভূমি ভারতের সীমান্তে না হয়ে আরব কি আফ্রিকায় হ'লে ভাল হ'ত। দু'ধারে দেখতে দেখতে চলেছি। এ-দেশের সবাই যেন অস্থায়ী বাসিন্দা, সবটাই যেন ধর্ম্মশালা, যে-কোনো মুহূর্ত্তে সকলেই যেন স্থানত্যাগ করে' যেতে পারে—মাটির সঙ্গে যেন কা'রো যোগাযোগ নেই, আত্মীয়তা নেই। কোনো একটি প্রচণ্ড ঘূর্ণী ঝড়ের ফুৎকারে অদৃশ্য হয়ে যাবার জন্য আবালবৃদ্ধবনিতা প্রতীক্ষা করে' রয়েছে।

বাবুমহল্লা পাওয়া গেল। গাড়ী থেকে নেমে সন্ধান করতে করতে দেখা গেল একখানি জীর্ণ একতালা বাড়ীর ন্যাড়া ছাদে একখানি লালপেড়ে শাড়ী ঝুল্‌ছে। শাড়ীটি যেন দূর বাঙলা দেশের শ্যামশোভা ও কমনীয় মমতার সংবাদ বহন করে' এনেছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজায় উঠে কড়া নাড়লাম। একটু পরেই দরজা খুলে একটি ভদ্রলোক দেখা দিলেন। এই অপ্রত্যাশিত বাঙালীটিকে বহুদিন পরে দেখে হঠাৎ অত্যুগ্র আনন্দে মুখ দিয়ে কথা সরল না, শুধু হেসে নমস্কার করলাম। ভদ্রলোক নমস্কার নিলেন বটে, কিন্তু একবার চকিত চোখে আমার আপাদ-মস্তক তাকিয়ে বললেন, আপ্ কাঁহাসে আতে হেঁ?

বললাম, কি বলছেন, আমি যে বাঙালী!

অ্যাঁ? বাঙালী? আমি মনে করেছি বুঝি—আসুন, আসুন, কি আশ্চয্যি, আপনাকে চেনবারই উপায় নেই ঠিক পাঞ্জাবীর মতন—

মাথার পাগ্‌ড়িটা খুলে রাখলাম। ভদ্রলোক চমৎকার আলাপ সুরু করলেন, যেন বহুদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। খাইবার পাস্ যাবো শুনে তিনি খুসী হলেন। তিনি চাকরী করেন সি-এম্-এস্-এ। তাঁর বড় ভাই পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর 'পিণ্ডিতেই তাঁর বাস। দেশ ছেড়ে পেটের দায়ে প্রবাসে পড়ে' থাকা অত্যন্ত ঝক্‌মারি—ইত্যাদি। কিছুক্ষণ পরে ভিতর থেকে চা প্রভৃতি এসে হাজির হ'ল।

আমার পায়জামার নীচে ধুতি পরণে ছিল, পায়জামাটি ছেড়ে এতক্ষণে 'বাঙালী' হলাম। ননীগোপাল বাবু জানালেন, এখনই যাত্রা করলে সন্ধ্যার সময়ে ফেরা যাবে, নৈলে সেখানে রাত্রিবাস করার জায়গাও নেই, নিরাপদও নয়। সুতরাং চা খেয়েই উঠতে হ'ল। তিনি মোটরে উঠিয়ে দেবার জন্য সঙ্গে চললেন, বেশ জমিয়ে আলাপ করবার আর অবসর পাওয়া গেল না। আমার কম্বল ও পায়জামা তাঁর বাসাতেই রইল, ফেরবার মুখে তাঁর এখানে সান্ধ্যভোজ সেরে নিয়ে যাবো। এই গেল পেশাওয়ার পর্ব্ব।

দু'টাকা ভাড়ায় মোটর বাস-এ উঠলাম। ছোট গাড়ী, মালপত্র সমেত আন্দাজ জনদশেক যাত্রী। দু'জন দেশী গোরা, দুটি পাঠান স্ত্রীলোক, জন চারেক পাঠান ও একটি শীর্ণকায় চঞ্চল মাদ্রাজী যুবক। যুবকটি এসেছে নাকি 'সাইমন্ কমিশনের' সঙ্গে। আজ সাইমন্ সাহেব আসছেন খাইবর গিরিবর্ত্ম ভ্রমণে।

বেলা সাড়ে আটটা আন্দাজ গাড়ী ছাড়ল। পেশাওয়ার সহর পার হয়ে পড়ল বিখ্যাত খাজুরীর মাঠ। অসীম অনুর্ব্বর মরুভূমি। লম্বায় চওড়ায় নাকি প্রায় তিরিশ মাইল। এ মাঠের সীমান্ত একটি সঙ্কীর্ণ পথ ছাড়া আর কিছুই ভারত সরকারের অধীনে নয়। এই বিশাল প্রান্তরের দূর কিনারায় পর্ব্বতের সারি। সকালের সূর্য্যের আলোয় এতদূর থেকেও গলিত বিচিত্র বর্ণের সমারোহ দেখা যাচ্ছিল। আকাশ এবার পরিষ্কার হয়েছে। নীল আকাশের দিকে পর্ব্বতের তুষারকিরীটের আরক্ত শোভা একটি জাগ্রত কবিতার মত চেয়ে রয়েছে। প্রকৃতির নয়নাভিরাম রূপের প্রতি আমাদের দেহের সমস্ত তন্ত্রীগুলি একসঙ্গে পরম তৃপ্তিতে সাড়া দিয়ে ওঠে—প্রাকৃতিক শোভা উপভোগের গোড়ার কথাই এই।

গাড়ী ছুটছে। পাশেই একটি ক্ষুদ্র রেলপথ পেশাওয়ার থেকে এসে খাইবর গিরিপথের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। পথের আশে পাশে বন্দুকধারী আফ্রীদীদের দেখা গেল। এই মাঠে তারা অবাধে বিচরণ করে বেড়ায়। এ তাদেরই রাজ্য। আফ্রীদীরা দরিদ্র, অশিক্ষিত ও সভ্যতালেশহীন। আশপাশের দুর্গম পর্ব্বতমালার কোটরে তাদের আবাস, সেখানে তাদের অন্নের সংস্থান নেই, অর্থ নেই, সমাজবিধি নেই। তারা নিষ্ঠুর কিন্তু অসাধু নয়। তারা হাসিমুখে লুণ্ঠন করে—লুণ্ঠন করে শুধু উদরান্ন সংগ্রহের জন্য—এবং অবলীলাক্রমে হত্যা করে ও হত হয়। নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি হ'লে অনায়াসে তারা গুলী ছোড়াছুড়ি করে। পথে-ঘাটে দিনমজুরী ক'রে তারা যা উপার্জ্জন করে তাই দিয়ে তারা কেনে গম ফল বাদাম ও বন্দুক। ভারত সরকার সম্ভবতঃ আপন অর্থব্যয়ে তাদের পঠন-পাঠন এবং সভ্যতা বিস্তারের জন্য ও তাদের শান্ত রাখার অভিপ্রায়ে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দিয়েছেন। সেটি খাজুরী মাঠের ওপরেই সুবিখ্যাত ইস্‌লামিয়া কলেজ।

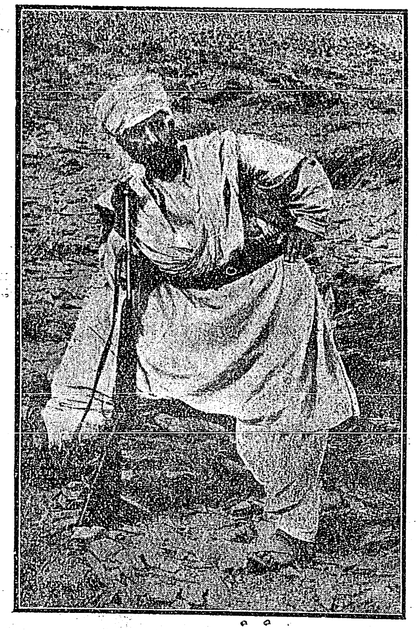

স্বাধীন আফ্রীদী

ইংরেজি, উর্দ্দু, ফারসী, আরবী প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে। সশস্ত্র সৈন্য প্রহরী জামরুদ দুর্গের তত্ত্বাবধানে এই কলেজটির মধ্যে রীতি নীতি ও শাসন বজায় রাখে!

তার পর জামরুদ। পেশাওয়ার থেকে খাইবর-পথের মাঝখানে জামরুদই একটিমাত্র দুর্গ। কেল্লাটি ছোট, ওদেশের পাথর-মিশানো শক্ত মাটীর তৈরী। দুর্গম প্রান্তরের মধ্যে এক শীর্ণ জটাজুটধারী এবং জীর্ণ বল্কল-পরা

গম্বুজের চূড়ায় দিবারাত্র প্রহরী নিযুক্ত থাকে, তারাই বহিঃশত্রুকে পাহারা দেয়। গ্রামগুলি ও প্রাচীর সমস্তই পাথর-মিশানো মাটীর তৈরী। সাধারণ ভাষায় তাদের 'মাটীর কেল্লা' বলা যেতে পারে। যেতে যেতে পথের মাঝখানে এক শ্রেণীবদ্ধ উটের দল পার হলাম। চারিদিক নিস্তব্ধ, নিস্পন্দ,—ঘূর্ণী বাতাস মাঝে মাঝে পাহাড়ের ফাঁকে

আফ্রীদী গ্রাম—মাটীর কেল্লা

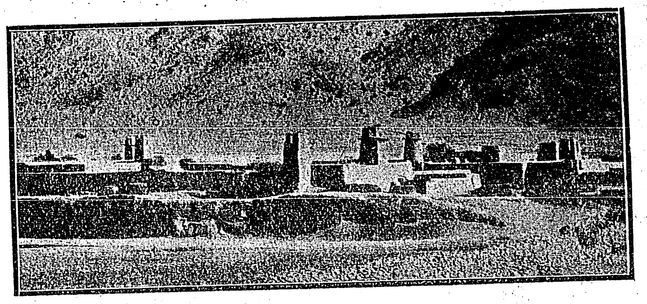

ফাঁকে বয়ে' চলেছে। উটের গলার ঘণ্টার টুং টুং শব্দ চারিদিকের নির্জ্জনতাকে গভীর ও উদাস করে' তুল্‌ছে। সুমধুর ও সুনিবিড় জনবিরলতা। উটের পিঠে ঘেরা-টোপের মধ্যে কাবুলি মেয়েরা ঘোমটা তুলে' পথের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চলেছে। সুন্দর আরক্ত মুখ, সুর্ম্মাটানা

শাগাই তাঁবু—খাইবর-পথ

বড় বড় কালো চোখ, দীর্ঘলম্বিত ঘনকৃষ্ণ বেণী, সুদৃঢ় সুস্পষ্ট অথচ সুকোমল দেহলাবণ্য, ডালিম ফুলের মত সুরক্তিম ওষ্ঠাধর, মুক্তাদলের মত দাঁত। রাঙ্গা দুখানি পায়ে জরির কাজ করা 'চপ্‌লি',—গায়ে পাত্‌লা পাঞ্জাবী। অনেকের গায়ে একখানি কালো আলোয়ান। কোনো অপরিচিত পুরুষের কাছাকাছি এলে সেই আলোয়ানখানি দিয়ে চোখ দুটি বাদে সমস্ত মুখখানিকে তারা আচ্ছাদন করে। এতে নাকি তারা আপন বয়সকে গোপন করতে সক্ষম হয়।

পেশাওয়ার ও লাণ্ডিকোটালের মাঝখানে 'শাগাই' হচ্ছে সব চেয়ে বড় দুর্গ। অনেকটা আগ্রা ফোর্টের মত লাল; সমস্তই পাথরের তৈরী। তোরণ-দ্বারে সশস্ত্র প্রহরী প্রহরায় নিযুক্ত। অন্ততঃ পাঁচ হাজার সৈন্য এখানে অনায়াসে বসবাস করতে পারে। শাগাইয়ের কাছে এসে রাস্তাটা অনেকখানি চওড়া ও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। অনেক দূরে গিয়ে দুটি পথই আবার একত্রে মেশে। দুর্গের গায়ে ইংরেজি হরপে লেখা—'শাগাই'।

শাগাই পার হয়ে পথ ক্রমশঃ ঢালু হয়ে গেছে। এ পথটি নতুন। পুরাতন যুগের পথটি নতুন পথের পাশেই—সে-পথ এখন অগম্য। রেলপথের পাশে টেলিগ্রাফের তারের মত সেই পথে লোহার খুঁটির মাথার ওপর দিয়ে 'রজ্জুপথ' চলে গেছে। এই দড়ির কৌশলে বহুদূর থেকে মালপত্র এবং সংবাদাদি সরবরাহ করা যেতে পারে। এর নির্ম্মাণ-কৌশল অতি বিচিত্র। পথে যেতে যেতে ডান্‌দিকে মাঝে মাঝে খাইবর রেলপথ নজরে পড়ে। অসংখ্য সুড়ঙ্গ-পথের ভিতর দিয়ে যেভাবে ট্রেণ আনাগোনা করে তা দেখে বাস্তবিকই বিস্মিত হতে হয়। মানুষের বুদ্ধি ও শক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে জলে, আকাশে ও পর্ব্বতে। খাইবর রেলপথ পৃথিবীর অষ্টম বিস্ময় তা'তে আর আমার সন্দেহ নেই। এই দুর্গম দেশান্তরে গ্রীষ্ম ও

শীত ছাড়া আর কোনো ঋতু আসে না। বর্ষার বৃষ্টি এখানে দাঁড়াবার জায়গা না পেয়ে করুণ চক্ষে ফিরে যায়। যেটুকু জল পড়ে তা'তে পথ হয় পিছল ও বিপজ্জনক। গাড়ী চলাচল বন্ধ হয়। শীত এদিকে প্রচণ্ড ও ভয়াবহ।

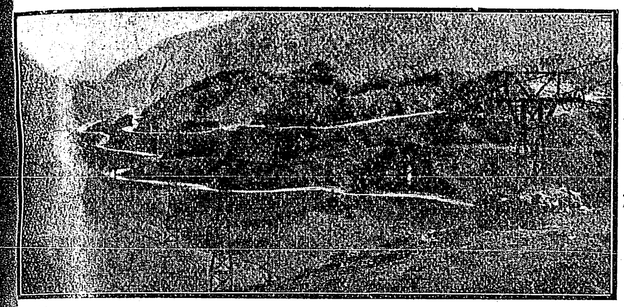

খাইবর রজ্জুপথ

সমস্ত পথটাই যে একটি সন্ত্রস্ত আতঙ্কের মধ্যে কাটাতে হয়েছিল সে কথা আজো ভুলিনি। দুই চোখের নিষ্পলক দৃষ্টি চারিদিকে সজাগ করে স্থাণুর মত বসে ছিলাম, হাতের ছড়িটা দৃঢ় মুষ্টিতে বাগিয়ে ধরেছি। প্রাণঘাতক শত্রু-পরিবেষ্টিত পথ মানুষ কিরূপ মানসিক অবস্থার মধ্যে পার হয়? মনে হচ্ছিল অলক্ষ্যে এই কাছাকাছি কোথাও ভয়ানক একটা রণসজ্জা চল্‌ছে। চারিদিক থেকে একটা মহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠতে আর দেরী নেই। কামান উঠ্‌ল গর্জ্জন করে', রেলপথ হল বন্ধ, আকাশে উঠ্‌ল উড়ো জাহাজ, তার পর বোমা, গুলী, কামান,—তার পর হত্যা ও মৃত্যু! অথচ এ কথাও জানি, এই সরল পার্ব্বত্যজাতি অসভ্য, কিন্তু আমাদের শত্রু নয়; অন্নের অভাব তাদের হৃদয়হীন করেছে, কিন্তু তারা মনুষ্যত্বহীন নয়; তারা বর্ব্বর, মনুষ্য সমাজের অযোগ্য, শিক্ষাহীনতায় পঙ্গু—কিন্তু পরাধীনতার দুঃসহ আত্মগ্লানি তাদের নেই, তারা স্বাধীন জাতি। তারা যুদ্ধে মরে, আহত হয়, উপবাস করে; তবু তারা কোহাট ও কান্দাহারের দরজায় দাঁড়িয়ে বন্দুক কিনে এনে আপন অবাধ স্বাধীনতাকে রক্ষা করে। উপবাসখিন্ন কণ্ঠে তা'রা গজলের সুর ভেঁজে বেড়ায়। লাণ্ডি-কোটালের তাঁবু পর্য্যন্ত আসতে আসতে শুধু এই কথাই আমার বার বার মনে হচ্ছিল।

বেলা এগারোটা আন্দাজ লাণ্ডিকোটালে এসে গাড়ী থামল। আর গাড়ী যাবে না। লাণ্ডিকোটালকে একটি অতি ক্ষুদ্র অস্থায়ী শহর বলা যেতে পারে। পথের দুই ধারে চারিদিকে অসংখ্য ছোট ছোট সৈন্যাবাস। পথের ওপরে দাঁড়ালে নীচে একখানি সুন্দর ছবির মত শহরটি দেখা যায়। এখানে এক দিকে কেবল পাহাড়শ্রেণী, আর তিন দিকে প্রান্তর। সেই বিশাল প্রান্তর ভারত সরকারের এলাকাভুক্ত নয়। এদিকে একটি গাছও নেই, একটি দুর্ব্বাঘাসও নেই। রুক্ষ ও অকরুণ। পাহাড়গুলি কয়লার

লাণ্ডিকোটাল—খাইবর পথ

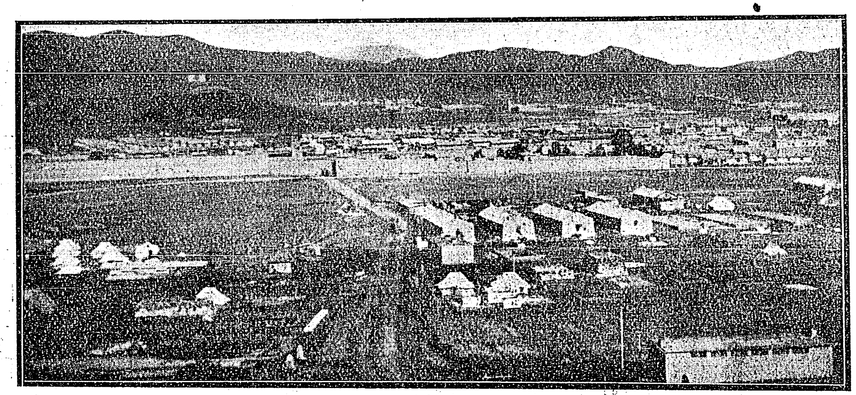

ঘেঁষের মত কালো ও বিবর্ণ। কেবলই মনে হয় এর চেয়ে মরুভূমিও মানুষের গতির সহায়তা করে। নারী ও শিশুকে এদিকে আনা আইনবিরুদ্ধ। প্রথমে নেমেই শুনলাম দিন চারেক আগে এখানে কোথায় অফিস-ঘরের ভিতর থেকে একটি পাঞ্জাবী যুবক চুরি হয়ে গেছে, যুবকের

সন্ন্যাসী চোখ বুজে যেন ধ্যানে বসে রয়েছে। গাড়ী থাম্‌ল, পথের ওপর নেমে একটুখানি পায়চারি করে' নিলাম। আপেল্ নাশপাতি ও বাদাম এক জায়গায় অতি সস্তা দরে

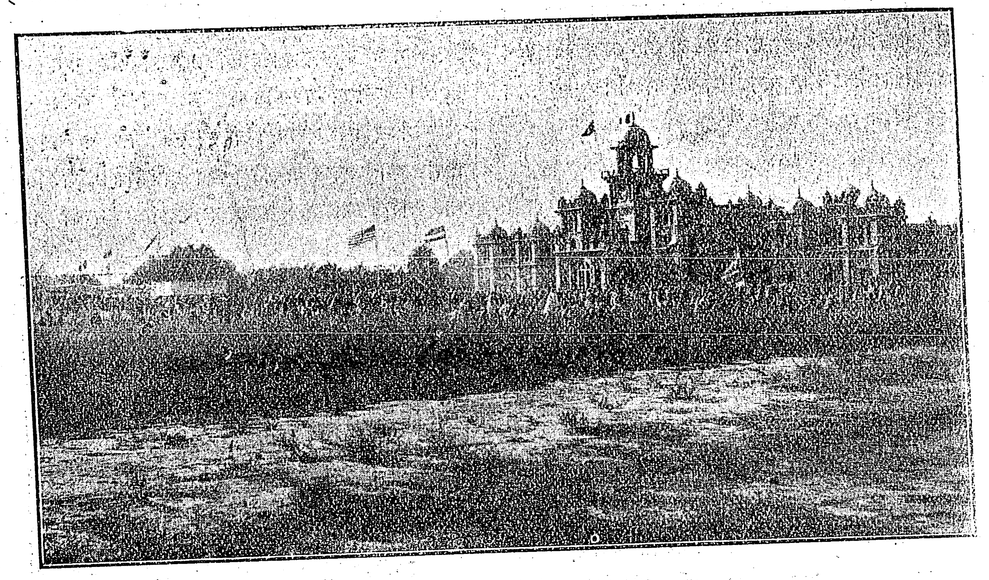

ইস্‌লামিয়া কলেজ—জামরুদের পথে

বিক্রি হচ্ছে। সবাই আমরা যেন আফ্রীদীর ভয়ে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত; বেশ অনুভব করছিলাম পথের যাত্রীরা প্রতি মুহূর্ত্তেই লুণ্ঠন ও প্রহারের আশঙ্কা করে' থাকে। পথের প্রান্তে মাঠের ওপর দিয়ে মাঝে মাঝে দু'চারজন আফ্রীদী নিতান্ত অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বৃটিশ-প্রজা আমাদের দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে চলেছে। তাদের ভঙ্গী দেখেই মনে হয় তারা স্বাধীন। পেশাওয়ার থেকে লাণ্ডিখানা পর্য্যন্ত খাইবর গিরিপথের ভিতর দিয়ে সম্প্রতি যে বিচিত্র রেলপথ নির্ম্মিত হয়েছে, সেই রেলপথে আফ্রীদীরা অবাধে ভ্রমণ করে' বেড়ায়। ট্রেণের টিকিট করার বদ্ অভ্যাস তাদের নেই, টিকিট কেউ তাদের কাছে জোরের সঙ্গে চাইতেও সাহস করে না। প্রতিক্ষণে তাদের হাতে টোটাভরা বন্দুক দেখে কোন্ দুঃসাহসী টিকিট-চেকার তাদের কাছে এগুবে?

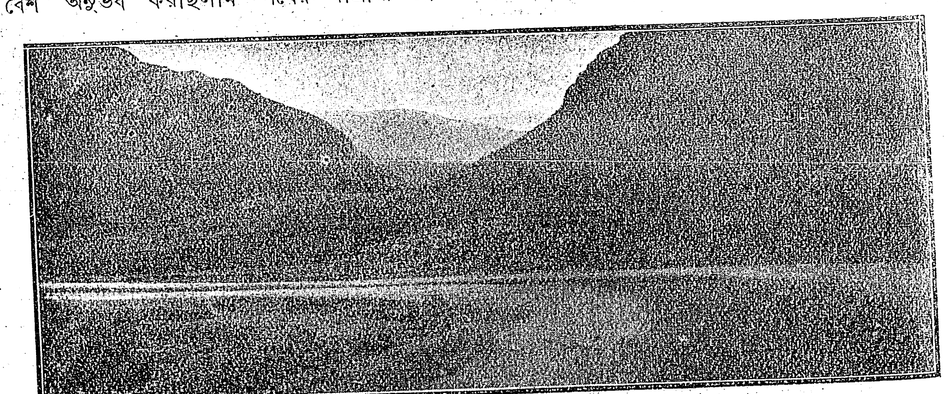

খাইবর গিরিপথের প্রবেশ-দ্বার

ভারত সরকার এদের অত্যন্ত ভয় করে' চলেন—এ আমি নিজের চোখে দেখেছি। গাড়ী আবার ছাড়ল। জামরুদ পার হয়ে কিছুদূর গিয়ে আমরা বাঁ-দিকে বাঁক নিলাম।

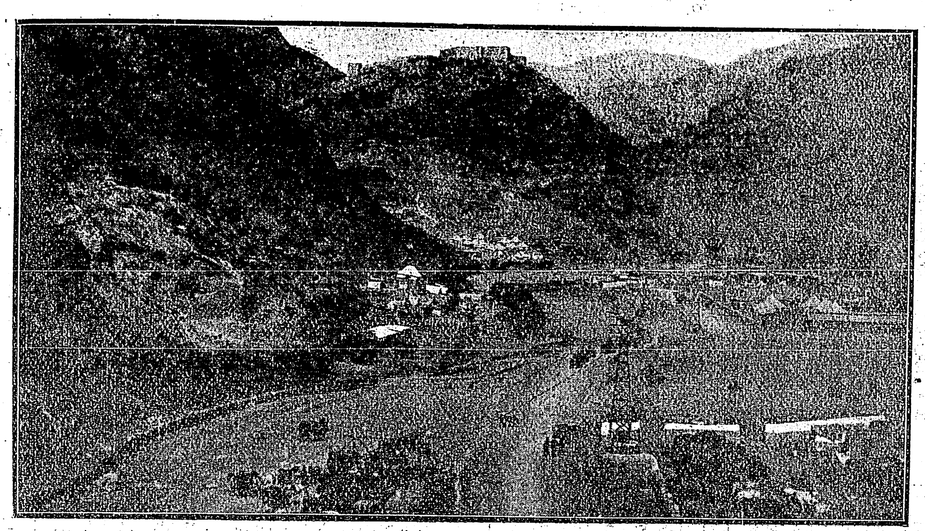

আলী-মস্‌জিদ—খাইবর পথ

এই পথ বরাবর গিরিগর্ভের মধ্যে চলে গেছে। ইতিহাস বলে, ভারতের বিপুল ধনভাণ্ডার যুগে যুগে এই সঙ্কীর্ণ পথরেখা ধরে নিষ্কান্ত হয়েছে। আমাদের গাড়ী ধীরে ধীরে পাহাড়ের মধ্যে প্রবেশ করতে লাগল।

কোটি কোটি টাকা খরচ করেও মানুষ যে কাজ করতে সক্ষম হ'ত না, প্রকৃতি সে-কাজ অতি সহজেই সম্পন্ন করে' রেখেছে। দুস্তর এবং দুরতিক্রম্য পর্ব্বত-মালার জটিলতার মধ্যে যে-যাত্রীর দল এই সঙ্কীর্ণ সহজ পথটি প্রথম আবিষ্কার করেছিল, যুগে যুগে তারা শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য। দুই পাশের পাহাড়গুলির দিকে তাকালে চোখ জ্বালা করে' আসে,—শস্য ও বৃক্ষলেশহীন, গুল্মলতাশূন্য রুক্ষ, অগম্য ও দুরারোহ। কোথাও তার স্নেহ নেই, ছায়া নেই, সৌন্দর্য্যরূপ নেই। আপন দৈন্য ও রিক্ততা নিয়ে আকাশকে সে প্রতিনিয়ত বিদ্রূপ করছে; প্রকৃতির মায়া-মমতাকে সে যেন নিঃশেষে লেহন করে' নিয়েছে। পাহাড়-গুলির কোলে অসংখ্য ছিদ্রপথ, এই ছিদ্রপথগুলিতে নাকি আফ্রীদীরা পাহাড়ের গোপন স্থানসমূহে যাতায়াত করে। শত্রুর আক্রমণকে এড়াবার নাকি এমন সুবিধা আর নেই।

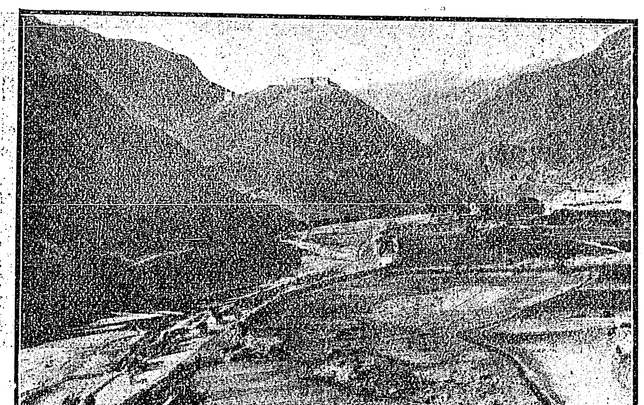

উটের পিঠে চড়ে' যাত্রী ও ব্যবসায়ী খাইবর-পথ অতিক্রম করছে

যে পথে আমরা চলেছি তার দুই পাশে হয় পাহাড়, নয় ত একধারে অনুর্ব্বর খানিকটা মাঠ—মাঠের পারে আবার পাহাড়। এই মাঠ এবং পাহাড় সম্পূর্ণ আফ্রীদীগণের অধীনে। মাঠের মাঝে মাঝে তাদের গ্রাম। গ্রামগুলি প্রাচীর-বেষ্টিত। মাঝখানে একটি করে' গম্বুজ। এই

গম্বুজের চূড়ায় দিবারাত্র প্রহরী নিযুক্ত থাকে, তারাই বহিঃশত্রুকে পাহারা দেয়। গ্রামগুলি ও প্রাচীর সমস্তই পাথর-মিশানো মাটীর তৈরী। সাধারণ ভাষায় তাদের 'মাটীর কেল্লা' বলা যেতে পারে। যেতে যেতে পথের মাঝখানে এক শ্রেণীবদ্ধ উটের দল পার হলাম। চারিদিক নিস্তব্ধ, নিস্পন্দ,—ঘূর্ণী বাতাস মাঝে মাঝে পাহাড়ের ফাঁকে

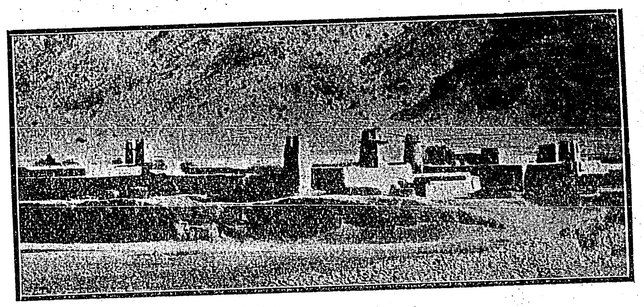

আফ্রীদী গ্রাম—মাটীর কেল্লা

ফাঁকে বয়ে' চলেছে। উটের গলার ঘণ্টার টুং টুং শব্দ চারিদিকের নির্জ্জনতাকে গভীর ও উদাস করে' তুলছে। সুমধুর ও সুনিবিড় জনবিরলতা। উটের পিঠে ঘেরা-টোপের মধ্যে কাবুলি মেয়েরা ঘোমটা তুলে' পথের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চলেছে। সুন্দর আরক্ত মুখ, সুর্ম্মাটানা

শাগাই তাঁবু—খাইবর-পথ

বড় বড় কালো চোখ, দীর্ঘলম্বিত ঘনকৃষ্ণ বেণী, সুদৃঢ় সুস্পষ্ট অথচ সুকোমল দেহলাবণ্য, ডালিম ফুলের মত সুরক্তিম ওষ্ঠাধর, মুক্তাদলের মত দাঁত। রাঙ্গা দুখানি পায়ে জরির কাজ করা 'চপ্‌লি',—গায়ে পাতলা পাঞ্জাবী। অনেকের গায়ে একখানি কালো আলোয়ান। কোনো অপরিচিত পুরুষের কাছাকাছি এলে সেই আলোয়ানখানি দিয়ে চোখ দুটি বাদে সমস্ত মুখখানিকে তারা আচ্ছাদন করে। এতে নাকি তারা আপন বয়সকে গোপন করতে সক্ষম হয়।

পেশাওয়ার ও লাণ্ডিকোটালের মাঝখানে 'শাগাই' হচ্ছে সব চেয়ে বড় দুর্গ। অনেকটা আগ্রা ফোর্টের মত লাল; সমস্তই পাথরের তৈরী। তোরণ-দ্বারে সশস্ত্র প্রহরী প্রহরায় নিযুক্ত। অন্ততঃ পাঁচ হাজার সৈন্য এখানে অনায়াসে বসবাস করতে পারে। শাগাইয়ের কাছে এসে রাস্তাটা অনেকখানি চওড়া ও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। অনেক দূরে গিয়ে দুটি পথই আবার একত্রে মেশে। দুর্গের গায়ে ইংরেজি হরপে লেখা—'শাগাই'।

শাগাই পার হয়ে পথ ক্রমশঃ ঢালু হয়ে গেছে। এ পথটি নতুন। পুরাতন যুগের পথটি নতুন পথের পাশেই—সে-পথ এখন অগম্য। রেলপথের পাশে টেলিগ্রাফের তারের মত সেই পথে লোহার খুঁটির মাথার ওপর দিয়ে 'রজ্জুপথ' চলে গেছে। এই রজ্জুপথের কৌশলে বহুদূর থেকে মালপত্র এবং সংবাদাদি সরবরাহ করা যেতে পারে। এর নির্ম্মাণ-কৌশল অতি বিচিত্র। পথ যেতে যেতে ডান্‌দিকে মাঝে মাঝে খাইবর রেলপথ নজরে পড়ে। অসংখ্য সুড়ঙ্গ-পথের ভিতর দিয়ে যেভাবে ট্রেণ আনাগোনা করে তা দেখে বাস্তবিকই বিস্মিত হতে হয়। মানুষের বুদ্ধি ও শক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে জলে, আকাশে ও পর্ব্বতে। খাইবর রেলপথ পৃথিবীর অষ্টম বিস্ময় তা'তে আর আমার সন্দেহ নেই। এই দুর্গম দেশান্তরে গ্রীষ্ম ও

শীত ছাড়া আর কোনো ঋতু আসে না। বর্ষার বৃষ্টি যেখানে দাঁড়াবার জায়গা না পেয়ে করুণ চক্ষে ফিরে যায়। যেটুকু জল পড়ে তা'তে পথ হয় পিছল ও বিপজ্জনক। গাড়ী চলাচল বন্ধ হয়। শীত এদিকে প্রচণ্ড ও ভয়াবহ।

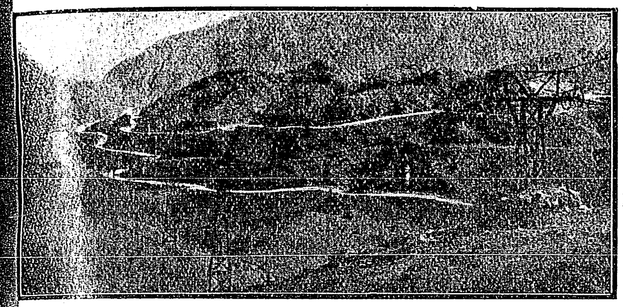

খাইবর রজ্জুপথ

সমস্ত পথটাই যে একটি সন্ত্রস্ত আতঙ্কের মধ্যে কাটাতে হয়েছিল সে কথা আজো ভুলিনি। দুই চোখের নিষ্পলক দৃষ্টি চারিদিকে সজাগ করে স্থাণুর মত বসে ছিলাম, হাতের বন্দুকটা দৃঢ় মুষ্টিতে বাগিয়ে ধরেছি। প্রাণঘাতক শত্রু-পরিবেষ্টিত পথ মানুষ কিরূপ মানসিক অবস্থার মধ্যে পার হয়? মনে হচ্ছিল অলক্ষ্যে এই কাছাকাছি কোথাও ভয়ানক একটা রণসজ্জা চলছে। চারিদিক থেকে একটা মহা-যুদ্ধের দামামা বেজে উঠতে আর দেরী নেই। কামান উঠ্‌ল গর্জ্জন করে', রেলপথ হল বন্ধ, আকাশে উঠ্‌ল উড়ো জাহাজ, তার পর বোমা, গুলী, কামান,—তার পর হত্যা ও মৃত্যু! অথচ এ কথাও জানি, এই সরল পার্ব্বত্যজাতি অসভ্য, কিন্তু আমাদের শত্রু নয়; অন্নের অভাব তাদের হৃদয়হীন করেছে, কিন্তু তারা মনুষ্যত্বহীন নয়; তারা বর্ব্বর, মনুষ্য সমাজের অযোগ্য, শিক্ষাহীনতায় পঙ্গু—কিন্তু পরাধীনতার দুঃসহ আত্মগ্লানি তাদের নেই, তারা স্বাধীন জাতি। তারা যুদ্ধে মরে, আহত হয়, উপবাস করে; তবু তারা কোহাট ও কান্দাহারের দরজায় দাঁড়িয়ে বন্দুক কিনে এনে আপন অবাধ স্বাধীনতাকে রক্ষা করে। উপবাসখিন্ন কণ্ঠে তা'রা গজলের সুর ভেঁজে বেড়ায়। লাণ্ডি-কোটালের তাঁবু পর্য্যন্ত আসতে আসতে শুধু এই কথাই আমার বার বার মনে হচ্ছিল।

বেলা এগারোটা আন্দাজ লাণ্ডিকোটালে এসে গাড়ী থামল। আর গাড়ী যাবে না। লাণ্ডিকোটালকে একটি অতি ক্ষুদ্র অস্থায়ী শহর বলা যেতে পারে। পথের দুই ধারে চারি-দিকে অসংখ্য ছোট ছোট সৈন্যাবাস। পথের ওপরে দাঁড়ালে নীচে একখানি সুন্দর ছবির মত শহরটি দেখা যায়। এখানে এক দিকে কেবল পাহাড়শ্রেণী, আর তিন দিকে প্রান্তর। সেই বিশাল প্রান্তর ভারত সর-কারের এলাকাভুক্ত নয়। এদিকে একটি গাছও নেই, একটি দূর্ব্বাঘাসও নেই। রুক্ষ ও অকরুণ। পাহাড়গুলি কয়লার

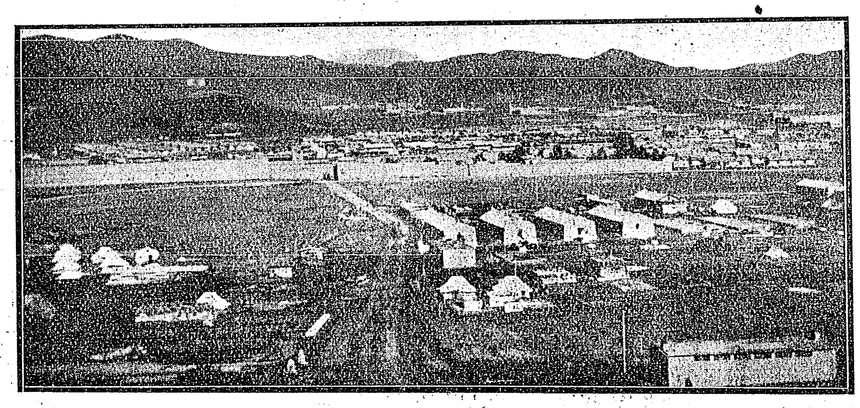

লাণ্ডিকোটাল—খাইবর পথ

ঘেঁষের মত কালো ও বিবর্ণ। কেবলই মনে হয় এর চেয়ে মরুভূমিও মানুষের গতির সহায়তা করে। নারী ও শিশুকে এদিকে আনা আইনবিরুদ্ধ। প্রথমে নেমেই শুনলাম দিন চারেক আগে এখানে কোথায় অফিস-ঘরের ভিতর থেকে একটি পাঞ্জাবী যুবক চুরি হয়ে গেছে; যুবকের

আর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। এ কাজ নাকি আফ্রীদীর। ভয়ে ভয়ে তারের বেড়া পার হয়ে শহরের মধ্যে প্রবেশ করলাম।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটি বাঙালীর সন্ধান মিল্‌ল। এতদূরে 'দেশোয়ালীকে' পেয়ে পরম তৃপ্তি অনুভব করলাম। কাঙাল যেন পথের ধারে মাণিক কুড়িয়ে পেয়েছে! মুহূর্ত্তেই গভীর পরিচয় হল। তিনি এখানে সুড়ঙ্গপথ নির্ম্মাণের কাজে এসেছেন। মিঃ ঘোষ বলে' তাঁর এদিকে পরিচয়। আর একটি লোকের সঙ্গেও আলাপ হল, তাঁর নাম মিশিরজি। তাঁর বাড়ী আগ্রা জেলায় সুতরাং বাঙলার প্রতিবেশী বলা চলে। তিনি পরমানন্দে যুদ্ধের গল্প সুরু করলেন।

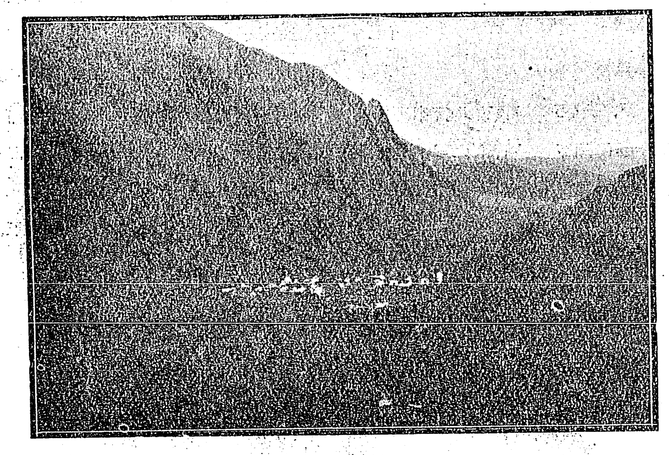

লাণ্ডিখানা—খাইবর পথ

শীতের শুক্‌নো হাওয়ায় রোদ ভারি মধুর লাগছিল। পরিচয়হীন ও অজ্ঞাতকুলশীল বন্ধুগণের সহিত নিতান্ত অন্তরঙ্গের মত গভীরভাবে গল্প চলছিল। রাক্ষসপুরীর মধ্যে রাজকন্যার যেমন অবস্থা, চারিদিকে পর্ব্বতে-প্রান্তরে আফ্রীদীগণের মাঝখানে এই সুন্দর ও মনোরম লাণ্ডি-কোটাল শহরটিরও সেই অবস্থা। স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকা না থাকায় এ স্থান যেন অঙ্গহীন ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত। অন্তরে অন্তরে এ যেন শ্রীহীন ও অসহায়। সমাজের জীবন-ধারণের পক্ষে নারীর প্রয়োজন যে কতখানি, এর আগে এমন করে' আর কোথাও অনুভব করিনি। খাইবর পথ অতিক্রম করে' যে বস্তুটি সর্ব্বপ্রথম উপলব্ধি করা যায় তা হচ্ছে প্রকৃতির বিদ্রূপ, অনাত্মীয়তা, অপরিমিত কর্কশতা,—যেন একখণ্ড তৃষ্ণার্ত্ত ভূমিখণ্ড সমগ্র পৃথিবীর কারুণ্য ও দাক্ষিণ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে নিরন্তর আকাশের দিকে তাকিয়ে হা হা করছে। দরিদ্র শুধু নয়,—দেউলিয়া!

পথের নীচেই একটি সরাইখানা। এ সরাইখানা জন-সাধারণের জন্য নয়। দূর আফগানিস্থান থেকে যে যাত্রীরা ভারত-অভিমুখে রওনা হয়, এখানে তারা বিশ্রাম করে। বিশ্রাম এবং বিশ্রাম্ভালাপ। ভিতরে একদল উট, অসংখ্য মুরগী, কোথাও বা আগুন জালিয়ে বাছুর এবং ভেড়া পোড়ানো হচ্ছে, কোথাও কোনো যুবক-যুবতী একান্তে হেসে হেসে গল্প করছে, কোথাও বা প্রকাণ্ড গড়গড়ায় তামাক ও গাঁজা সেজে একদল কাবুলী নরনারীর জটলা বসেছে। সরাইখানার দরজায় সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত। ভারতবাসীর সেখানে প্রবেশ নিষেধ। অন্য দিকে দলে দলে গোরাসৈন্যের কুচ্‌কাওয়াজ চলছে, কোথাও থেকে-থেকে বাঁশী বেজে উঠছে—কোনো কোনো তাঁবুর চারিদিকে ছুটো-ছুটি হুড়োহুড়ি পড়ে' গেছে। সাজসজ্জা, আভাস-ইঙ্গিত, জরুরি আনাগোনা, চুপি চুপি কথা, বন্দুক রাখার ছপাছপ শব্দ,—মাথা যেন খারাপ হয়ে যায়। কথায় কথায় লাণ্ডিখানার কথা উঠ্‌ল, লাণ্ডিখানাই ভারতের শেষ সীমা। শোনা গেল কোনো 'বাঙালীর' সেখানে যাওয়া নিষেধ,—কেন, সে কথার উল্লেখের আর প্রয়োজন নেই, এবং বেলা দু'টো লাগাৎ কি উপায়ে লাণ্ডিখানা পর্য্যন্ত গোপনে গিয়েছিলাম, সে কথাও ছাপার হরপে প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন। লাণ্ডিখানা এখান থেকে মাত্র চার মাইল দূর। সেখানেও দুর্গ নেই, গুটিকয়েক কেবল তাঁবুর সমষ্টি। রেলপথটি তার ধারে গিয়েই ফুরিয়ে গেছে। ট্রেণ সেখানে নিয়মিত যাতায়াত করে না, শুধু প্রয়োজনের সময়ে। বৃটিশ সীমাটি আফগান সীমানা থেকে অতি ছেলেমানুষী উপায়ে চিহ্নিত করা। এ যেন মাত্র একটা মৌখিক বোঝাপড়া। আফগানিস্থানের সঙ্গে ভারত সরকারের সদ্ভাব রাখা যেন একটি ভয়ানক সমস্যা।

আফগানিস্থানের কর্ত্তৃত্ব এদিকে অত্যন্ত প্রবল ও প্রভাব-শালী। আফ্রীদীগণ যদি আফগানের সঙ্গে মিতালি করে' ভারতের সীমানাকে আক্রমণ করে তবে ভীষণ বিপদ। সুতরাং আফগানদের সঙ্গে মিতালি করে' আফ্রীদীগণকে সকলের কু-নজরে রাখতেই হবে,—যাক্ সে কথা। ভারত থেকে মালপত্র আনাগোনার সময়ে এই লাণ্ডিখানায় পরীক্ষা করা হয়। একদিকের লোক নামায়, আর এক-দিকের লোক তুলে নেয়। এখান থেকে কাবুল পর্য্যন্ত যাবার মোটর-পথ আছে। বৃটিশ সীমানার ধারে একখণ্ড কাঠের ওপর লেখা,—'It is absolutely forbidden to cross this border into Afghan territory.'

এইবার শেষের পালা। শীতের সূর্য্য এরই মধ্যে পশ্চিম-পথে পাহাড়ের মাথায় নেমেছে। লাণ্ডিখানা থেকে ফিরে আমরা বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরেই স্যর জন্ সাইমনের মোটর বিদ্যুদ্বেগে এ সে ক্যাম্পের ধারে দাঁড়ালো। রাজা এলেন পিছনে পিছনে আরো ছ'খানি মোটর এল। তাঁর অভ্যর্থনার জন্য তিনবার কামানের শব্দ করা হ'ল, পাহাড়ে পাহাড়ে ছুট্‌ল সে শব্দ,—রাজকীয় অভ্যর্থনার কায়দায় তাঁকে গৌরব-গর্ব্বিত করা হ'ল। সবাই এল ছুটে, আমরা দূরে দাঁড়িয়ে দেখ-ছিলাম। তারের বেড়ার বাইরে দু'একজন আফ্রীদী দেখে দেখে চলে' যাচ্ছিল। তাঁবুগুলি থেকে সৈন্য ও সিপাহীগণ সুসজ্জিত হয়ে বেরিয়ে এসে ব্যূহরচনা করে' দাঁড়ালো। সবাই পথে নেমে এসে যোগ দিল এই অভ্যর্থনায়, বাকী আর কেউ রইল না।

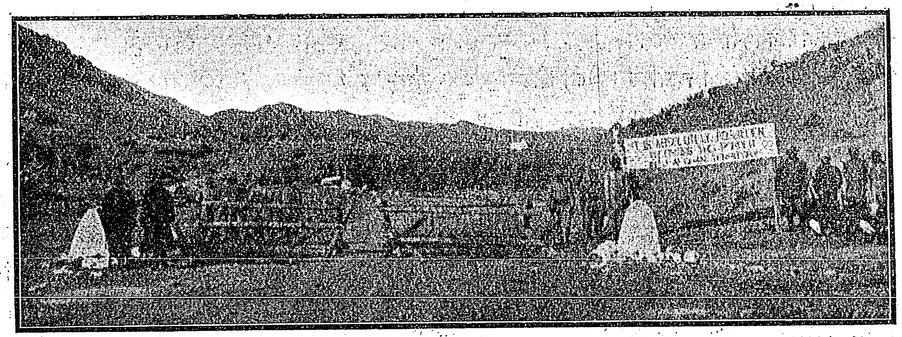

শেষ সীমানা—খাইবর পথ

অদূরে একটি তাঁবুর দরজায় নজর পড়তেই দেখলাম, একটি তরুণবয়স্ক সুশ্রী ইংরাজ যুবক গলা বাড়িয়ে চুপি চুপি সাইমন্-সমারোহ লক্ষ্য করছে। আয়ত দু'টি চোখ—কিন্তু সে-চোখ চকিত চঞ্চল, কৌতূহলে ও মৃদু হাসিতে উদ্ভাসিত। অত্যন্ত দ্বিধাজড়িত ত্রস্ত মুখ, সর্ব্বশরীর লুকিয়ে আত্মগোপন করে' কোনো মতে উঁকি মেরে সে সমস্তটা দেখে নিতে চায়। তার এই সুমধুর চৌর্য্যবৃত্তি দেখে হাসতে হাসতে আমার বন্ধুর দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করলাম। বন্ধুরাও বিজ্ঞের মত হাসি হেসে বললেন, ও এক ভারি মজা, চলুন এবার এগোই।

চিন্তিত মুখে তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে চললাম। ফেরবার সময় ট্রেণে যাবার কথা, তাই ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হলাম। তারের 'পেরিমিটার' পার হলেই লাণ্ডিকোটাল ষ্টেশন্। তরুণ যুবকটির অকারণ কৌতূহল ও আত্মগোপনের অপূর্ব্ব প্রচেষ্টা দেখে আমার যেন তার সকল কথা জানবার ইচ্ছা হচ্ছিল। ধীরে ধীরে বললাম, মজাটা কি শুনি?

সবাই হাস্‌ল। হাসির কারণ কিছুই বুঝতে না পেরে তাঁদের মুখের দিকে তাকালাম। মিশিরজি উর্দ্দুতে বললেন, ও পুরুষ নয়!

পুরুষ নয়? মুহূর্ত্তে চোখের চারিদিকে যেন সব ওলট-পালট হয়ে গেল, সমস্ত মনশ্চক্ষের দৃষ্টি ছুট্‌ল সেই ছেলেটির শাদা কোট্‌প্যাণ্টের দিকে। সে কি তার ছদ্মবেশ? কেন?

মিশিরজি মাতৃভাষায় জানালেন, সে এক প্রেমের কাহিনী, সুন্দর ও করুণ! ও ভারি দুঃখী, তা জানেন? ও লুকিয়ে পুরুষ সেজে এসে একজনের খবর নিয়ে যায়।

আর কিছু জানবার প্রয়োজন ছিল না, শুধু দূর প্রান্তরের দিকে একবার তাকালাম। দিন অবসান হয়ে এসেছে! কি হবে সে কাহিনী শুনে? বাইরের ঘটনা কি অন্তরের গোপন ফল্গুধারার সন্ধান দেবে? থাক্—ও আমি নিভৃত কল্পনায় আবিষ্কার করে' নেবো।

বন্ধুজনের কাছে বিদায় নিলাম। বললাম, আবার দেখা হবে।

কোথায়? কবে?

গ্রহ-তারকার চক্রান্তে! এই জীবনই শেষ জীবন নয়।

সবাই বিদায়ের হাসি হাসলাম। সে হাসি আমাদের শ্রাবণের প্রভাতের মত। গাড়ী আস্তে আস্তে ছাড়ল। সূর্য্যাস্তের আর বিলম্ব নেই!

অস্তাচল

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় কাব্যবিনোদ বি-এ,

(৪)

তিন দিনের মধ্যেও জ্বর সম্পূর্ণ বিরাম হইল না দেখিয়া অণি বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিল। বনবিহারী বাবু যথারীতি প্রত্যহই আসিয়া রোগী দেখিয়া যাইতেন। তাঁহার চেষ্টার কোনই ত্রুটি ছিল না। এই দুই দিন জ্বরের বেগও একটু কমিয়াছিল, কিন্তু বিকাল হইতে বুকে ব্যথা, ও সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় জ্বর বাড়িয়া উঠিয়াছে। দুশ্চিন্তায় অণির বুক কাঁপিয়া উঠিতেছিল। এখন আর সহসা বনবিহারী বাবুকে সংবাদ দিবারও কোন উপায় নাই। মোগলসরাইয়ে যাইবার শেষ গাড়ী অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই ক্যান্টন্‌মেণ্ট ছাড়িয়া গিয়াছে। সে স্ত্রীলোক এবং সম্পূর্ণ একাকী, এ অবস্থায় হঠাৎ যদি অসুখ বাড়িয়া উঠে, সে কি করিবে তাহাই ভাবিয়া আকুল হইতেছিল। স্থূল-বুদ্ধি শিউকিষণ্ ও বয় বিশেষ প্রভুভক্ত হইলেও রোগীর পরিচর্য্যা বিষয়ে অণি তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। বনবিহারীবাবু সকালে আসিয়া যে ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা এই প্রকার কোন অবস্থান্তর ঘটিলেও ব্যবহার করা যাইতে পারে কি না, সে কথাও সে তখন জিজ্ঞাসা করিয়া লয় নাই।

রোগীকে সারারাত্রি বিনা-ঔষধে রাখিলে হয় তো অসুখ আরো বাড়িয়া উঠিতে পারে; ইত্যাদি নানা কথা ভাবিয়া, অণি অগত্যা মাড়োয়ারী হাঁসপাতালের ডাক্তার বংশীধরবাবুকে আনিবার জন্য শিউকিষণ্ বেয়ারাকে গাড়ী লইয়া যাইতে বলিল।

কূলহীন সাগরের উত্তাল তরঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইলে মানুষ যেমন সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার সন্তরণ-ক্লান্ত হাত দুটি দিয়া যে-কোনো আশ্রয়কে আঁকড়িয়া ধরে, অণিও যে সেইরূপ—তাহার জীবনের দুস্তর পাথারে সন্তরণ-অপটু হাত দুটী দিয়া এই উদার বন্ধুর আশ্রয়কেই অবলম্বন করিয়াছিল। সে তো জানিত না যে তাহারই দুর্ভাগ্যের দুঃসহ গুরুভারে এ আশ্রয়ও মজ্জমান হইয়া পড়িবে। হায়! সে যদি জানিত যে তাহার দুর্ভাগ্যের পাপগ্রহ এই আশ্রয়দাতা বন্ধুকেও পীড়ন করিয়া তাঁহার জীবন অমঙ্গলে ভরিয়া দিবে, তাহা হইলে সে তো অঙ্কুরেই এই অমঙ্গলের সংক্রামক বিষে-ভরা মূলকে আপন হাতেই ছিন্ন করিয়া ফেলিত। হিতৈষী বন্ধুর আনন্দময় জীবন-পথে সে তো অশান্তির কণ্টক হইতে চাহে না।

অণির ধারণা হইয়াছিল যে, তাহার সংস্পর্শে আসিয়াই বোধ হয় মেজর অশান্তি ভোগ করিতেছেন। অসুখ হইবার পূর্ব্বেও তো সে লক্ষ্য করিয়াছিল যে, মেজর পূর্ব্বের মত আর সদাপ্রফুল্ল থাকিতে পারিতেন না। অণি এখানে আসার পর হইতেই যেন তিনি ক্রমে ক্রমে গম্ভীর হইয়া উঠিতেছিলেন। তাঁহার মুখে একটা অশান্তির ম্লান ছায়াও অণি অনেকবার লক্ষ্য করিয়াছে। ইদানীং যেন প্রায় একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস তাঁহার বুকে জমিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু কেন? অণিকে তো তিনি কোন দিন কোন প্রসঙ্গেই তাঁহার বেদনার আভাস পাইতে দেন না।

নানা খণ্ড-চিন্তায় অণির মনটা উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল। মেজরের সহিত বাস্তবিক কোন সম্বন্ধসূত্র না থাকিলেও, সে তো তাঁহাকে কোন সময়ের জন্যই পর ভাবিতে পারে না। রক্তের সম্পর্কে যাহাদের সহিত আত্মীয়তার দাবী লইয়া সে জন্মিয়াছিল, তাহার বিপন্ন জীবনের আর্ত্ত আহ্বানে সে তো তাহাদের কোন সাড়াই পায় নাই।

বেয়ারা আসিয়া জানাইল—ডাক্তার সাহেব আসিয়াছেন। অণি তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহাকে উপরে আনিবার জন্য বলিয়া দিল। জ্বরের বেগ যথেষ্ট প্রবল হইলেও মেজর তখনো সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। অণিকে অত্যন্ত ব্যস্ত হইতে দেখিয়া তিনি তাঁহার রোগক্লিষ্ট চোখ দুটী তুলিয়া অণির মুখের পানে চাহিলেন। অণি কাছে সরিয়া আসিতেই তাহার হাতখানি কপালের উপর টানিয়া

লইয়া বলিলেন—"বসুন, ব্যস্ত হবার কোনই দরকার নেই; শিউকিষণ তাঁকে সঙ্গে ক'রে উপরেই নিয়ে আস্‌চে। আমি নিষেধ করেছি কি না, তাই আর ও খবর না দিয়ে কাকেও উপরে নিয়ে আসে না।"

"হাঁ,—না—তার জন্যে তো আমি ব্যস্ত হই নি। তিনি দেখে গেলে অন্ততঃ এখনি একটা ওষুধের ব্যবস্থা হ'বে—তাই।" বলিয়া অণি নতমুখে মেজরের কপালে হাত বুলাইতে লাগিল। মেজরের যাতনা-ক্লিষ্ট ম্লান মুখের উপরে তৃপ্তির যে শান্ত ভাবটা তখন ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার কারণ খুঁজিয়া না পাইলেও, অণি যেন তাহাতে একটু সাহস পাইল।

শিউকিষণের সঙ্গে সঙ্গে বংশীধরবাবু ঘরের মধ্যে আসিতেই অণি বিছানা হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। মেজরকে সম্মানসূচক অভিবাদন করিয়া বংশীধরবাবু পাশের চেয়ারখানার উপর বসিয়া সযত্নে তাঁহার উত্তাপ, বুক ও শ্বাস-প্রশ্বাস বিশেষভাবে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। মেজর তাঁহার নিজের অসুস্থতা ও রোগ সম্পূর্ণরূপেই উপলব্ধি করিতেছিলেন। ডাক্তারকে রোগ ও উপসর্গ সম্বন্ধে মেজর সংক্ষেপে কয়েকটী কথা জানাইয়া, বুক ও রেস্‌পিরেশনটা ভালরূপে দেখিবার জন্য বলিয়া দিলেন। বংশীধরবাবু মেজরের নির্দ্দেশ মতই পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। রোগ সম্বন্ধে দুই একটা মতামত প্রকাশ করিলেও, মেজর যে বেশ একটা উদাসীনতার সহিত নিজের এই অসুখকে তাচ্ছিল্য করিতেছিলেন, তাহা অণি আগাগোড়াই লক্ষ্য করিতেছিল।

মেজর বামপার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দেখাইয়া নিউমোনিক অ্যাফেক্‌শানের আশঙ্কার কথা জানাইতেই বংশীধরবাবু গভীর মনোযোগের সহিত তাহা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। অণি উদ্‌গ্রীব হইয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করার পর মেজরের কথা সমর্থন করিয়াই বলিলেন—"হাঁ, নিউমোনিয়াই তো মালুম হোতা; বোথ্ সাইডস্—।"

নিউমোনিয়া! অণির বুকের মধ্যে যেন সমস্ত রক্ত একসঙ্গে তোলপাড় করিয়া উঠিল। নিউমোনিয়াই যে তাহার জীবনের অনেক আসন শূন্য করিয়া দিয়াছে! রিহ্বল হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দনে অণির গলা যেন শুকাইয়া আসিতেছিল। অগ্নিদগ্ধ যেরূপ রক্তসন্ধ্যা দেখিয়াই শিহরিয়া উঠে, অণিও সেইরূপ একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল।

বংশীধরবাবু ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বেয়ারার সঙ্গেই নামিয়া গেলেন। অণি তাঁহাকে পুনরায় সকালে আসিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ করিল; এবং বেয়ারার হাতে ঔষধের ফর্দ্দ ও টাকা দিয়া তাহাকে সত্বর ঔষধ লইয়া ফিরিবার জন্য বলিয়া দিল।

অণির সমস্ত মনটা যেন তখন অবশ হইয়া গিয়াছিল। অতীতের কান্নাভরা স্মৃতি, বর্ত্তমানের ম্লান ছায়া ও ভবিষ্যতের অন্ধকার কল্পনা-বিভীষিকায় তাহার বুকের মধ্যে যেন একটা বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছিল। এতদিন যে সঙ্কোচ তাহাকে টানিয়া দূরে সরাইয়া রাখিত, আজ যেন সে সঙ্কোচের বাঁধন একটা অজ্ঞাত বিপ্লবের ঝড়ে নিঃশেষে ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। সযত্নে কম্বলখানি টানিয়া মেজরের সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া দিয়া, অণি পুনরায় তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সস্নেহে কপালে হাত বুলাইতে লাগিল। মেজর যে তাহার বন্ধু ও আশ্রয়দাতা। যাঁহার দয়া ও সহানুভূতিতে তাহার সব কিছু নিরাপদ হইয়াছে, তাঁহার প্রতি অনাবশ্যক সঙ্কোচে যে তাঁহার মহত্ত্বকে অশ্রদ্ধা করা হয়। নিজের অবিবেচনা-কৃত অপরাধের জন্য অণি নিজকে ধিক্কার দিল।...তিনি প্রতিদানের প্রত্যাশা করেন না, কিন্তু তাহার তো কর্ত্তব্য আছে।

রাত্রি অনেক হইয়াছে দেখিয়া মেজর অণিকে খাইতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। অণি উঠিল না। সে তাহার নিজের জন্য কোন আয়োজনই করে নাই; কিছু খাইবার ইচ্ছাও তাহার ছিল না। অণি বার্লি ও বয়ের রান্না খাইত না। মেজর অণিকে সে জন্য কোন দিন অনুরোধও করেন নাই। চাকরদিগকে বলিয়া তিনি তাহার জন্য পৃথক ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। অণি স্বহস্তেই রন্ধন করিত।

অণি তখনও স্থিরভাবে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছে দেখিয়া মেজর কর্ত্তব্যের অনুরোধেও একটু ক্ষীণ আপত্তি জানাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অণি তাহাতে বাধা দিয়া বলিল—"তার জন্যে আপনাকে ব্যস্ত হ'তে হবে না; আপনি একটুখানি ঘুমোবার চেষ্টা করুন।"

আন্তরিক ইচ্ছা না থাকিলেও ভদ্রতার খাতিরে মেজর বিশ্রাম করিবার জন্য অণিকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অণি কোনই উত্তর দিল না; নির্ব্বাক ও নিশ্চল ভাবে বসিয়া তাঁহার মাথায় বাতাস দিতে লাগিল।

মেজর চোখ বন্ধ করিয়া ঘুমের চেষ্টা করিতে লাগিলেন; আর কোনরূপ বাধা দিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। এই দাবীর সেবার এক অপরিমেয় তৃপ্তিতে তাঁহার সমস্ত মন প্রাণ ভরিয়া উঠিল। সেবার অন্তরের এ তৃপ্তি তো তিনি জীবনে কখনই উপভোগ করেন নাই। হাঁসপাতালে নার্সদের নিকটে তিনি যে সেবা ও যত্ন বহুবার পাইয়াছিলেন, এ সেবা-যত্নের তুলনায় তাহা যেন আজ নিতান্ত প্রাণহীন ও শুষ্ক বলিয়া মনে হয়। ঘড়ির কাঁটা ও কর্ত্তব্যের মাপকাটিতে মাপা সেই সেবা-যত্নের মধ্যে তো তিনি এত প্রাণময় স্নিগ্ধ স্নেহের পরশ কখনই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

অণির হস্তস্পর্শে মেজরের বুকের মধ্যে যেন আজ থাকিয়া থাকিয়া একটা আনন্দের সুর বাজিয়া উঠিতেছিল; কিন্তু পরক্ষণেই তাহা সঙ্কোচের চোখ রাঙানিতে কাঁপিয়া উঠিতেছিল। অণির অসন্তুষ্টিকে তিনি ভিতরে ভিতরে বেশ একটু ভয় করিয়া চলিতেন।

(৫)

স্বভাবতঃ অণি অত্যন্ত ধীর, দৃঢ় ও অচঞ্চল হইলেও, রোগীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া তাহার সে দৃঢ়তা যেন নিমেষের মধ্যে উপিয়া যাইত। শৈশবে জ্ঞান-সঞ্চার হওয়ার পর হইতেই মৃত্যুযাত্রীর জীবন-পথে দাঁড়াইয়া যমের সহিত অবিশ্রান্ত হাত-কাড়াকাড়ির পরাজয়ের গ্লানিতে তাহার দৃঢ় চিত্তবৃত্তিগুলি যেন সব অসাড় ও মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়াছিল। এ্যান্টিফ্লোজিষ্টিনের কৌটাটী গরম জলে বসাইয়া অণি তখন ধীরে ধীরে মেজরের বুকের উপর তাহার প্রলেপ দিতেছিল। জীর্ণ মনের এই অবসাদ-অবসরে আজ তাহার অতীতের ব্যথাভরা স্মৃতির জমাট অশ্রু যেন বুক ঠেলিয়া বাহির হইতে চায়। এ্যান্টিফ্লোজিষ্টিনের প্রলেপ মাখানোর সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে পড়িল সেই স্নেহময় দাদুর কথা;—মায়ের সেই চিন্তাকুল ম্লান মুখ! ওঃ, মা যে শুধু তার কথা ভাবিয়াই মরণের শেষ নিশ্বাসটী পর্য্যন্ত শান্তির সঙ্গে ফেলিয়া যাইতে পারেন নাই। আজও তাহার স্পষ্টই মনে পড়ে সেই বাবা, মা, দাদু—আত্মীয় বন্ধু—সবারই কথা। একটা প্রলয়ের বন্যা আসিয়া যেন পৃথিবীর বুক হইতে তাহার সব কিছুই মুছিয়া লইয়া গিয়াছে। সৈদাবাদে গঙ্গার ধারে একখানা ভাড়াটিয়া ছোট্ট বাড়ীতে তাহারা থাকিত। চামেলী, প্রীতি, অমলা, মণিকা কত বন্ধুই না তাহার ছিল। বাবা তখন পক্ষাঘাতে শয্যাগত; তাঁহার চলাফেরা করিবার ক্ষমতা ছিল না, তবুও তিনি কত ভালবাসিতেন! বাবা যে তাহাকে এক মুহূর্ত্ত না দেখিলে পাগল হইয়া উঠিতেন। সে যেন এক যুগান্তরের পুরানো স্মৃতি; আজ আর তার কোন চিহ্নও নাই।

বাবা যখন মারা যান, তখন অণি সবেমাত্র বারো বৎসরে পড়িয়াছে। বাবার মৃত্যুর পর অনেকেই দেশের বাড়ীতে গিয়া থাকিতে বলিয়াছিলেন। মা তাহাতে রাজী হন্ নাই। বাবার অসুখের পর হইতেই যেন মা পল্লীগ্রামের উপর অত্যন্ত চটিয়া গিয়াছিলেন। পল্লীগ্রামের লোকের না কি তখন আর পূর্ব্বের মত সে সরল ও উদার ভাব ছিল না; সংকীর্ণতা, স্বার্থ ও হিংসায় তাহাদের অকর্ম্মণ্য মস্তিষ্ক পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছিল। এখনো হয় তো ঠিক্ তেমনি আছে।

সৈদাবাদের ছাত্ররা সকলে মিলিয়া একটী সেবাসঙ্ঘ গড়িয়া তুলিয়াছিল। মা এই সেবাসঙ্ঘের ছেলেদিকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। হরিৎ-দা ডাক্তার, নিরঞ্জন-দা, পরিতোষ-দা—আরও কত ছেলে মিলিয়া সেই সেবাসঙ্ঘের কাজ করিতেন। বাবার অসুখের প্রথম অবস্থা হইতে শ্মশানের শেষ সৎকার পর্য্যন্ত সব কিছু কাজই ঐ ছেলেরা করিয়াছিল। নিরঞ্জন-দা কত উপকার—কত সাহায্য করিয়াছিলেন—তাহা বলা যায় না। মা যেদিন সৈদাবাদ ছাড়িয়া কাশীতে দাদুর কাছে আসিবার কথা বলিলেন, সেদিন রাত্রে সঙ্ঘের সকলে আসিয়া মাকে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিল—"কাকীমা, আমাদের ভুলবেন না। দরকার হ'লেই সংবাদ দিবেন; আমরাও আপনার ছেলে।"

তাঁহাদের কথা মনে হইলে আজিও শ্রদ্ধায় মাথা নত হইয়া আসে।

সৈদাবাদ ছাড়িয়া যেদিন আমরা দাদুর কাছে—কাশীতে আসিবার জন্য রওনা হইলাম, মা সেদিন আমাকে

বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া কত কান্নাই কাঁদিয়াছিলেন। বাবা যে ঘরখানিতে সর্ব্বদাই থাকিতেন, রোগ-শয্যার সেই প্রথম দিন হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, সে ঘরখানি যেন মায়ের তীর্থ হইয়া উঠিয়াছিল। চলিয়া আসিবার সময় বাবার সেই অন্তিম শয্যার স্থানটীকে মা কতই না চোখের জল ফেলিয়া প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন।

আমাকে সঙ্গে করিয়াই মা নির্ভয়ে পথে বাহির হইতে পারিতেন। কিন্তু সেবার কাশী আসিবার সময় তিনি নিরঞ্জন-দাকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। তেজস্বিনী ও সাহসী মায়ের সব তেজ যেন বাবার সঙ্গে-সঙ্গেই চলিয়া গিয়াছিল। দাদুকে সংবাদ দিলে হয় তো তিনি আসিতেন, কিন্তু মা তাঁহাকে আসিতে নিষেধ করিয়া পত্র দিয়াছিলেন; নিরঞ্জন-দার প্রতি মায়ের অপার স্নেহ ও বিশ্বাস ছিল।

দাদু গাড়ী আসিবার প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই, ষ্টেশনে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমাদের গাড়ী যখন কাশীতে আসিয়া পৌঁছিল, তখন দাদুর সে কি ব্যাকুলতা! ব্যস্ত হইয়া দাদু গাড়ীর জানালায় জানালায় মাকে ডাকিয়া বেড়াইতেছিলেন। মায়ের নাম ছিল রোশনারা। নিরঞ্জন-দা আমাদের হাত ধরিয়া নামাইতেই দাদু ছুটিয়া আসিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন। দাদুর তখনকার অবস্থা দেখিলে হয় তো কেহই বলিতে পারিত না যে তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। মাকে দেখিয়া দাদুর হঠাৎ যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহাতে মনে হইল যে তিনি হয় তো পড়িয়া যাইবেন। নিরঞ্জন-দা দাদুর হাতটা ধরিয়া ফেলিলেন। মা কাছে আসিতেই দাদু তাঁহাকে দুই হাতে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। দাদু বা মা কাহারো মুখেই যেন তখন কথা সরিতেছিল না। মাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া দাদু তাঁহার শীর্ণ মুখখানি মায়ের মাথার উপর রাখিয়া কতক্ষণ যে নিশ্চল পাথর-মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়াছিলেন তাহা বলা যায় না।

নিরঞ্জন-দা গাড়ী ভাড়া করিয়া সকলকে উঠাইলেন। মা গাড়ীতে উঠিয়া দুই হাত জোড় করিয়া বিশ্বনাথকে প্রণাম করিলেন। গাড়ী দাদুর বাসার দিকে রওনা হইল। ওঃ! সে যে কত কাল পূর্ব্বের কথা তাহার ইয়ত্তা নাই। তখন আশ্বিন মাস, চারি দিকে শারদীয়া উৎসবের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। কাশীতে যাত্রীর কত ভিড়! চারি দিকে বোধনের ধুম্—কিন্তু আমাদের যেন তখন বিজয়া।

বাঙ্গালীটোলায় সেই দাদা মহাশয়ের ছোট্ট বাসাটী; দুইখানি মাত্র ঘর। তবুও কত শান্তিই ছিল সেই স্নেহ ও সমবেদনায় ভরা—বৃদ্ধের পক্ষপুটের তলে। দিদিমণি যে কতদিন পূর্ব্বে সকলকে ছাড়িয়া গিয়াছিলেন—তাহা মনে পড়ে না। দাদুর জীবনের একমাত্র সম্বল ছিলেন মা। মাকে যেন দাদু তাঁহার সমস্ত হৃদয় দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু সবই তো নিষ্ফল হইয়া গিয়াছিল। বাবার মৃত্যুর পর হইতে মা যেন প্রতি পলে পলে সম্পূর্ণরূপে বদ্‌লাইয়া গিয়াছিলেন। সেই একরাশি কালো চুল, মহাতাপের মত উজ্জ্বল রঙ্—কি অপূর্ব্ব রূপ ছিল মায়ের; কিন্তু একটা ঝড়ের দোলা তাহার সব কিছু এমন করিয়া ওলট্ পালট্ করিয়া দিয়াছিল যে, মাকে দেখিয়া আর চেনা যাইত না। মায়ের একমাত্র সন্তান আমি।—আমাকে বুকে করিয়া মা যে কত সোহাগ, কত আনন্দে ফুলিয়া উঠিতেন! কিন্তু ইদানীং আমাকে দেখিলেই আমার স্নেহময়ী মায়ের চোখ ফাটিয়া শুধুই জল গড়াইয়া পড়িত।

দাদামহাশয়ের প্রাণপণ যত্ন, চেষ্টা—সব কিছুই ব্যর্থ করিয়া সাধ্বী মা আমার বৈধব্যের সকল যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি লইলেন। বৃদ্ধ দাদু আমার পাগল হইয়া উঠিলেন। আমি তখন সবেমাত্র ষোল বৎসরে পড়িয়াছি। বেশ স্পষ্ট মনে পড়িতেছে—আজও মায়ের সেই শেষ;—ওঃ! মা! মা আমাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া মুখখানি নিজের কপোলের উপর চাপিয়া ধরিলেন; মায়ের চোখের জলে আমার মুখ ভিজিয়া গেল। ক্ষীণ একটা আর্ত্তনাদের মত মায়ের ওষ্ঠ দুইটী কাঁপাইয়া শুধু বাহির হইয়া আসিল—"ঠাকুর! অনাথার—উপায়—ক'রো—" তাহার পর সব শেষ হইয়া গেল। মা! এই অভাগী সন্তানের চিন্তায় তোমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তটী পর্য্যন্ত যে অশান্তির বিষে ভরিয়া উঠিয়াছিল মা।

অণির অজ্ঞাতসারে তাহার চোখ হইতে বড় বড় দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া মেজরের বুকের উপর পড়িল। অণি তাহা বুঝিতেও পারিল না।

মেজর চোখ মেলিয়া একবার অণির মুখের দিকে চাহিলেন। অণি তখনও অন্যমনস্ক হইয়া ছিল। তাহার বেদনাক্লিষ্ট

মুখ ও জলভরা চোখের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই যেন মেজর সহসা চম্‌কাইয়া উঠিলেন। কিসের এ অশ্রু! এ ব্যথা!! পরক্ষণেই একটা অপরিমেয় তৃপ্তিতে মেজরের হৃদয় ভরিয়া উঠিল। তিনি শান্তির নিশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। এ যেন তাঁহার জীবনের একটা অনাস্বাদিত তৃপ্তি।

অণি অন্যমনস্কভাবে বসিয়া তখনও ভাবিতেছিল—তাহার দাদুর কথা। মায়ের মৃত্যুর পর দাদু যেন সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাকেই ঘিরিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাহিয়াছিলেন। তখন আর দাদু বিশেষ একটা বাড়ীর বাহিরে যাইতেন না; সর্ব্বদাই পড়া-শুনার মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে চাহিতেন। একমাত্র অণিই ছিল তাঁহার সঙ্গী, ছাত্রী ও কন্যা। সন্তানের মত দাদুকে চালাইতে হইত। দাদু নিজেও যেমন পড়িতেন, অণিকেও সেইরূপ পড়াইতেন। দাদুর নিকটে থাকিয়া অণি কতই না শিখিয়াছিল। শেষের পাঁচ ছয়টী বৎসর যেন দাদামহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত অণিকে লেখাপড়া শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বাঙ্‌লা, ইংরাজী, সংস্কৃত—গীতা, উপনিষদ্, দর্শন—সমস্ত বিষয় দাদু নিখুঁতভাবে অণিকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। দাদুর যে বড় ইচ্ছা ছিল, যেন তাঁহার আদরের অণিকে উদরান্নের জন্য পরের দ্বারস্থ না হইতে হয়।

বার্দ্ধক্যেও দাদামহাশয়ের মধ্যে যে অসাধারণ উৎসাহ ও যুবকের ন্যায় কর্ম্ম-পটুতা ফিরিয়া আসিয়াছিল, শীঘ্রই তাহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। তাঁহার শরীর ও মন অতি দ্রুতবেগে আবার শিথিল হইয়া পড়িল। দাদু নিজেও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার দিন ঘনাইয়া আসিতেছিল। সেই জন্যই বোধ হয় তিনি প্রস্তুত হইতেছিলেন। শেষের কয়েকটী দিন তিনি সর্ব্বদাই অণিকে উপদেশ দিতেন—তাহার জীবন-যাত্রার পাথেয়।

সেদিন বিকালে দাদামহাশয়কে লইয়া অণি গঙ্গার ধারে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। দাদামহাশয়ের শরীরটা ভাল ছিল না। গঙ্গার জলা হাওয়ায় শীত করিতেছিল বলিয়া দাদামহাশয় সকাল সকাল বাসার দিকে ফিরিলেন। পথেই তাঁহার প্রবল জ্বর আসিল। চার দিন সমভাবেই জ্বর লাগিয়া থাকিল দেখিয়া অণি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল। প্রতিবেশী বল্লভ ডাক্তার চিকিৎসা করিতেছিলেন। তাঁহার ঔষধে কোন ফল হইতেছিল না, এবং রোগীর অবস্থাও আশঙ্কাজনক বুঝিয়া, বল্লভবাবু ভাল ডাক্তার ডাকিয়া চিকিৎসা করাইবার জন্য উপদেশ দিলেন। বৃদ্ধ হরিশঙ্কর তখন নিউমোনিয়াক্রান্ত হইয়াছেন।

তখন মাস-কাবার। দাদামহাশয়ের পেন্‌শনের অল্প যে কয়েকটী টাকার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদের জীবন-যাত্রা চলিতেছিল, সেই নির্দ্দিষ্ট মাসিক সম্বলও এই কয়েক দিনের ঔষধ পথ্যেই নিঃশেষিত হইয়াছিল। ক্ষোভে, দুঃখে, গ্লানিতে অণির হৃদয় যেন নিষ্পিষ্ট হইতে লাগিল। হায়! তাহার দাদু—দাদু আজ শেষ মুহূর্ত্তে,—বিনা চিকিৎসায়—বিনা পথ্যে অনাহার-ক্লিষ্ট হইয়া চলিয়া যাইবেন! এই চিন্তা যেন উত্তপ্ত লৌহ-শলাকার ন্যায় অণির হৃৎপিণ্ডকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিল। মানসিক মনস্তাপে সে যেন হঠাৎ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল।

বিশ্বনাথকে স্মরণ করিয়া অণি পাশের ভাড়াটিয়াদের ছেলেটিকে সঙ্গে করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। দাদু তাহাকে কত নিষেধ করিয়াছিলেন; সে মানে নাই। বল্লভবাবু বলিয়াছেন—দাদুর রোগ কঠিন হইয়াছে; সে যেমন করিয়া পারে ভাল ডাক্তার আনিয়া দেখাইবেই। অণি সিভিল সার্জ্জনের বাংলোর উদ্দেশে চলিল। সে জানিত। দাদুর কাছে সে বহুবার শুনিয়াছিল যে, খাঁটী সাহেব অপেক্ষা কৃত্রিম সাহেবরা সহস্রগুণ হীন। একজন ইংরাজকে বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু বাঙ্গালী বা ভারতীয় জাল-সাহেবকে বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু তবুও অণি দমিল না।

মেজর—কত উদার, কত মহৎ! ভগবান তাহাকে পথ দেখাইয়াছিলেন। মেজরের সাহায্য না পাইলে সে সময় যে তাহাদের কি হইত তাহা অণি ভাবিতে পারে না। চোখে জল আসিল।

সহসা মেজরের কথা মনে হইতেই যেন আচম্বিতে অণির সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি এ্যান্টিফ্লোজিষ্টিনের দিকে হাত বাড়াইতেই অণি দেখিল তাহা অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। লজ্জায় সঙ্কোচে অণি এতটুকু হইয়া জলের পাত্র ও ঔষধের কৌটা লইয়া গরম করিবার জন্য নামিয়া গেল।

অকারণ তৃপ্তি ও আনন্দে বিহ্বল মেজর তখন অণির দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন। অপ্রত্যাশিত মানসিক শান্তিতে তাঁহার রোগ-যন্ত্রণা প্রায় অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ প্রভাকরে সেকালের কথা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর'-এর নাম অনেকেরই নিকট সুপরিচিত। ১৮৩১ সালের ২৮ জানুয়ারি (১২৩৭, ১৬ই মাঘ) সাপ্তাহিক সমাচারপত্র রূপে ইহার প্রথম উদয় হয়। পর বৎসর—১৮৩২ সালের ২৫ মে (১২৩৯, ১৩ জ্যৈষ্ঠ) তারিখে ৬৯ সংখ্যা প্রকাশের পর চারি বৎসরের জন্য ইহার প্রচার বন্ধ হইয়া যায়। ইহার পুনরুদয় হইল ১৮৩৬ সালের ১০ আগষ্ট (১২৪৩, ২৭ শ্রাবণ) তারিখে; এবার আর সাপ্তাহিক রূপে নহে—বারত্রয়িক রূপে। এই ভাবে তিন বৎসর (১২৪৬, ৩০ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত) চলিবার পর ১৮৩৯ সালের ১৪ই জুন (১২৪৬, ১ আষাঢ়) হইতে 'সংবাদ প্রভাকর' দৈনিক সমাচারপত্রে পরিণত হয়। এই ভাবে ইহা বহু বৎসর চলিয়াছিল।

সংবাদ প্রভাকরের পুরাতন ফাইল দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন স্থানে আমি এই সমাচারপত্রের কতকগুলি পুরাতন ফাইলের (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ) সন্ধান পাইয়াছি। অবিলম্বে সেগুলির সদ্ব্যবহার না করিলে কিছুদিন পরে হয়ত তাহার চিহ্নও থাকিবে না। এই কারণে আমরা স্থির করিয়াছি, এই পুরাতন ফাইলগুলি হইতে জ্ঞাতব্য তথ্য সংকলন করিয়া 'ভারতবর্ষে' প্রকাশ করিব।

১২৫৩ সাল ৪—

হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

(৯ এপ্রিল ১৮৪৭। ২৮ চৈত্র ১২৫৩)

হুগলি কালেজের সমুদয় বিবরণ।—ইংরাজী ১৮৩৬ শকে ১ জুলাই দিবসে চুঁচুড়া নগরস্থিত মৃত হাজি মহম্মদ মহিসনের কালেজ সংস্থাপিত হয়, এই প্রধান বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত হওনের পূর্ব্বে চুঁচুড়া, চন্দননগর, হুগলী প্রভৃতি নগরে রাজপুরুষদের ভাষা কিম্বা দেশভাষার সুচারুরূপে শিক্ষা হয় এমত কোন বিদ্যালয় বিরাজিত ছিল না, চুঁচুড়া নগরে লন্দন মিসনরিদের স্থাপিত যৎসামান্য এক অবৈতনিক পাঠালয় ছিল, তথায় ঈশু খ্রীষ্টের গুণ সঙ্কীর্ত্তন যে সকল গ্রন্থে বর্ণনা আছে ঐ সকল গ্রন্থ পাঠের প্রাচুর্য্য থাকাতে ভদ্রলোকের সন্তানেরা কেহ বিদ্যাভ্যাস করিত না, হুগলিতে এমামবাটীর অধীনস্থ মাদরসা সংক্রান্ত দাতব্য এক ইংরাজী পাঠশালা ছিল, ঐ পাঠশালার কার্য্য কেবল এক জন শিক্ষক দ্বারা নির্ব্বাহ হইত, এবং তত্ত্বাবধারণের অভাবে ও কোন বিশেষ নিয়মবদ্ধ না থাকাতে সুশৃঙ্খলারূপে পঠনা কার্য্য নিষ্পাদন হইত না, সুতরাং তৎকালে পূর্ব্বোক্ত নগরত্রয়ে ও তন্নিকটস্থ গ্রামের বালকবৃন্দের জ্ঞানার্জ্জনের উপায় ছিল না, উল্লেখিত মাদরসা ও তৎসংক্রান্ত ইংরাজী বিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যয় পুণ্যাত্মা মহম্মদ মহিসনের ধন হইতে চলিত, ঐ মহল্লোকের উত্তরাধিকারি না থাকাতে উইলে অর্থাৎ মুমূর্ষু-কালীনের দানপত্রে অন্যান্য সৎ ও পুণ্যজনক কর্ম্মের মধ্যে স্বধন নির্ধন ও সাধারণ ব্যক্তিদিগের বালকগণের বিদ্যাভ্যাস জন্য এক উপযুক্ত পাঠশালা সংস্থাপনের অনুমতি লিখিত ছিল, কিন্তু তাঁহার সম্পত্তির তত্ত্বাবধারকেরা পূর্ব্বোক্ত ঐ সামান্য মাদরসা ও ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনা করিয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছিলেন, ঐ পাঠশালাদ্বয়ের ব্যয় অত্যল্প ছিল, মহম্মদ মহিসনের বিষয়ের বার্ষিক আয় ষষ্ঠি সহস্র মুদ্রার অধিক, কিন্তু এ সমস্ত টাকা কেবল অপব্যয়ে শেষ হইত, কিয়ৎকাল পরে দেশহিতৈষী শ্রীযুত ডাক্তর ওয়াইজ সাহেব হুগলিস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ দ্বারা এমামবাটীর সমস্ত ব্যাপার গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর করাইবাতে দয়ালু গবর্ণমেণ্ট হুগলির লোকেদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া মহম্মদ মহিসনের দানপত্রের মর্ম্মানুসারে তাঁহার বিষয়ের আয় হইতে উক্ত স্থানে এক উপযুক্ত কালেজ সংস্থাপিত করিতে বিদ্যাধ্যাপক সমাজের প্রতি অনুমতি করিলেন, উক্ত সভা উল্লেখিত শুভ সময়ে বিদ্যার আলোক বিকীর্ণ করণার্থে ঐ প্রধান পাঠশালা স্থাপন করিলেন, এবং ঐ বিদ্যালয়ের কার্য্য

সম্পাদনের ভার ডাক্তর ওয়াইজ সাহেবের প্রতি অর্পিত হইল, পরে কথিত মহাশয়ের কায়িক পরিশ্রমে ও মানসিক যত্নে বিদ্যালয়ের দিন২ শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি হইতে লাগিল, এবং তাঁহার অধ্যক্ষতাতে ও নিয়মাদিতে শিক্ষক প্রভৃতি কর্ম্মকারকেরা সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি কখন কাহার প্রতি অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করেন নাই, বরং নিজাধীন শিক্ষা-দাতাদের যাহাতে পদোন্নতি হয় এমত নিরন্তর চেষ্টা করিতেন। অনন্তর তিনি বিদ্যাধাপনা সভার সম্পাদকত্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইলে শ্রীযুত জেম্‌স সদরলেণ্ড সাহেব মহাশয় তাঁহার পদে অভিষিক্ত ছিলেন, তিনি পাঠশালার অধ্যক্ষতা কর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে পাঠশালাস্থ সমুদয় ব্যক্তিরা আনন্দে পুলকিত হইল, ঐ মহাশয়ের অধ্যাপনার সুশৃঙ্খলতা ও পারিপাট্য ও বাক্যের মিষ্টতা ও স্বভাবের সরলতা ও দয়া এবং পরহিতেচ্ছা প্রভৃতি যে গুণ তাহা বর্ণে বর্ণনা করা যায় না, তিনি অধীনস্থ ছাত্রগণকে স্বীয় প্রিয় সন্ততির ন্যায় স্নেহ করিতেন এবং তাহাদের সুখে সুখী ও তাহাদের দুঃখে দুঃখী হইতেন,···গৌড়ীয় ভাষার উন্নতির নিমিত্ত তিনি পণ্ডিত ও ছাত্রবর্গকে সর্ব্বদা উৎসাহ প্রদান করিতেন,···। ইতিমধ্যে সদরলণ্ড সাহেব পীড়িত হইয়া যখন জন্মভূমিতে প্রস্থান করেন তখন সুবিজ্ঞ শ্রীযুত ডাক্তর ইস্‌ডেইল সাহেব তাঁহার প্রতিনিধি ছিলেন, তাঁহার অধ্যক্ষতা ও অধ্যাপনায় সকলে সন্তোষ চিত্ত ছিল, এবং তিনিও অনেক শিক্ষকের ও ছাত্রের উপকার করিয়াছিলেন, পরে সদরলণ্ড সাহেব স্বদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে ডাক্তর সাহেব অনেক প্রশংসাপত্র প্রাপণানন্তর অধ্যক্ষতা পদ হইতে অবসর হইলেন, তদনন্তর সদরলণ্ড সাহেব পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ পূর্ব্বক কালেজের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া অতি অল্প দিবস পরে মেরিণের সেক্রেটরী পদ প্রাপ্ত হইলে কালেজাধ্যক্ষতা ভার শ্রীযুত এল, ক্লিণ্ট সাহেবের প্রতি অর্পিত হইল,···। ক্লিণ্ট সাহেব হুগলি কালেজের অধ্যক্ষ হইয়া কিঞ্চিৎকাল শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, অনন্তর কালেজের অপূর্ব্ব অট্টালিকা ও মনোহর কুসুমোদ্যান ও পুস্তকালয় এবং তৎ সংক্রান্ত পাঠার্থি সন্দোহ ও শিক্ষকগণ ও অন্যান্য বেতনভুক্ত কর্ম্মকারক প্রভৃতি লোক তাঁহার কর্তৃত্বাধীন এবম্প্রকার বিবেচনা করত আপনাকে ধন্য মানিয়া এককালে মদমত্ত হইলেন।···কথায়২ পাঠশালাস্থ ভৃত্যদিগের নাম ও বেতন কর্ত্তন এবং ছাত্রেরা অনুপস্থিত হইলে তাহাদিগকে অর্থ দণ্ড করিতেন, অপর শিক্ষকদিগের পদ ও মান বৃদ্ধি করা দূরে থাকুক বরঞ্চ যাহাতে তাঁহারা অপ্রতিভ ও অপমানিত হয়েন এমত পথানুসন্ধানে নিয়ত থাকিতেন,···। মহম্মদ মহীসনের কালেজ সংস্থাপনের মুখ্যোদ্দিশ্য এই যে দীন দরিদ্র সন্তান-দিগকে বিনা বেতনে বিদ্যাদান করা কিন্তু এই পুণ্যাত্মা সাহেবের দ্বারা এই পাঠশালা সংপূর্ণ বৈতনিক হইয়াছে, অপিচ তিনি যে হিন্দু ধর্ম্মদ্বেষি তাহার অন্য প্রমাণ দর্শাইবার আবশ্যক নাই, এতদ্দেশীয় পর্ব্বোপলক্ষে ঐ কালেজের ছুটি বিষয়ে কৌন্সেল অফ এডুকেসনে অনুরোধ করিয়া যেরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টেই বিশেষ জানা যাইতেছে, যাহা হউক অধুনা তিনি স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন···। শুনিতেছি যে বর্ত্তমান অধ্যক্ষ কাপ্তেন রিচার্ডসন সাহেব অল্প দিনের মধ্যে উক্ত কালেজের সর্ব্ব সাধারণের প্রিয়পাত্র হইয়াছেন,···।

এক জন উক্ত পাঠশালার
পূর্ব্বতন ছাত্রস্য।

১২৫৯ সাল ৪—

ডেবিড হেয়ার স্মৃতিসভা

(৪ জুন ১৮৪৭। ২২ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৪)

গত ১ জুন মঙ্গলবার রাত্রে মেডিকেল কালেজের থিয়েটরে মৃত ডেবিড হেয়ার সাহেবের নামের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তি ব্যূহের সাম্বৎসরিক নিয়মিত সভা হইয়াছিল, শ্রীযুত রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসনে উপবেশন পূর্ব্বক সভার তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিলে সংস্কৃত কালেজের অলঙ্কারের ঘরের শিক্ষক শ্রীযুত মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় মৃত মহাত্মা হেয়ার সাহেবের অসাধারণ বদান্যতা ও অন্যান্য মহদ্‌গুণ বিষয়ে বঙ্গভাষার এক অত্যুত্তম রচনা পাঠ করেন, তাহা শ্রবণ করত সভাস্থ সকল লোকেই তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রতি ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন, বিশেষতঃ সভাপতি শ্রীযুত রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার উৎসাহবর্দ্ধনার্থ অত্যন্ত সন্তোষ পূর্ব্বক ব্যক্ত করিলেন যে তর্কালঙ্কার মহাশয় এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য

ব্যক্তিদিগের সহিত সংযুক্ত হইয়া সাধারণের হিতজনক ও অবশ্যকর্ত্তব্য বিষয়ে অনুরাগ প্রকাশ করাতে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি, এবং তিনি সরলান্তঃকরণে প্রার্থনা করিলেন যে কালেজের অন্যান্য বিদ্বান্ পণ্ডিত মহাশয়েরা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মহদ্দৃষ্টান্তের অনুগামি হউন।

তদনন্তর শ্রীযুত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুত বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের পোষকতায় ধার্য্য হইল যে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পঠিত পত্র কমিটিতে প্রদান করিবেন, এবং কমিটির কর্ম্মকর্ত্তাগণ তাহা মুদ্রাঙ্কন পূর্ব্বক সাধারণকে দিবেন।

পরে রেবরেণ্ড সভাপতি মহাশয় পুনর্ব্বার গাত্রোত্থান করত বলিলেন যে সকলে বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন যে হেয়ার সাহেবের প্রাইজ কমিটির মূলধন হইতে একশত টাকা উদ্বর্ত্ত হওয়াতে এতদ্দেশীয় ভাষা শিক্ষার উন্নতি জন্য এরূপ ঘোষণা পত্র প্রকাশ করা গিয়াছে যে, যেব্যক্তি এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের অল্পবয়সে বিবাহের ফল বিষয়ে বঙ্গভাষায় উত্তম প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন তাঁহাকে ঐটাকা পারিতোষিকরূপে প্রদান করা যাইবেক, এবং ঐ কমিটির মূলধন ক্রমে বৃদ্ধি হইলে তাহার উৎপন্ন হইতে পারিতোষিক দান দ্বারা বঙ্গভাষা রচনা বিষয়ে বিদ্যার্থিগণকে উৎসাহি করিবেন, রেবরেণ্ড মহাশয়ের বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে সভাস্থ মহাশয়েরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন, তদনন্তর সভা ভঙ্গ হইল।

ডাঃ সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী

(১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৮। ৪ ফাল্গুন ১২৫৪)

"গুণ হোয়ে দোষ হলো বিদ্যার বিদ্যায়"

ডাক্তার গুডিব সাহেব গোপালচন্দ্র শীল এবং ভোলানাথ বসু নামক দুই জন মিডিকেল ছাত্রকে সমভি-ব্যাহারে লইয়া বিলাত হইতে আগমন করিতেছেন, সূর্য্যকুমার নামক বিপ্র কুলোদ্ভব ছাত্র বিলাতে রহিলেন, হঠাৎ এখানে আসিবেন না, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, একটি বিলাতি বিবি বিবাহ করিবেন তবে আসিবেন, নচেৎ যে রহিলেন সেই রহিলেন, বিবির সহিত বিবাহের লোভে তিনি পাদ্রিদিগের শ্বেত পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক ঈশুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন, অদ্য পূর্ব্ব ব্রহ্মপুত্র নদের পারে পাণ্ডববর্জ্জিত দেশে ঐ সূর্য্যকুমার জন্মগ্রহণ করেন, ঢাকার কালেজে কিছুদিন ইংরাজী পড়িয়া কলিকাতায় আগমন করত চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত মিডিকেল কালেজে নিযুক্ত হয়েন, এখানে যতদিন ছিলেন ততদিন কিছুই মানিতেন না, সংপূর্ণ নাস্তিক ছিলেন, গলদেশ হইতে যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন, কোন ধর্ম্মের প্রতিই বিশ্বাস করিতেন না, পরে মিডিকেল কালেজ হইতে গুডিব সাহেবের সঙ্গে বিলাত গমন করেন, সেখানে উত্তমরূপে বিদ্যা শিখিয়া দুর্বুদ্ধি বশতঃ অবশেষে এই অগাধ বিদ্যা প্রকাশ করিলেন,···।

ঘোষপাড়ার মেলা

(৩০ মার্চ্চ ১৮৪৮। গুরুবার ১৮ চৈত্র ১২৫৪)

মান্যবর শ্রীযুত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

যদিও ঘোষপাড়ার মেলার বিষয় আপনার কোন বন্ধু কর্ত্তৃক অত্যুত্তম রূপ লিখিত হইয়া গত গুরুবাসরীয় প্রভাকরে প্রকাশ হইয়াছে তথাপি আমি স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া যাহা২ সন্দর্শন করিয়াছি তাহা আপনার পাঠক মণ্ডলীর গোচরার্থে প্রকটন না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না,···।

গত দোলযাত্রার পরদিবস সোমবার অপরাহ্নে কতিপয় বন্ধু সহিত আনন্দধাম ও পবিত্র স্থান ঘোষপাড়া নামক প্রসিদ্ধ গ্রামে রাসযাত্রা দর্শন করিতে গমন করিয়া তথায় স্ত্রী পুরুষে অন্যূন দশ সহস্র ভাবের মনুষ্য অর্থাৎ কর্ত্তা উপাসককে উপস্থিত দেখিলাম, এতদ্ভিন্ন সে স্থলে ক্রেতা, বিক্রেতা, রঙ্গদর্শি ও নিমন্ত্রিত প্রভৃতি অনেক লোকের সমাগমন হইয়াছিল।

ঐ বহু সংখ্যক কর্ত্তামতাবলম্বিরা কেবল যে ইতরজাতি ও শাস্ত্র বিজ্ঞানবর্জ্জিত মনুষ্য তাহা নহে, তাঁহারদের মধ্যে সৎকুলোদ্ভব, মান্য, বিদ্বান্ এবং সূক্ষ্মদর্শি জন দৃষ্ট হইল, এই ভাবকেরা ভিন্ন২ দলবদ্ধ পূর্ব্বক বৃক্ষমূলে বা রম্যস্থলে বা পুষ্করিণীর ঘাটে বা মাঠে বা গৃহস্থের উঠানে অথবা রাজপথে স্ব স্ব মহাশয় অর্থাৎ উপগুরুকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া একান্তঃকরণে কর্ত্তাগুণ সংকীর্ত্তন করিতেছে, কি আশ্চর্য্য, কি কুহক, যুবতী ও কুলের কুলবধূ প্রভৃতি কামিনীগণ যাহারা পিঞ্জরের পক্ষীর ন্যায় নিয়ত অন্তঃপুরে বদ্ধা থাকে তাহারা এককালীন লজ্জা ও কুল ভয় এবং মনের বিকারকে জলাঞ্জলি প্রদান পুরঃসর পরপুরুষের সহিত একাসনোপ-

বিষ্ঠা হইয়া আনন্দ লহরী ও গোপী যন্ত্রে গীত ও বাদ্য করিতেছে, ক্ষণেক২ ঠাকুর২ বলিয়া চীৎকার, ক্ষণেক বা গুরু নামে করতালি ও জয়ধ্বনি প্রদান এবং ক্ষণেক বা আউল নামোচ্চারণ করিতেছে, আরবার নিস্তব্ধ হইয়া ভক্তিতে মগ্নানন্তর অশ্রুপাত করিতেছে, এবম্প্রকার দর্শন ও শ্রবণানন্তর কর্ত্তার ভবনে প্রবেশ করিয়া তাহার মধ্যে বহু জনতা দেখিলাম, তিলার্দ্ধ স্থান শূন্য নাই যে কিঞ্চিৎ-কাল দণ্ডায়মান্ হইয়া কাহার সহিত কথোপকথন বা পুরীর শোভা সন্দর্শন করি, পরে বাটীস্থিত এক দাড়িম্ব তরুতলে অনেক লোককে পতিতাবস্থায় দৃষ্টি করিয়া তদ্বৃক্ষের নিকটস্থ হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবাতে অবগতি হইল যে এস্থলে কর্ত্তা পাতকী তরাইয়াছিলেন, বিধেয়ে ইহার বিশেষ মাহাত্ম্য আছে, এজন্য সঙ্কটাপন্ন জীবেরা ইহার আশ্রয় লইয়াছে, অনন্তর তথায় অর্দ্ধ দণ্ডকাল অবস্থিতি করিয়া দেখিলাম, যে যাহারা ভূমিসার করিয়াছে ইহারদের মধ্যে কেহ২ উৎকট পীড়াতে পীড়িত, কেহ বা সমূহ বিপদ্গ্রস্ত, কেহ বা মনের তাপে তাপিত ও কেহ বা সন্তান সন্ততি বিরহে দুঃখিত হইয়া স্ব স্ব দায় হইতে উদ্ধার হওনের ভরসায় ও মনোরথ সিদ্ধ করণের প্রত্যাশায় এরূপ হত্যে দিয়াছে, মধ্যে২ কর্ত্তার উদ্দেশে ঐ পবিত্র বৃক্ষকে অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করত দোহাই ঠাকুর, দোহাই সতী মা, আমরা নরাধম, অতি পাপি, আমারদের অপরাধ মার্জ্জনা কর।

ইত্যাদি কাতরুক্তি প্রয়োগ করিতেছে, তদনন্তর পূর্ব্বোক্ত বাটীর কিয়দ্দূরে হিমসাগর নামক পুষ্করিণীর নিকট চরণ চালন করিয়া দেখিলাম যে ইহার ঘাটের অধঃসোপানে পাপি লোক সকল এক পদ স্থলে দিয়া অন্য পদ জলে মগ্ন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া কর্ত্তা প্রেরিত দূতগণের সমক্ষ্যে স্ব স্ব কৃত কলুষ রাশি অম্লান বদনে স্বীকার করত ত্রাণ পাইতেছে, কিন্তু যাহারা স্বীয়২ অপরাধ ব্যক্ত করিতে বিলম্ব বা সন্দেহ করিতেছে দূতেরা তাহারদের প্রতি প্রকৃত যমদূতের ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তর্জ্জন গর্জ্জন শব্দে তাহারদের কেশাকর্ষণ করত মুষ্ট্যাঘাত দ্বারা তাহারদের পাপপুঞ্জ স্বীকার করাইয়া লইতেছে, পরে ঐ পাতকিদিগকে কথিত পুষ্করিণীর সলিলে অবগাহন করাইয়া তাহারদের দেহ নিষ্পাপ করিয়া দিতেছে, পরিশেষে কর্ত্তার নিকেতনের উত্তরাংশে এক স্থান দৃষ্ট হইল যে একজন ফকির চামর লইয়া রোদন বদনে প্রভু আউলের আবির্ভাব ও তাহার সহিত বর্ত্তমান কর্ত্তা ঈশ্বরচন্দ্র পালের পিতা মহরামস্মরণ পালের মিলন বিষয়ের আদ্যন্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছে, শ্রোতারা তচ্ছ্রবণে ভাবে গদ২ ও আর্দ্র হইতেছে। এদিগে কর্ত্তার অন্তঃপুরে রাশি২ অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়া সেবকবর্গের সেবায় লাগিতেছে, বাহির মহলে গান বাদ্য ও নৃত্যের ধুমধাম হইতেছে, অপর রাত্রি দশ ঘটিকার সময় নাটমন্দিরে কবি আরম্ভ হইলে আমরা তথা হইতে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইলাম, আমরা এই সকল ব্যাপার দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়াছি, যেহেতু ব্রাহ্মণ শূদ্র যবন প্রভৃতি জাতি নীচেদের অন্ন বিচার না করিয়া এরূপ একত্রে ভোজন ও পান করে ইহা কুত্রাপি কোন স্থানে দেখি নাই ও শুনি নাই, বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যদবধি আমরা উক্ত পল্লীতে উপস্থিত ছিলাম তদবধি কাহাকে ক্ষণমাত্র অসুখি দেখি নাই, সকলেই হাস্যাস্যে সময় ক্ষেপ করিতেছিল, বোধহয় রাসের তিন দিবস তথায় আনন্দ বিরাজমান থাকে,...।

কার ঠাকুর কোম্পানী

(৪ এপ্রিল ১৮৪৮। ২৩ চৈত্র ১২৫৪)

আমরা ইংরাজী পত্র দ্বারা অবগত হইলাম যে মিস্থয়ার্স কার ঠাকুর কোম্পানির অংশিগণ এক সরক্যুলর পত্র দ্বারা মহাজনদিগ্যে প্রকাশ্য সভায় আহ্বান করিয়াছেন, গত জানুআরি মাসে তাঁহারা চলিত কার্য্য রহিত করত এরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন যে বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাবু গিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাজনদিগের হিসাবাদি দৃষ্টি করিয়া পাওনা সকল পরিশোধ করিয়া দিবেন, দেনা রাখিবেন না, কিন্তু গত ১ আপ্রিল তারিখে উক্ত বাবুরা হৌসের ঋণ প্রদানে অক্ষম হইয়া মহাজনদিগ্যে আহ্বান করণে বাধ্য হইয়াছেন, এই সংবাদ লিখনকালীন আমারদিগের বিশেষ দুঃখ হইতেছে, যেহেতু কার ঠাকুর কোম্পানিরা বিশেষ সম্ভ্রান্ত ছিলেন, তাঁহারা অতি সুনিয়মে বাণিজ্য কার্য্য করিতেন, অধুনা ঋণ পরিশোধ করণে অক্ষম হইলেন, ইহার পর অন্যান্য হৌসের ভাগ্যে কি হয় তাহা কিছুই বলা যায় না।

বঙ্গভাষা-চর্চ্চায় ঔদাসীন্য

(৫ এপ্রিল ১৮৪৮। ২৪ চৈত্র ১২৫৪)

...জাতি মাত্রেই আপনাপন জাতীয় ভাষার প্রতি যত্ন

করেন, এবং বিশিষ্টরূপে তাহা শিক্ষা করিতে অনুরাগি হয়েন, কিন্তু কি চমৎকার, এই দেশের মনুষ্যেরা জাতীয় ভাষা শিক্ষা বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ করেন না, ইংরাজী ভাষানুশীলার্থ অধিক পরিশ্রম করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহারদিগের অনুরাগ ও অযত্ন দ্বারা বঙ্গভাষার উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়াছে। বহুদিন হইল ব্রিটিস রাজপুরুষেরা এই রাজ্যের সমুদয় বিচারালয়ে বঙ্গ ভাষা ব্যবহৃত হইবার অনুমতি দিয়াছেন, কিন্তু আমলারূপে যে সকল ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারদিগের মধ্যে প্রায় তাবতেই বঙ্গভাষা লিখন পঠনে অনভিজ্ঞ, তাঁহারা মোকদ্দমা সম্বন্ধীয় যে সকল দরখাস্ত অথবা কাগজ পত্র লিখিয়া থাকেন তাহাতে কতক বাঙ্গালা, কতক পারস্য, কতক ইংরাজী এবং কতক ওলন্দাজি শব্দ ব্যবহার করেন, একারণ তাঁহারা ব্যতীত বঙ্গভাষায় সুনিপুণ অপর কোন ব্যক্তি ঐ সকল কাগজপত্রের সমুদয় মর্ম্ম অবধারণ করিতে পারেন না, গবর্ণমেণ্ট ঐ আমলাদিগের শিক্ষার পরীক্ষা গ্রহণ না করাতেই রাজবিচারে অশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার হইয়া আসিতেছে, এবং দেশীয় লোকেরাও বঙ্গভাষানুশীলনে অমনোযোগি হইয়াছেন, যেহেতু বিচারালয়ের কর্ম্মার্থিরা জানিয়াছেন যে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি রাজার দৃষ্টি নাই, যেরূপ হউক লিখিতে পারিলেই বিচারপতিরা সন্তুষ্ট হয়েন, এজন্য তাঁহারাও বঙ্গভাষার প্রতি অযত্ন করিয়া কেবল আইনের ধারা সকল কণ্ঠস্থ করত রাজকার্য্যে মনোনীত হইয়া থাকেন, অতএব আমারদিগ্যে অবশ্য বলিতে হইবেক যে রাজপুরুষেরা সমুদয় বিচারালয়ে বঙ্গভাষা ব্যবহৃত হইবার অনুমতি দিয়াছেন বটে, কিন্তু বঙ্গভাষার উন্নতি বিষয়ে তাঁহারদিগের কিছুমাত্র যত্ন দেখিতে পাই না, তাঁহারা এই দেশে ইংরাজী বিদ্যা প্রচার নিমিত্ত বিবিধ প্রকার বিদ্যালয় ও পুস্তকালয় স্থাপন করিয়া রাজভাণ্ডার হইতে বিপুল বিত্ত ব্যয় করিতেছেন, কিন্তু বঙ্গভাষার প্রাচুর্য্যার্থ অল্প ব্যয়ও করিতে পারেন না।

অপিচ এই বিষয়ে আমরা স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগ্যে যদ্রূপ দোষি করিতে পারি গবর্ণমেণ্টকে তদ্রূপ দোষি করিতে পারি না, কারণ তাঁহারা ভিন্নদেশীয় মনুষ্য, অধুনা এতদ্দেশের মনুষ্যেরা যদি স্বজাতীয় ভাষা শিক্ষা বিষয়ে মনোযোগি হয়েন তবে অনায়াসে কৃতবিদ্য হইতে পারেন, গবর্ণমেণ্ট তাহাতে কোন প্রকার নিষেধ করেন না, বরং উৎসাহ প্রদান করেন,.....কিন্তু এই পরিতাপ যে আমারদিগের দেশীয় মনুষ্যেরা জাতীয় ভাষা শিক্ষা করা একেবারে অকর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়াছেন, তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকে মুক্তকণ্ঠে দেশের ভাষার প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করেন, তাহাতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ হয় না,.....।

সাময়িক পত্র

(১২ এপ্রিল ১৮৪৮। ১ বৈশাখ ১২৫৫)

সন ১২৫৪ সাল।—

বৈশাখ মাসের বিবরণ:—বাবু চৈতন্যচরণ অধিকারী মহাশয় ৩ বৈশাখ দিবসে ইংরাজী এবং বঙ্গভাষায় জ্ঞানাঞ্জন নামক এক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন।...

বিষ্ণু সভা সম্পাদক ধার্ম্মিকবর হরিনারায়ণ গোস্বামি মহাশয় হিন্দুধর্ম্ম চন্দ্রোদয় পত্র প্রকটন করেন।...

আষাঢ় মাসের বিবরণ।—৩ আষাঢ় বুধবার দিবসে জ্ঞানদর্পণ যন্ত্র হইতে সংবাদ কাব্যরত্নাকর পত্রের জন্ম হয়,...

ভাদ্র মাসের বিবরণ।—পুস্তকের আকারে জ্ঞান-সঞ্চারিণী নাম্নী এক পত্রিকা প্রকটিতা হয়।

হিন্দুবন্ধু নামে ধর্ম্ম বিষয়ক এক পত্র প্রকাশ হইয়াছিল।...

জিলা রঙ্গপুরে "রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ" নামক এক মহোপকারক সমাচার পত্র প্রকটিত হয়।

পৌষ মাসের বিবরণ।—এই হিড়িকে সংবাদ জ্ঞানাঞ্জন পত্র মহানিদ্রা প্রাপ্ত হইলেন।.....

৩ জানুআরি সোমবারাবধি হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর পত্রের কলেবর ও মূল্য দ্বিগুণ হইয়াছে।.....

সংবাদ দিগ্বিজয় পত্র জ্ঞানদর্পণ যন্ত্র হইতে প্রকাশ হয়। অপিচ সুজনবন্ধু নামে অপর এক পত্র প্রকটিত হইয়াছে।...

জ্ঞানদর্পণ যন্ত্রে সংবাদ মনোরঞ্জন নামে এক নূতন পত্র উদিত হইয়াছে।.....

ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষায় "আক্কেল গুড়ুম্" নামে এক পত্র প্রকাশ হইয়া অনেককেই আক্কেলগুড়ুম্ মক্কেল চাক দেখাইতেছে।

মাঘ মাসের বিবরণ।—২ মাঘ দিবসাবধি সংবাদ ভাস্কর পত্র সপ্তাহে দুইবার করিয়া প্রকাশ হইতেছে।.....

হিন্দুকালেজের প্রধান গৃহের ছাত্র জগদ্বন্ধু পত্রের সম্পাদক বাবু সীতানাথ ঘোষ অল্প বয়সে বিবাহের ফল

বিষয়ে উত্তম এসে লেখাতে মৃত হেয়ার সাহেবের ফণ্ড হইতে এক শত টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন।…

ডাক্তর এডলিন সাহেব ইণ্ডিয়া রেজিষ্টর অফ মিডিকেল সায়েন্স নামক এক মাসিক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন।

১২৫৫ সাল:—

১২৫৪ সালের সংবাদের সংক্ষেপ বিবরণ

(১২ এপ্রিল ১৮৪৮। ১ বৈশাখ ১২৫৫)

সন ১২৫৪ সালের সংবাদের সংক্ষেপ বিবরণ।—

বৈশাখ:—এজুইকেসন্ কৌন্সেলের অধ্যক্ষেরা হিন্দুকালেজে সংগীত বিদ্যার অনুশীলন রহিত করেন।…ছাপাযন্ত্রের প্রধান উপকারি পরম কারুণিক দেশহিতৈষি বন্ধু ৺বাবু কানাইলাল ঠাকুর মহাশয় ১৯ বৈশাখ শনিবার দিবসে বিশুচিকা রোগে প্রাণ পরিত্যাগ করেন।

জ্যৈষ্ঠ:—কুমারহট্টের খাসবাটী পল্লীতে এক বাঙ্গালা পাঠশালা স্থাপিতা হইয়াছে।…হেয়ার সাহেবের নাম বিখ্যাত বিদ্যালয় নূতন বাটীতে স্থাপিত হয়।…ডিষ্ট্রিক্ট চেরিটেবিল সোসাইটির ষষ্ঠদশ গণিত রিপোর্ট পুস্তক প্রকাশিত হয়, তাহাতে মৃত মহাত্মা দ্বারকানাথ ঠাকুরের বদান্যতার তাবদ্ব্যাপার লিখিত হইয়াছে, যে বৎসর ঐ সোসাটি স্থাপিত হয় সেই বৎসর উক্ত বাবু চাঁদার পুস্তকে ১০০ টাকা স্বাক্ষর করেন, পরে বার্ষিক ১০০ টাকা দান করেন, পরন্তু আবার এককালীন্ ২০০০ তঙ্কা দেন, তৎপরে ৫০০ টাকা এবং ১৮৩৮ সালে একেবারে লক্ষ মুদ্রা বিতরণ বিতরণ করেন, তাহার বৃদ্ধি হইতে অনেক অক্ষম লোক প্রতিপালিত হইতেছে।

শ্রাবণ:—মিডিকেল কালেজের গত বৎসরের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা ৫০৲ টাকা মাসিক বেতনে "মিস্‌মেরিক" বিদ্যা শিক্ষার্থে ডাক্তর ইজ্‌ডেল সাহেবের অধীনে মিস্‌মেরিক্ হাস্‌পিটালে নিযুক্ত হয়েন।…সিমুলিয়ার কাঁশারিপাড়া নিবাসী মান্যবর বাবু হরচন্দ্র বসু মহাশয় ৯ শ্রাবণ দিবসে পরলোক গমন করেন।…শ্রীরামপুরের পাদ্রি জান্ রাবিন্সন সাহেব বঙ্গভাষায় একখানী ব্যাকরণ প্রকাশ করেন।

ভাদ্র:—২১ জুলাই তারিখে লাহোররাজ্যে সহগমনের রীতি নিবারিত হয়।…নারমেল স্কুল নামক এক অভিনব স্কুল গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে।

আশ্বিন:—হিন্দু সমাজ নামে এক সভা স্থাপিতা হয়। ডাক্তর ডফ সাহেব হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে একখানা ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করেন।

কার্ত্তিক:—বিচক্ষণবর বাবু রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সুসাধু বঙ্গভাষায় পঞ্জাবেতিহাস নামক এক উত্তম নূতন গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

অগ্রহায়ণ:—হিন্দুকালেজের প্রধান গণিত ছাত্রীয় বৃত্তিধারী সুশিক্ষিত ছাত্র বাবু শ্যামাচরণ বসু নিদারুণ জ্বরবিকারে আক্রান্ত হইয়া ২৯ কার্ত্তিক শনিবার দিবসে লোকান্তর গত হয়েন, শ্যামাচরণ বাবু সংবাদ পত্রের বিশেষ বন্ধু ছিলেন,…তিনি ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষায় সুলেখক ও সুবক্তা ছিলেন, তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে ও রচনা দৃষ্টে তাবতেই তুষ্ট হইতেন,…উক্ত বাবু সত্য-সঞ্চারিণী পত্রিকা প্রচার দ্বারা জগন্ময় সুখ্যাতি বিস্তার করিয়াছিলেন।……

পৌষ:—সদর আদালতের জজেরা খাসআপীল ঘটিত মোকদ্দমায় উকীল বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অপিচ গোলাম সবদার এবং রমাপ্রসাদ রায় বাবুকে শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য করিয়াছেন। পরন্তু রাজনারায়ণ দত্ত [মাইকেল মধুসূদনের পিতা] প্রভৃতি কএকজনকে অযোগ্য বলিয়া পদচ্যুত করিলেন।

মাঘ:—মেং সিডিন্স সাহেব যে নূতন আরক প্রস্তুত করিয়াছেন তদ্দ্বারা অচৈতন্য করিয়া অস্ত্র চিকিৎসা করিলে রোগি ব্যক্তি যন্ত্রণা মাত্র জানিতে পারে না।… গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ পূর্ব্বক হেয়ার সাহেবের বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের বঙ্গভাষানুশীলন জন্য তিনজন পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছেন।

চৈত্র:—সিমুলিয়া নিবাসি ধনরাশি বাবু আশুতোষ দেব মহাশয় বিনামূল্যে সাধারণকে ইংরাজী ঔষধ বিতরণ করিতেছেন।……হুগলী কালেজের প্রধান পণ্ডিত অভয়াচরণ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক দায়রত্নাবলী নামক এক পুস্তক প্রকাশ হয়।

"ইয়ং বেঙ্গাল"

(১২ এপ্রিল ১৮৪৮। ১ বৈশাখ ১২৫৫)

যাঁহারা ইংরাজী বিদ্যায় অত্যন্ত নিপুণ, তাঁহারদিগের মধ্যে অত্যল্প ব্যক্তি ব্যতীত তাবতেই বঙ্গভাষার প্রতি সমাদর করেন না, "ইয়ং বেঙ্গাল" যুবক দলেরা স্বদেশের কল্যাণকারি বলিয়া সর্ব্বদাই অভিমান করেন, কিন্তু সে কল্যাণ কিসে হয়? তাঁহারদিগের ভাষার শিক্ষা গুরু মহাশয়ের নিকট "পরম কল্যাণীয়" পর্য্যন্ত হইয়াছে কি না? তাহা সন্দেহের বিষয়; অতএব যাঁহারা স্বদেশের বিদ্যা ও ভাষার প্রতি অনুরাগশূন্য তাঁহারদিগের মঙ্গল চেষ্টার আদি সূত্রেই দোষ পড়িতেছে, ঐ মহাশয়েরা বিলক্ষণ সুধীর ও সুসভ্য এবং অনেকাংশে প্রতিজ্ঞাপালক বটেন, কিন্তু এ পক্ষে কিঞ্চিৎ সুদৃষ্টি হইলে আমরা তাঁহারদিগের দ্বারা আশার অতীত কত অধিক ফল প্রাপ্ত হইতাম, তাহা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত হইতে পারে না, উক্ত যুবক মিত্রদিগের মধ্যে এই এক বিশেষ কুসংস্কার জন্মিয়াছে যে কোন বিষয়েই বাঙ্গালা দেখিতে ইচ্ছা করেন না, সমুদয় বিষয় ইংরাজী হইলেই আহ্লাদিত হয়েন, কিন্তু কথায় সাহেব হইলে কি হইবেক? সাহেবদিগের মত কার্য্য কোথায়, সাহেবেরা স্বদেশীয় বিদ্যা এবং ভাষার উন্নতির প্রতি অত্যন্ত যত্ন করিয়া থাকেন, যাহাতে দেশীয় লোকেরা সভ্যতার সোপানে আরূঢ় হয়েন তদর্থে সমূহ চেষ্টা আছে, শ্বেতকান্তি মহাশয়েরা অন্য দেশের নানা বিষয় ইংরাজী ভাষায় রচনা এবং অনুবাদ পূর্ব্বক আপন দেশের কত উপকার করিতেছেন, আমারদিগের বাবুসাহেবেরা ইংরাজী বিদ্যার প্রভাবে কেবল বাক্য দ্বারা বসিয়া২ মুখে২ রাজা উজির মারিতে পারেন, সেই আস্ফালনে পৃথিবী কাঁপিতে থাকেন, যাহা হউক, বাবুরা যদি ইউরোপীয় বিজ্ঞান শাস্ত্রাদির মর্ম্ম অনুবাদ করিয়া বঙ্গভাষায় পুস্তক প্রকাশ করেন, তবে তদ্দ্বারা এদেশের নানা প্রকার মহদুপকার সঞ্চার হইতে পারে, ভাষাও ক্রমে উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইতে থাকে, এবং অপরিচিত বিষয় সকল আমারদিগের নিকট পরিচিত হয়? সকল প্রকার সৎকার্য্যের মধ্যে স্বদেশের উপকার প্রধান সৎকর্ম্ম, সেই উপকারের মূল সূত্র দেশীয় বিদ্যা ও ভাষার আলোচনা, অতএব যখন তদ্বিষয়ে তাঁহারদিগের গুরুতর উদাস্য তখন আমারদিগের এই আক্ষেপ ও উক্তি দুর্ব্বা গহনে মুক্তা নিক্ষেপবৎ মিথ্যা হইতেছে, যে সকল কীর্ত্তি সজ্জন সমাজে শ্রেয়ঃ ও প্রেয় নামে পরিগণ্যা হয়, তাহার সাধনকল্পে যৌবনস্বরূপ জীবনের সারাংশের কিঞ্চিৎ কাল ব্যয় করিলে যদ্যপি মনুষ্যজন্মের সার্থকতা হয়, তবে তাহা না করিয়া কেন কলঙ্ককজ্জলে অভিষিক্ত হয়েন, যদ্যপি গ্রন্থ রচনা করিতে সময় প্রাপ্ত না হয়েন, তবে বাঙ্গালা ভাষার পত্রাদি লইয়া আমোদ প্রকাশ করুন, উত্তম২ রচনা দ্বারা সেই সকল পত্রের গৌরব বৃদ্ধি করুন, এবং বাঙ্গালা পত্র হইতে উত্তম২ প্রস্তাব সকল ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ পূর্ব্বক ইংরাজী পত্রে প্রকটন করত রাজপুরুষদিগ্যে দেশের অবস্থা জ্ঞাপন করুন, ইহার কিছুই করিবেন না, অথচ স্বজাতির প্রতি উপহাস দ্বারা কেবল অনর্থক কাল ব্যয় করিবেন, ইয়ং বেঙ্গাল সাহেবেরা প্রায় কেহই বাঙ্গালা পত্রে দৃষ্টিক্ষেপ করেন না, এবং কোন অংশে তাহার আনুকূল্য করাও নাই, বাবুদিগের অর্থের অসঙ্গতি নাই, অনেকের পৈতৃক বিষয় আছে, তদ্ভিন্ন বড়২ চাকরি করেন, অপিচ সময়ের অভাব দেখিতে পাইনা, বন্ধু বান্ধব লইয়া টেবিলে বসিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমোদ প্রমোদ ও কথোপকথন চলিয়া থাকে, মধ্যে২ বাগানে বনভোজনে অনর্থক দিনযাপন হয়, বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা শুনিতেও আমোদ আছে, শুদ্ধ বাঙ্গালা পত্র পড়িতে বিরক্তি জন্মে ও সময় হয়না, বাবুরা আহারাদির ব্যাপারে যে ব্যয় করেন, ইহাতে তাহার সহস্রাংশের একাংশ ব্যয় করিলে সমুদয় বাঙ্গালা পত্র লইয়া সম্পাদকদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতে পারেন, আমারদিগের ভাষা অতি সুশ্রাব্য, ও সুকোমল এবং মাধুর্য্যরসে পরিপূরিতা, এই ভাষার বাক্যদ্বারা ও লেখনী দ্বারা উত্তম-রূপে নানা কৌশলে ও সহজে মনের অভিপ্রায় সকল প্রকাশ করা যায়, অতএব ইহার প্রতি বাবুদিগের এত আন্তঃরিক্ দ্বেষ কেন হইল, কেবল আপনারা দ্বেষ করিলেও হানি ছিলনা, যাঁহারা মনের সহিত অনুরাগ করেন তাঁহারদিগ্যে মনুষ্য বলিয়াও জ্ঞান করেন না, হায় কি আক্ষেপ? ইয়ং বেঙ্গাল সাহেবেরা যে জাতির দৃষ্টান্ত দ্বারা সভ্য বলিয়া অহঙ্কার করেন, তাঁহারা এদেশের ভাষার প্রতি কিরূপ যত্ন করেন তাহা কি দেখিতে পান না; এইক্ষণে ইউরোপ খণ্ডের সমুদয় প্রদেশের সুসভব্য মহাশয়েরা সংস্কৃত ভাষানু-শীলনে এবং সংস্কৃত বেদাদি প্রাচীন গ্রন্থ সকল মুদ্রাঙ্কিত

করণে অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছেন, যেমন তেড়েতের ফল আপন বৃক্ষকে বিনষ্ট করিয়া বনান্তরে নিক্ষিপ্ত হয়, তদ্রূপ সংস্কৃত শাস্ত্র অস্মদ্দেশে জন্মগ্রহণ করত জন্মভূমিকে উচ্ছিন্ন দিয়া ইউরোপ খণ্ডে বিরাজ করিতেছেন, হাতা যেরূপ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া রন্ধন করিয়া মরে, রসনা তাহার আস্বাদন লয় এবং মস্তক যেরূপ মিথ্যা ক্লেশভোগ পূর্ব্বক পুষ্পকে বহন করে, নাসিকা তাহার আঘ্রাণ লয়, সেইরূপ ভারতভূমি সংস্কৃত ভাষার প্রসূতি হইয়া রোদন বদনে মনের অভিমানে ম্রিয়মানা আছেন, ভিন্ন দেশীয় লোকেরা তাহার রসাস্বাদনে কৃতার্থ হইতেছেন, ইহা দেখিয়া শুনিয়াও কি বাবু সাহেবদিগের মনে২ লজ্জা বোধ হয় না? এবং উপস্থিত বিষয়ে অনভিজ্ঞতা জন্য সাহেবেরা যে সঙ্কেতে তাঁহারদের নিয়ত নিন্দাবাদ করেন তাহা কি স্বপ্নেও বুঝিতে পারেন না, "ইয়ং ব্যাঙ্গাল" শব্দের অর্থ কি? ইহা শুদ্ধ সদ্বিদ্বান্ সাহেবদিগের উপহাসসূচক বাক্য? উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে এক প্রধান ব্যক্তি এবৎসর টৌনহালে অতিশয় সদ্বক্তৃতা পূর্ব্বক বড়২ ইংরাজদিগকে হতগর্ব্ব করিয়াছেন, তাহাতে দেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, ইহা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য বটে, কিন্তু বাবু যদি দেশস্থ জ্ঞানান্ধ ব্যক্তিবর্গের দুষ্প্রবৃত্তির নিবৃত্তি নিমিত্ত বঙ্গভাষায় ঐরূপ সুবক্তৃতা করিতে পারিতেন, তবে অস্মৎ পক্ষে কি এক আশ্চর্য্য সুখের ব্যাপার হইত, ফলে তাহার চেষ্টাও নাই, বাঙ্গালা দুইটি কথা এক করিয়া কহিতে হইলে মাতায় অমনি আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে, অতি সম্ভ্রান্ত কোন আত্মীয় ব্যক্তি যিনি ইংরাজী ভাষা জ্ঞাত নহেন, অথচ জাতীয় ভাষায় অত্যন্ত নিপুণ, তাঁহার সহিত কোন ইয়ং বাঙ্গালের সাক্ষাৎ হইলে কথোপকথন কালীন শুনিতে বড় কৌতুক হয়, যথা। কেমন ভাই বাড়ীর সকল মঙ্গল্তো,—মশয়, আস্থন, "ল্যাষ্ট নাইটে" বড় "ডেঞ্জরে" পড়েছি "আঙ্কেলের কালারা" হয়েছে, "পল্স" বড় "উইক্" হোয়েছিল, আজ্ "মার্ণিংয়ে" ডাক্তার এসে অনেক "রিকাবর" করেছে, এখন "লাইফের" "হোপ" হোয়েছে, সে ভালমানুষ বাবুজীর উত্তর শুনিয়া ভাল মন্দ কিছুই বুঝিতে পারে না, ভ্যাভ্যা রামের ন্যায় অবাক্ হইয়া শুদ্ধ খাড়া থাকে, এইরূপ কত আছে, যাহা লিখিতে লেখনীর মুখে হাস্য আইসে, পরন্তু বাবুরা কথায়২ স্প্রিট্ জানান্, কিন্তু সেই স্প্রিটেই সর্ব্বনাশ করিয়াছে, ঐ স্প্রিটের রস পেটের ভিতর না ঢুকিলে এত অমঙ্গল কেন হইবেক।

ছাতুবাবুর পুত্র গিরিশচন্দ্র দেব

(১২ এপ্রিল ১৮৪৮। ১ বৈশাখ ১২৫৫)

বাবু গিরিশচন্দ্র দেব।—আমরা গত ৩ কার্ত্তিক মঙ্গলবার যামিনী যামার্দ্ধ সময়ে এক অমূল্য তুল্যরহিত বন্ধুরত্ন বিহীন হইয়াছি। এই প্রভাকর পত্রের প্রধান আনুকূল্যকারি বহুগুণধারি সিমুলানিবাসি বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের প্রিয় পুত্র বাবু গিরিশচন্দ্র দেব উক্ত দিবস সাংঘাতিক জ্বর বিকারে আক্রান্ত হইয়া এতন্নিখিল সংসার পরিহার পুরঃসর ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন।……তিনি আপন পিতৃব্য ও পিতার নিকটে প্রতিমাসে প্রচুরার্থ প্রাপ্ত হইতেন, তদ্ভিন্ন পরিয়র কোম্পানির হৌসে মুচ্ছদ্দির কর্ম্মে অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতেন, তথাচ…শুদ্ধ সৎকর্ম্মে তত্তাবৎ ব্যয় করত আবার ঋণী হইতেন।…

আমারদিগের মৃত বন্ধুর সহায়তায় ব্রাহ্ম সমাজের অধীনে কতিপ্রয় বিপ্র নন্দন কাশীধামে বেদাধ্যয়নে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহার দানে অনেক পাঠাশালা ও সভা এবং প্রকাশ্য বিষয়ের শোভা বৃদ্ধি হইয়াছিল, বিদ্যা বিষয়ে তাঁহার যদ্রূপ যত্ন ছিল, তাহা বাক্যদ্বারা বর্ণনা হইতে পারে না,…।

অন্তঃকরণে সততই বোধ হয়, গিরিশবাবু অবনী পরিত্যাগ করেন নাই, যেন বেলগেছিয়ার মনোহর বাগানে অথবা পাণিহাটির গঙ্গাতীরস্থ সুচারু নূতন উদ্যানে গমন করিয়াছেন এখনি আসিয়া আমারদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।……

স্বর্গবাসি গুণরাশি ৺রামদুলাল দেব মহাশয়ের দুই পুত্র, প্রথম আশুতোষ তুল্য বাবু আশুতোষ দেব, দ্বিতীয় স্বধর্ম্মতৎপর বাবু প্রমথনাথ দেব, উক্ত উভয় ভ্রাতার মধ্যে গিরিশবাবু একাকী কেবল দেব বাবুদিগের অতুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী এবং বংশধর ছিলেন, তিনি জীবিত থাকিলে এক কোটী ত্রিশ লক্ষ মুদ্রার স্বত্বাধিকারী হইতেন।…… বাবু ২৪ বৎসর বয়সে অদৃশ্য হইলেন, এতৎ সংক্ষেপ সময়ের মধ্যে প্রবীণের ন্যায় অনেক মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন,…। সংগীত বিদ্যার প্রতি তাঁহার বিশেষ সমাদর ছিল, তাঁহার মরণে ঐ বিদ্যা সহগামিনী হইয়াছে, অর্থাৎ কলিকাতায় একেবারে তাহার পাঠ উঠিয়াছে, আমোদ উল্লাস অন্ধকারে

আচ্ছন্ন হইয়াছে। বাবু সেতার বাজনায় অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন,…। তাঁহার সকল স্বরূপ গুণ লিখিয়া শেষ হইতে পারে না। তিনি প্রতিদিবস প্রাতে অনেকগুলীন ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ভদ্রলোককে চারি আনা, আট আনা ও এক টাকা করিয়া দান করিতেন, আপন ব্যয়ে বাটীতে এক ঔষধালয় স্থাপন করিয়া সাধারণকে ঔষধ বিতরণ করিতেন,…।

ধর্ম্মসভার ভগ্নদশা

(১৬ মে ১৮৪৮। ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৫)

ধর্ম্মসভা তথা চন্দ্রিকা সম্পাদক। অবগতি হইল, গত রবিবার বৈকালে কলুটোলার ধর্ম্মসভার গৃহে ধর্ম্মসভার এক অতিরেক সভা হইয়াছিল, ঐ সভাতে আমারদিগের প্রধান সহযোগি চন্দ্রিকার অভিনব সম্পাদক বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদকের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, উক্ত বাবু পিতৃপদ প্রাপ্ত হইয়া পিতার ন্যায় সর্ব্বতোভাবে যশস্বী হয়েন ইহা অস্মদাদির বিশেষ প্রার্থনা বটে, কিন্তু স্থির রূপে বিবেচনা করিলে প্রকাশ্য পত্রের সম্পাদক দিগ্যে ধর্ম্মঘটিত কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে বদ্ধ হওয়া উচিত হয় না, বিশেষতঃ যে সকল বিষয় অতি প্রকাশ্য তাহার সহিত গুরুতর সম্বন্ধ রাখা আরো অধিক দোষের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক যেহেতু সংবাদ পত্রের অধ্যক্ষেরা সকল বিষয়েই স্বাধীন ও সকল বিষয়ের বিচারক স্বরূপ,…। আমারদিগের সহযোগী যখন ধর্ম্মসভার সম্পাদক হইলেন তখন তাঁহার অভিপ্রায় এবং লেখনীকে যাবজ্জীবনের জন্য উক্ত সভার নিকট বিক্রীত করিতে হইল, তদ্বিষয়ে স্বাধীনরূপে আর স্বাভিমত প্রকাশ করিতে পারিবেন না, ধর্ম্মসভার কার্য্যঘটিত রাশি২ দোষকে গোপন করিয়া বিপরীতার্থ ব্যাখ্যা করিতে হইবেক,…।

ধর্ম্মসভা, এই শব্দ শুনিতে অতি উত্তম, কারণ ধর্ম্ম শব্দ অতিশয় জাঁকজমকে পরিপূর্ণ, কিন্তু ইহার ভিতরের মর্ম্ম অন্বেষণ করিলে তন্মধ্যে কোন পদার্থ ই দৃষ্ট হয় না, কেন না এক সভাতেই সকল শোভা নষ্ট করিয়াছে, সতীরীতি সংস্থাপনের নিমিত্ত যৎকালীন ঐ সভার সৃষ্টি হয়, তৎকালীন দেশের অবস্থা অতি ভয়ঙ্কর হইয়াছিল, ধর্ম্ম বিষয়ের গোলযোগে অনেকের মনে নানা প্রকার ভাবের আন্দোলন হয়, হিন্দুগণ ভিন্ন২ দলাক্রান্ত হইয়া পরস্পর বিবাদ কলহে প্রমত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে প্রায় সকলেরি আত্মপর ও হিতাহিত বিবেচনা রহিত হইয়াছিল, সে সময়ে প্রতিযোগি পক্ষের উন্নতির উচ্ছেদ করণের মানসে অনেক ধনাঢ্য এবং দলপতি বর্গ পরস্পর স্থিরপ্রতিজ্ঞায় দলবদ্ধ করত একত্র হইয়া ধর্ম্মসভা স্থাপিতা করেন, কিন্তু জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য ইচ্ছা, সত্যের কি নির্ম্মল প্রতিভা, দলাধ্যক্ষ মহাশয়েরা যে অভিপ্রায়ে সভা করিয়া দ্বেষানলে দগ্ধ হইলেন, সে ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, "ধর্ম্ম" আপনি আপনার রক্ষক হইয়া তাঁহারদিগের মর্ম্মভেদ ও শর্ম্মচ্ছেদ করিলেন, অর্থাৎ মৃত মহাত্মা লার্ড উইলিএম বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের বিরুদ্ধে বিলাতে যে আপিল করেন, সেই আপিলের মোকদ্দমায় পরাজয় হইলেন, চাঁদার দ্বারা যে প্রচুরার্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা, ন দেবায়, ন ধর্ম্মায়, জলে ফেলিলে বরং ভুড়্ভুড়ি কাটিত, তাহা না হইয়া কেবল ধর্ম্মসভার ব্যথার ব্যথী ব্যথী সাহেবের উদরায় স্বাহা হইল, মূল আশা ভঙ্গ হইলে স্থূলবুদ্ধি সভ্যেরা আর কি করেন, কিছুই ভাবিয়া পান্ না, সভার ফাঁদুনি করিয়া ছাঁদুনি ও বাঁধুনি মাত্র সার হইল, মনসার কাঁদুনি কত গাহিবেন, পরিশেষ বড়২ চাঁই মহাশয়েরা বুদ্ধির খেই হইতে এক দলাদলির সূত্র তুলিয়া বসিলেন, সেই দলাদলিতে কিছুদিন গলাগলি ভাব হইয়া পরিশেষ ঢলাঢলি আরম্ভ হইল, তাহাতেই একেবারে সৎকার্য্যের সৎকার্য্য হইল, আর পূর্ব্ববৎ প্রণয়ের সন্ধি রহিল না, দলপতিরা দলচক্রে পড়িয়া স্ব স্ব প্রধান হইয়া বসিলেন, মহামতি সভাপতি সভার গৃহে এক হাড়িকাষ্ঠ লগ্ন করিলেন, তাহাতে প্রতিদিন শত২ ব্রহ্মবলি হইতে লাগিল "ব্রাহ্মণ পণ্ডিত" ধনিদিগের নিকট কোন কর্ম্ম উপলক্ষে যৎকিঞ্চিৎ বিদায় পাওয়া যাঁহারদিগের উপজীবিকা হইয়াছে, তাঁহারদিগের উপার্জ্জনের পথে কণ্টক পতিত হইল, যে শূদ্রেরা ব্রাহ্মণের সেবক, সেই শূদ্রেরাই পরম পূজনীয় ভূদেবদিগের প্রায়শ্চিত্ত করাইতে লাগিলেন,. তৎকালীন্ চন্দ্রিকা পত্রে এক২ দিন দলঘটিত যে যে বিষয় প্রকটিত হইত তাহা পাঠ করিয়া আমরা হাস্য সম্বরণে অক্ষম হইতাম্।। যথা।

"মহামহিম শ্রীযুত—ঃঃ—দেব,
দত্ত, রাজা বাহাদুর, দলপতি মহাশয়
ধার্ম্মিক বরেষু।

আমারদিগের এবাটীর সকলে শারীরিক ভাল আছেন, তাহাতে ভাবিত নহিবেন, যাতায়াতে তথাকার মঙ্গলাদি সমাচার লিখিতে আজ্ঞা হইবেক, গত পরশ্ব দিবসে আমারদিগের ওবাড়ীর বড় মহাশয়ের পিশের শালার মামার মেসোর দাদার খুড়ার জামায়ের ভেয়ের মামাশ্বশুর পদব্রজে গমন কালীন সিংহ বাবুদিগের বাটীর সংলগ্ন এক পুরাতন প্রাচীরের একখানা পতিত পাট্‌কেল স্পর্শ করিয়াছেন, অতএব সভার রীতিমতে তাঁহাকে দল হইতে পরিত্যাগ করা উচিত হয় ইত্যাদি।"

এই প্রকার লোকের গ্লানিজনক গ্লানিসূচক বিষয় দ্বারা কিছুদিন ধর্ম্মসভার কার্য্য নিষ্পাদিত হইয়াছিল, পরিশেষ এক নীলকমলি হেঙ্গামা উঠাতেই এক দিনে সমুদায় ধাই ফুট্ ফাট্ হইয়া গেল, রাজা শিবকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর, বাবু আশুতোষ দেব, বাবু মহেশচন্দ্র দত্ত, বাবু শিবনারায়ণ ঘোষ, বাবু দুর্গাচরণ দত্ত, বাবু দেবনারায়ণ দেব, এবং বাবু জয়নারায়ণ মিত্র প্রভৃতি দলপতি মহাশয়েরা একত্র হইয়া রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরকে পরিত্যাগ করত সিমুলায় স্বতন্ত্ররূপে এক ধর্ম্মসভা করিলেন, ঐ সময়ে দেব বাহাদুর একাকী কেবল স্বদল সহিত কলুটোলার ধর্ম্মসভায় রহিলেন, অপর সকল দলপতি সংযোজিত রূপে নূতন সভার সভ্য হইলেন, কিন্তু চমৎকার দেখুন, তাঁহারদিগেরও সেই সংযোগ পরে মিথ্যা হইল, অর্থাৎ তাঁহারদিগের ঘরে২ এমত বিচ্ছেদ হইল যে পরস্পর বাক্যালাপ রহিল না, যজ্ঞসূত্র গ্রহণাভিলাষি গুণরাশি ক্ষত্রি অভিমানি আন্দুলেশ্বর রাজা বাহাদুর এক বিবাহ সূত্রে শিশুপালের ন্যায় সম্ভ্রান্ত হইয়া সিমুলিয়ার সভা ত্যাগ করত নিজ গ্রামে এক কলমের ধর্ম্মসভা স্থাপিতা করিলেন, সেই কলমের বৃক্ষে মধ্যে২ দুই একটী ফুল ফুটিয়া অমনি২ ঝরিয়া পড়ে, ফলের সহিত আর সাক্ষাৎ হয় না, তদন্তর এক "একজায়ের" ঢেউ উঠিয়া বিবাদের জলের স্রোতে প্রায় সকল সংহার করিয়া বসিল, রাজপরিবারের সহিত দেব বাবুদিগের বিচ্ছেদ হইল, সেই বিচ্ছেদেই সভার উচ্ছেদ স্বীকার করিতে হইবেক, কারণ রাজদলের সহিত ঘোষ বাবু এবং মিত্র বাবু প্রভৃতি কতিপয় দলপতি একত্র হইয়া সিংহ বাবুদিগের দলের সহিত মিলিত হইলেন, এইক্ষণে ঘরে২ ধর্ম্মসভা, যেমন রাজপুর অঞ্চলে বাটোয়ারার গঙ্গা, অর্থাৎ করের গঙ্গা, ঘোষের গঙ্গা, বসুর গঙ্গা ইত্যাদি, সেইরূপ অধুনা অমুকের ধর্ম্মসভা, ফলনার ধর্ম্মসভা বলিয়া পরিচয় হইয়াছে।

সত্যযুগে ধর্ম্মের চারি পদ ছিল, ত্রেতাযুগে এক পদ ভগ্ন হইয়া তিন পদ হয়, পরে দ্বাপরে আর এক পদ ভগ্ন হইয়া দুই পদ থাকে, এই কলিযুগে কেবল এক পদ মাত্র আছে, তাহাতে তাঁহার চলিবার শক্তি নাই, অতএব এসময়ে সেই এক ঠ্যাং ধরিয়া টানাটানি করাতে কেবল তাঁহার প্রাণে ক্লেশ দেওয়া হয়। আমারদিগের রাজকৃষ্ণ বাবু চন্দ্রিকার সম্পাদকত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়া উচ্চ সোপানে উত্থিত হইয়াছেন, সুতরাং এখন দলাদলি চক্রে প্রবৃষ্ট হওয়া যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না, কেননা ইহাতে স্বাধীনতাকে একেবারে গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন করা হইবেক, সংপ্রতি চন্দ্রিকা পত্রে উত্তম২ বিষয় সকল লিখিত হইতেছে, কিন্তু ধর্ম্মসভার নিয়মে দলাদলি ঢুকিলে আর তদ্রূপ থাকিবেক না, পরে জাতিমারণ, হুঁকাবারণ, মানহরণ, বিষ্ণুস্মরণ, প্রতিজ্ঞা রক্ষণ, গোবর ভক্ষণ ইত্যাদি বিষয় দ্বারা এক দিনের চন্দ্রিকা পূর্ণ করিতে হইবে, অধুনা ঐ সভা একদোরে সভা হইয়াছে, মধ্যে দেশহিতার্থি বাবু মতিলাল শীল মহাশয়ের বদান্যতায় কিঞ্চিৎ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, সংপ্রতি তিনি সে শ্রী হরণ করিয়াছেন, অর্থাৎ আপন হস্তে টাকা লইয়া উপায়হীন ভদ্র পরিবারকে গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান করিতেছেন, ইহাতে সভার শোভা আর কি রহিল, কেবল এক নামের অভিমান মাত্র রহিয়াছে, অতএব জিজ্ঞাসা করি এমত মিথ্যা অভিমানের কার্য্যশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া সম্পাদকীয় ধর্ম্মে কলঙ্ক প্রদান করা কি উত্তম বিবেচনা হইতেছে ?

জোড়াসাঁকোর সিংহ-পরিবার

(১৭ মে ১৮৪৮। বুধবার ৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৫)

৺বাবু নবকৃষ্ণ সিংহ।—আমরা অসীম খেদ সাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি, যোড়াসাকো নিবাসি ধনরাশি ধার্ম্মিকবর ৺বাবু নবকৃষ্ণ সিংহ মহাশয় গত রবিবার বৈকালে শ্রীশ্রী৺ত্রিদশতরঙ্গিণী তীরে নীরে শরীর সমর্পণ পূর্ব্বক এতন্মায়াময় সংসার বিনিময় করত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন, নবকৃষ্ণ বাবু নবীন বাবু নামে বিখ্যাত ছিলেন। জগদীশ্বর যে সকল মহদ্‌গুণের সৃষ্টি করিয়াছেন সেই সমস্ত

গুণ তাঁহার অলঙ্কার স্বরূপ হইয়াছিল।...নবকৃষ্ণ বাবু বৈষয়িক ব্যাপারে বিলিপ্ত হইয়াও সতত পণ্ডিত মণ্ডিত সভামধ্যে নানাবিধ শাস্ত্রালাপে সুখী হইতেন, সকল প্রকার বিদ্যায় ও ভাষায় তাঁহার বিশেষ সংস্কার ছিল,...। তিনি বিপক্ষদিগের বিপক্ষতা ও নিন্দাকে নিয়তই ক্ষমা করিতেন, তাঁহার আস্য ক্ষণকালের জন্য হাস্যহীন হয় নাই, এবং অঙ্গের কোনরূপ ভঙ্গিমাদ্বারা কেহই ক্রোধের চিহ্ন দেখিতে পান নাই, মৃত মহাত্মা বাবু নন্দলাল সিংহ মহাশয় যৎকালীন রামকৃষ্ণপুরের মল্লিক বাবুদিগের বাটীতে বিবাহ করেন, তৎকালীন ধর্ম্মসভা সংক্রান্ত কলিকাতাস্থ এবং অপরাপর স্থানের দলপতি ও বড়২ ধনশালি জনেরা সিংহ বাবুদিগের বিরুদ্ধে বিবিধমতে বিপক্ষতা করণে সাধ্যের ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু নবীন বাবুর কি অসাধারণ বুদ্ধি, তিনি ঐ শৈল সম বিপদকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া স্বীয় যুক্তি ও কৌশল শক্তিক্রমে উল্লেখিত বৃহৎ২ বিপক্ষদিগকে এককালীন্ হতগর্ব্ব করত সর্ব্বতোভাবে যশস্বী হইয়াছিলেন।...

নবীন বাবু এতন্নগরের এক প্রাচীন ধনি পরিবারের অধ্যক্ষ ছিলেন,...অধুনা প্রার্থনা করি সদাত্মা বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ মহাশয় পরিবার সহিত দীর্ঘজীবি হইয়া বংশের নির্ম্মল সম্মান রক্ষা করুন।

রাজকবি মহারাজা অপূর্ব্বকৃষ্ণ বাহাদুর

(২২ মে ১৮৪৮। ১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৫)

রাজকবি মহারাজা অপূর্ব্বকৃষ্ণ বাহাদুর বিদ্যা বিস্তার বিষয়ে যদ্রূপ যত্নশীল আমারদিগের পাঠক মহাশয়েরা তাহা বিশিষ্টরূপে অবগত আছেন, তাঁহার বিরচিত বিবিধ প্রকার কবিতা পুস্তক পাঠ করিয়া সম্ভ্রান্ত সম্রাটগণ বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন, বিশেষতঃ দিল্লীশ্বর তাঁহাকে রাজকবি বলিয়া গণ্য করিয়াছেন, উক্ত মহারাজার সহযোগী মুন্সি তরিবুল্লা নামক ব্যক্তি সংপ্রতি পারস্য ভাষায় কবিতা ছন্দে এক অতি উত্তম পুস্তিকা লিখিয়াছেন, এবং তাহা প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে তিনি ঐ রাজকবি মহারাজার ও তাঁহার পিতৃ পিতামহের জীবন বৃত্তান্ত অতি উৎকৃষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, কবিতাপ্রিয় ব্যক্তিগণ ঐ পুস্তক পাঠ করিলে বিশেষ আহ্লাদিত হইবেন, যেহেতু তাহাতে তিন জন অতি সম্ভ্রান্ত এবং মান্যলোকের জীবন বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে, রাজকবি মহারাজার পিতামহ মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর যেরূপ মনুষ্য ছিলেন তাহা সকল রাজ্যের লোকেই জ্ঞাত আছেন, তাহার তুল্য কীর্ত্তিকুশল ব্যক্তি এই রাজ্য মধ্যে কেহই জন্ম গ্রহণ করেন নাই, এবং রাজকবি বাহাদুরের পিতা মহারাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের কীর্ত্তি বিস্তৃতা হইয়াছে, তাঁহার ন্যায় দাতা ও উদারচরিত্র ধার্ম্মিক মনুষ্য এইক্ষণে কে আছেন,...।

"মিস্‌মেরিক হাসপিটাল"

(৫ জুন ১৮৪৮। ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৫)

গত শুক্রবার বেলা পরাহ্নে শ্রীযুত হিউম সাহেবের বাটীতে মিস্‌মেরিক বিদ্যার বান্ধবদিগের এক সভা হইয়াছিল, তাহাতে স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় বহুলোকের সমাগম হইলে এই সকল বিষয় ধার্য্য হয়।

প্রথম কল্প।—গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক "প্রেসিডেন্সি সরজিয়ন" পদে ডাক্তর ইজ্‌ডেল সাহেব নিযুক্ত হয়েন, ইহা সভ্যদিগের বিশেষ অভিপ্রায় হইয়াছে।

দ্বিতীয় কল্প।—এজন্য যে সকল মহাশয়েরা উক্ত বিষয়ের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের প্রতি আবেদনপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহারদিগের প্রতি বিজ্ঞাপন করা যাউক যে মিস্‌মেরিক হাসপিটাল যাহাতে চিরস্থায়ী হয়, এতদর্থে উপযুক্ত মত ধন দান করেন।

তৃতীয় কল্প।—পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট যে মিস্‌মেরিক চিকিৎসালয় স্থাপন করেন তাহার নিয়মানুসারে ভাবি হাসপিটালে সর্ব্বপ্রকার ব্যামহযুক্ত কি স্বদেশীয় কি ইউরোপীয় সকল মনুষ্যেরই চিকিৎসা হইবেক।

চতুর্থ কল্প।—এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের দ্বারা যদ্যাপি প্রচুররূপে আনুকূল্য হয় তবে সাধারণ সমাজ কর্ত্তৃক এরূপ সকল নিয়ম নির্দ্ধার্য্য হইবেক, যাহাতে মনুষ্য জাতির বিশ্লেষ উপকার সম্ভব, এজন্য ঔষধ, যন্ত্র, এবং দ্রব্যাদির কারণ গবর্ণমেণ্টকে আবেদন করা যাইবেক, অর্থাৎ যদ্দ্বারা উক্ত হাসপিটালে একটা সাধারণ ঔষধালয় সংস্থাপন হইতে পারে।

যে সকল মহাশয়েরা মিস্‌মেরিক বিদ্যার সত্যতা অন্বেষণ করিতে চাহেন তাঁহারা অবাধে হাসপিটালে যাইতে পারিবেন।

পঞ্চম কল্প।—রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, বাবু রমাপ্রসাদ রায়, অনরবিল মেং ইলিএট সাহেব, রেবরেণ্ড মেং ফিসর, মেং হিউম, রেবরেণ্ড মেং লাক্রা এবং ডাক্তর

মার্টিন সাহেব, ইঁহারা কমিটির অধ্যক্ষ, এবং বাবু রামগোপাল ঘোষ কোষাধ্যক্ষ এবং অভিরিক্ত মেম্বরী পদে মনোনীত হইলেন।

ষষ্ঠ কল্প।—এই সকল বিষয় কলিকাতার সমুদয় সংবাদপত্রে প্রকাশ হয়, এজন্য তৎসম্পাদকগণকে বিজ্ঞাপন করা যাউক, অপর উল্লেখিত মিস্‌মেরিক হাসপিটালের উপকারার্থে উক্ত মহাশয়েরা ধন সংগ্রহ করেন, ইহাও জ্ঞাপনীয়।

কলিকাতা রসল ষ্ট্রীট, নং ১২ বাটীতে শ্রীযুত ডাক্তর ইজ্‌ডেল সাহেব অথবা কমিটির অধ্যক্ষগণ দাতব্য ধন সংগ্রহ করিবেন।

বাংলা নাটক

(২৮ জুন ১৮৪৮। ১৬ আষাঢ় ১২৫৫)

আমরা অত্যন্ত আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজের সাহিত্য গৃহের সুপাত্র ছাত্র শ্রীযুত রামতারক ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক গৌড়ীয় গদ্য পদ্যে শ্রীমন্মহাকবি কালীদাস বিরচিত অভিজ্ঞান শকুন্তলা নামক সুবিখ্যাত নাটক গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে, তদীয় ভূমিকা ও মঙ্গলাচার প্রভৃতি কিয়দংশ পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম উৎকৃষ্টতর হইয়াছে, অপর উক্ত পুস্তক উত্তমাক্ষরে উত্তম কাগজে জ্ঞানদর্পণ যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে, অতএব আমরা বিদ্যানুরাগি মহোদয়গণ সন্নিধানে প্রার্থনা করি তাঁহারা অভিজ্ঞান শকুন্তলঃ নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রস্তুত হইলে উচিত মত আনুকূল্য প্রদান করেন।

গৌড়ীয় ভাষার পুনরুন্নতি হওন কালাবধি প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক ব্যতীত আর কোন নটরসাশ্রিত গ্রন্থের গৌড়ীয় অনুবাদ হয় নাই, বিশেষতঃ এতদ্দেশে পুরাকালের নাটকের ন্যায় অধুনা নাট্যক্রিয়াদি সম্পন্ন হয় না, কালীয়দমন, বিদ্যাসুন্দর, নলোপাখ্যান প্রভৃতি যাত্রার আমোদ আছে, কিন্তু তত্তাবৎ অত্যন্ত ঘৃণিত নিয়মে সম্পাদন হইয়া থাকে, তাহাতে প্রমোদ প্রমত্ত ইতর লোক ব্যতীত ভদ্র সমাজের কদাপি সন্তোষ বিধান হয় না, অতএব এই সময়ে প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যরস যাহাতে এতদ্দেশীয় মনুষ্যদিগের অন্তঃকরণে সন্দীপন হয়, তাহাতে সম্যগ্‌রূপ প্রযত্ন প্রকাশ করা বিধেয়, আমরা এই জন্যই শ্রীযুত রামতারক ভট্টাচার্য্যের সংকল্প সুসিদ্ধ যাহাতে হয় এমত অনুরোধ দেশহিতৈষি সমাজে জানাইলাম।

সাঁসুচি থিয়েটারে বাঙালী অভিনেতা

(২ আগষ্ট ১৮৪৮। ১৯ শ্রাবণ ১২৫৫)

থিয়েটর সান্সশি।

মেং বেরি সাহেব বিনয় পূর্ব্বক তাঁহার এতদ্দেশীয় বন্ধুদিগ্যে জ্ঞাত করিতেছেন যে ১০ জন বাঙ্গালি রাজা ও বাবুর সাহায্য অনুসারে বর্ত্তমান আগষ্ট মাসের ১০ তারিখে তিনি সেক্সপিয়ার কৃত অথেলোর ট্রাজেডি ও অথেলো মুর অফ বিনিস একজন এতদ্দেশীয় ব্যক্তির দ্বারা প্রসারিত করিবেন, সর্ব্ব শেষে সেক্সপিয়ারের জীবিত প্রতিমূর্ত্তি এবং তাঁহার স্বপ্নবৃত্তান্ত হইবেক, যে সকল বন্ধু মহাশয়েরা মেং বেরি সাহেবকে এতদ্ব্যাপারে সাহায্য করিবার মানস করেন তাঁহারা শীঘ্র২ আপনারদিগের বসিবার স্থানসকল গ্রহণ করিবেন যেহেতু তাহার অধিকাংশ বিলি হইয়া গিয়াছে, যাঁহারদিগের উক্ত স্থান গ্রহণের অবশ্যক হইবেক তাঁহারা পুরাতন থিয়েটরের নিকটে ওয়ালিংটন স্কোয়ারের ধারে মেং বেরি সাহেবকে পত্র লিখিবেন।

টিকিটের মূল্য।

বাক্স ৫ ষ্টাল ৩ এবং পিট দুই টাকা।

(২১ আগষ্ট ১৮৪৮। সোমবার ৭ ভাদ্র ১২৫৫)

গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পরে সান্সশশি নামক থিয়েটরে যে রূপ সমারোহ হইয়াছিল বহুদিবস হইল ঐরূপ সমারোহ হয় নাই, কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের সাহেব ও বিবি এবং এতদ্দেশীয় বাবু ও রাজাদিগের সমাগম দ্বারা নৃত্যাগারের শোভা অতিমনোরম হইয়াছিল, মেং বেরি সাহেবের অনুষ্ঠানেরও কোন ত্রুটি হয় নাই, তিনি সকল বিষয় অতি সুনিয়মে নির্ব্বাহ করিয়াছেন, এতদ্দেশীয় নর্ত্তক বাবু বৈষ্ণবচাঁদ আঢ্য ওথেলোর ভঙ্গি ও বক্তৃতার দ্বারা সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন, তিনি কোন রূপে ভীত অথবা কোন ভঙ্গি অবহেলন করেন নাই, তিনি চতুর্দ্দিগ হইতে ধন্য২ শব্দ শ্রবণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার উৎসাহ এবং সাহসও বৃদ্ধমূল হইয়াছে, যে বিবি ডেসডেমনা হইয়াছিলেন, তিনিও বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন, বিশেষতঃ ভয়ানক রুমালের ব্যাপার তিনি যে সকল ভঙ্গি দেখাইয়াছেন তাহাতে সেক্সপিয়ারের লেখার অনুরূপ যথার্থ মতেই প্রকাশ হইয়াছে।

(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৪৮। মঙ্গলবার ২৯ ভাদ্র ১২৫৫)

অদ্য রজনীযোগে সান্সশশি থিয়েটরে সেক্সপিয়ার কৃত

ওথেলোর নাটক পুনর্ব্বার হইবেক, এবং বাবু বৈষ্ণবচরণ আঢ্য পুনর্ব্বার সাধারণ সমীপে প্রকাশমান হইবেন, গত নাটকের রজনীযোগে যাঁহারা থিয়েটরে গমন করিতে পারেন নাই অদ্য তাঁহারা গমন করণে কদাচ বিরত হইবেন না, বিশেষতঃ যে সকল মহাশয়েরা বৈষ্ণবচরণ আঢ্যের বক্তৃতা ও অঙ্গ ভঙ্গিমায় দোষ দর্শন করিয়াছিলেন এবারে তাঁহারদিগের পক্ষেও নৃত্যাগারে উপস্থিত হওয়া উচিত, কারণ অদ্য তিনি সুচারুরূপে সমুদয় বিষয় সম্পন্ন করিবেন তাহার কোন সংশয় নাই, প্রথমতঃ সকল লোকেই কঠিনতর কার্য্য বিশেষে অকৃতকার্য্য হইয়া থাকেন, কিন্তু ক্রমে ব্যুৎপত্তি সহকারে তাঁহারদিগের বিলক্ষণ নিপুণতা হয়, যাহা হউক, বৈষ্ণবচরণ আঢ্য প্রথমোদ্যমে যে প্রকার সাহসের সহিত স্বীয় পারগতা দেখাইয়াছেন তাহাতে ভাবিকালে তিনি যে একজন বিখ্যাত আমিটর হইবেন তাহার কোন সন্দেহ নাই, অতএব আমরা বিনয় পূর্ব্বক সাধারণকে বিদিত করিতেছি যে তাঁহারা অদ্য সন্ধ্যার সময়ে সান্সশশি নৃত্যাগারে গমন করণে আলস্য করিবেন না।

বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী গৌড়

(১৫ জুলাই ১৮৪৮। ১ শ্রাবণ ১২৫৫)

বিজ্ঞাপন।—জিলা মালদহের অন্তঃপাতি গৌড় নামক প্রসিদ্ধ রাজধানী যাহাতে বহু বহু বাদশাহগণ বাদশাহী করিয়া গিয়াছেন সেই গৌড়ে কদমরছুল অর্থাৎ রছুলের পদ চিহ্ন যাহাকে গৌড় বাদশাহ আদি পূজ্য করিয়া গিয়াছেন সেই পদাঙ্ক প্রস্তর বর্ত্তমান বর্ষের ১৫ আষাঢ় তারিখ ডাকাইতেরা ডাকাইতি করিয়াছে, অতএব সর্ব্বসাধারণের বিদিতার্থ বিজ্ঞাপন করিতেছি যে উক্ত পরম বস্তু অথবা পদাঙ্কের তস্করদিগের অনুসন্ধান করিয়া যে কেহ জিলা দিনাজপুরের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত মৌলবী গোলাম আশগর খাঁ বাহাদুরের নিকট তত্ত্ব জ্ঞাপন করাইবেন তিনি প্রশংসিত সাহেব মৌসুফের নিকট ৫০ পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ইতি সন ১২৫৫ সাল তাং ২৬ আষাঢ়।

শ্রীরাধামোহন শর্ম্মণঃ।

বর্দ্ধমানে ব্রাহ্মসভা

(২৫ জুলাই ১৮৪৮। ১১ শ্রাবণ ১২৫৫)

আমরা সংবাদপত্র দ্বারা অবগত হইয়া অতিশয় সন্তোষ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে বর্দ্ধমানাধিপতি মহামতি মহারাজা মহাতাপচন্দ্র বাহাদুর স্বীয় রাজধানী মধ্যে এক ব্রাহ্ম্য সভা সংস্থাপন করিয়াছেন, প্রায় মাসাবধি হইল তাহার কার্য্য চলিতেছে, প্রতি রবিবারে অধীরাজ বাহাদুর আত্মীয় জনগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া উক্ত সভারোহণ করিয়া থাকেন, এবং তথায় অন্যান্য বহুলোকেরও সমাগম হয়, তত্ত্ববোধিনী সভার বিজ্ঞবর পণ্ডিত শ্রীযুত শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ মহাশয় ঐ সভায় বেদ পাঠ ও তাহার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, ব্রাহ্ম্য বিদ্যায় তিনি বিশেষ পারদর্শী, তাঁহার দ্বারা তত্ত্ববোধিনী সভার বিস্তর উপকার হইয়াছে, বর্দ্ধমানের রাজসভায় তাঁহার সংযোগ হওয়াতে আমারদিগের নিশ্চয় বিশ্বাস হইতেছে যে অধীরাজ বাহাদুরের মনোগত অভিলাষ অবশ্য সিদ্ধ হইবেক, যাহা হউক এই বঙ্গদেশের স্থানে২ বেদান্ত প্রতিপাদ্য পরমাত্মার উপাসনা ও বেদের মর্ম্ম প্রচার নিমিত্ত সভা সকল অবাদে সংস্থাপিতা হওয়াতে আমরা যেরূপ আনন্দ রসে অভিষিক্ত হইতেছি তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না,…।

প্রাচীন দিনাজপুরবাসীদের আচার-ব্যবহার

(৩১ আগষ্ট ১৮৪৮। ১৭ ভাদ্র ১২৫৫)

ভ্রমণকারী বন্ধু কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হইয়া অবিকল প্রকাশ করা গেল।

"দিনাজপুরের লোকেরদের আচার ব্যবহার রঙ্গপুরের লোকের ন্যায় প্রায় সকলাংশে সমান, এখানেও দুঃখিলোকের স্ত্রীজাতিরা চট্ পরিয়া থাকে, এবং ভদ্র পরিবারের রমণীরাও ঋতুবতী হইলে তিন দিবস চট্ বস্ত্র পরিধান করেন, স্ত্রীদিগের পরিধেয় বসন তিন প্রকার, ফোতা নামক বস্ত্র এণ্ডি নামক এক প্রকার পোকার গুটি নির্গত সূত্র দ্বারা নির্ম্মিত হয়, তাহাতে উত্তম বস্ত্র হইতে পারে, ধোকড়া অর্থাৎ কোষ্টা পাটের বস্ত্র, তাহার নাম ম্যাকুলি, তাহাতে নানা প্রকার চিত্র বিচিত্র করা, বাঁদিপোতা নামক বস্ত্র অত্যন্ত মোটা রঙ্গিল সূতায় প্রস্তুত হয়, তাহাই স্ত্রীলোকদিগের পোসাগী সুট্ এবং বুকের ওড়্না হয়।

এখানকার হিন্দুর মধ্যে অনেক জাতির বিধবা স্ত্রীলোকেরা পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়া থাকে, কিন্তু সেই বিবাহ পরের সঙ্গে প্রায় হয়না ঘরে২ সম্পন্ন হইয়া থাকে, ভাসুর অনায়াসেই ভ্রাতৃবধূকে এবং দেবর বড় ভ্রাতার

বনিতাকে উদ্বাহ করেন, তাহাতে কুলের হানি না হইয়া বরং গৌরব বৃদ্ধি হইয়া থাকে, যে সকল সতী পতিবিয়োগে পুনর্ব্বার বিবাহ করেন তাঁহারদিগের শোভা অতি মনোহর, কারণ বামহস্ত শূন্য দক্ষিণ হস্তে অলঙ্কার সতীত্বের বিষয় ইহাতেই প্রকাশ পাইতেছে, সুতরাং অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র।

এ জিলায় জলপথে দস্যুভয় নাই, এবং চুরি ডাকাইতি অতি অল্প হইয়া থাকে, দিনাজপুরের জলবাতাস অতি কদর্য্য, সর্ব্বদাই লোকের পীড়া হয়, বিশেষতঃ বর্ষাকালে রোগের অধিক প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে, আমারদিগের নৌকা প্রায় এক প্রকার হসপিটাল হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে এপর্য্যন্ত কোনরূপ বিড়ম্বনা হয় নাই।

দিনাজপুর। ২৮ শ্রাবণ ১২৫৫।

হুগলীর হরচন্দ্র ঘোষ

(৮ সেপ্টেম্বর ১৮৪৮। ২৫ ভাদ্র ১২৫৫)

"সম্পাদক মহাশয়, মালদহের বর্ত্তমান আবকারি সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এইক্ষণে অতি প্রশংসিতরূপে স্বীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, তিনি ১৮৪৪ সালের নবেম্বর মাসে বোয়ালিয়ার দ্বিতীয় শ্রেণীর সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্টের পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, পরে ৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে মালদহে আসিয়া প্রথম শ্রেণীভুক্ত হয়েন, এইস্থানে ইঁহার আগমনাবধি ক্রমশই আবকারির উৎপন্ন বৃদ্ধি হইতেছে, পূর্ব্বে বাইশ হাজার টাকার অধিক হইত না, হরচন্দ্র বাবু আসিয়া ১৮৪৬।৪৭ সালে অন্যূন পঞ্চান্ন হাজার টাকা উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং এতদ্রূপ অল্প সময়ের মধ্যে সরকারের এবম্ভূত অধিক লাভ করাতে কার্য্য কল্পে তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য ও পারদর্শিতা প্রকাশ পাইয়াছে, ঢাকা প্রদেশের পূর্ব্বতন আবকারি কমিস্তনর মহানুভব মৃত ডোনেলি সাহেব এবিষয়ে হরচন্দ্র বাবুর বিস্তর সুখ্যাতি লিখিয়াছেন, ফলতঃ তিনি যথার্থ রূপ প্রশংসা প্রাপণের যোগ্য পাত্র তাহাতে সন্দেহাভাব।···

এমত সুযোগ্য ব্যক্তির পদোন্নতি বিষয়ে রাজপুরুষেরা কিছুমাত্র বিবেচনা করেন না, যাঁহারা তাঁহার অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে অযোগ্য তাঁহারা অনায়াসেই অধিক বেতন প্রাপ্ত হয়েন, অথচ এ পর্য্যন্ত ইঁহার বেতন ২০০ টাকার অধিক হইল না,···। ১ ভাদ্র ১২৫৫।"

ডেবিড হেয়ার পুরস্কার

(২১ সেপ্টেম্বর ১৮৪৮। ৭ আশ্বিন ১২৫৫)

ডেবড হেয়ার সাহেবের স্মরণীয় মূলধনের উপস্থ হইতে কমিটির মেম্বর মহাশয়েরা পুনর্ব্বার ৭৫ টাকা ব্যয় করণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, যে কোন এতদ্দেশীয় ব্যক্তি হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে বঙ্গভাষায় উত্তম এসে অর্থাৎ প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন তাঁহাকেই উক্ত টাকা প্রদত্ত হইবেক, ঐ এসে ইংরাজী ১৮৪৯ সালের ১ মে তারিখে কমিটির সেক্রেটরী বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের নিকট পাঠাইতে হইবেক, রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু রামগোপাল ঘোষ এবং বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাহার পরীক্ষা করিবেন।

নূতন সাময়িক পত্র

(১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৪৮। মঙ্গলবার ৫ আশ্বিন ১২৫৫)

কোন বিশ্বাসি ব্যক্তির প্রমুখাৎ অবগতি হইল, এতন্নগরস্থ কতিপয় বিদ্যোৎসাহি যুবা হিন্দু চন্দ্রিকা যন্ত্র হইতে "হিন্দু ক্রোণিকেল" নামক এক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকটন করিবেন, ঐ পত্র ইংরাজী এবং বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইবেক, বোধ হয় দুর্গা পূজার পরেই প্রকাশ হইতে পারে, কারণ তদর্থে প্রায় তাবদ্বিষয় প্রস্তুত হইয়াছে, আমরা তাহার অনুষ্ঠানপত্র দৃষ্টি করিয়া তুষ্ট হইলাম, যেহেতু তাহা সদভিপ্রায় সম্বলিত ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষায় অতি উৎকৃষ্টরূপে প্ররচিত হইয়াছে, সম্পাদকদিগের মধ্যে কয়েকজনের নাম আমরা জ্ঞাত হইয়াছি, এইক্ষণে প্রকাশ করণে প্রয়োজন করে না, পত্র প্রকটিত হইলেই সকলে জানিতে পারিবেন, এতন্মাঙ্গলিক ব্যাপারের অনুষ্ঠানে সকলেই আনন্দ প্রাপ্ত হইবেন, কারণ মেং মার্সম্যান সাহেব ভগবতীর খর্পরে সমাচার দর্পণ অর্পণ করিলে তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই তর্পণ পর্য্যন্ত শেষ হইয়াছিল। বাঙ্গাল স্পেক্টেটর পত্র কিছুদিন সুনিয়মে নিষ্পাদিত হইয়া পরিশেষ উপযুক্ত রূপ সাহায্য বিরহে রহিত হইল, অপিচ জ্ঞানাঞ্জন সম্পাদক মহাশয় জ্ঞানাঞ্জন পত্রকে সজ্জনগণের মনোরঞ্জন ও নয়নাঞ্জন স্বরূপ করিতে না পারিয়া বাণিজ্য কার্য্যের বিপদ রূপ প্রভঞ্জনের প্রভাবেই পলায়ন করিলেন, সুতরাং অধুনা ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষায় একখানা পত্র

প্রচারিত থাকা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে, এবং ইহাতে সাধারণের বিশেষ সাহায্য করা অতি কর্ত্তব্য।···

কতিপয় বন্ধুর দ্বারা অবগত হইয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি ভবানীপুরস্থ কয়েকজন দেশহিতৈষি যুবক বন্ধু "জ্যোতির্ম্ময়" নামক এক খানি মাসিক পত্র প্রকাশ করণের কল্পনা করিতেছেন, ঐ পত্র কেবল সুসাধু বঙ্গভাষায় বিরচিত হইয়া উদিত হইবেক, সম্পাদকেরা নানাবিধ উত্তম২ রচনা রূপ জ্যোতির্দ্বারা "জ্যোতির্ম্ময়কে" প্রকৃত জ্যোতির্ম্ময় করণের মানস করিয়াছেন,···শুনিতেছি ভবানীপুরের "সুজন বন্ধু" যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশ হইবেক, যে মহাশয়েরা এতৎ কল্পিত বিষয়ে সংযোজিত আছেন আমরা তন্মধ্যে অনেককেই বিশিষ্টরূপেই জ্ঞাত আছি, তাঁহারা তাবতেই উপযুক্ত এবং বিদ্যা বিষয়ে অতিশয় উৎসাহি,···। এইক্ষণে সমাচার পত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে দেশ-মধ্যে কল্যাণের বীজ রোপিত হওনের বিলক্ষণ সুসময় দৃষ্টি করিতেছি, দেশস্থ লোকেরা ইহার সুফল দৃষ্টে রসাস্বাদন গ্রহণে যত যত্নশীল হইবেন ততই মঙ্গলের সম্ভাবনা, কিন্তু এতন্মধ্যে বক্তব্য এই যে ঐ সমস্ত পত্র উৎকৃষ্টতর প্রস্তাব দ্বারা পরিপূর্ণ হইলেই সুখের বিষয় স্বীকার করিতে হইবেক, নচেৎ যদি অভিনব সহযোগিগণ ঘৃণিত সম্পাদক-দিগের ন্যায় ঘৃণিত বিষয়ে আমোদি হইয়া নিয়ত কুৎসা ব্যাপার সকল বিন্যাস করিয়া প্রকাশ করেন তবেই একেবারে চিত্র করিয়া ভুলিবেন, জ্যোতির্ম্ময় সম্পাদক মহাশয়েরা এই বিষয়ের লেখ্য নহেন, যাঁহারা নিন্দাবাদে অনুরাগি শুদ্ধ তাঁহারদিগের প্রতি এই উক্তি উক্ত হইতে পারে।

গত ৩ আশ্বিন রবিবার দিবসে শ্যামপুকুর নিবাসী বাবু পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক "সংবাদ অরুণোদয়" নামক এক নূতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকটিত হইয়া সর্ব্বত্র বিতরিত হইয়াছে, আমরা তাহার প্রথম সংখ্যা পাঠানন্তর সন্তোষ সলিলে অভিষিক্ত হইলাম, যেহেতু তাহার গদ্য পদ্য উভয় রচনা সর্ব্বতোভাবে উত্তম হইয়াছে, বিশেষতঃ সুখের বিষয় এই যে আমারদিগের নবীন সহযোগী প্রকাশ্যরূপে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে আপন পত্রে নিন্দাবাদ প্রকাশ করিবেন না, সুতরাং ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে?

বনফুল

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

বিজন বিপিনে ফুটেছে সে এক নামহীন বনফুল,
নাহিক তাহার গন্ধবিভব বিখ্যাত কোন কুল।
ঠাঁই পায় নাই প্রমোদকাননে কুলীন ফুলের পাশে,
হেথা আছে তাই অনাদরে পড়ে একাকিনী বনবাসে।
ভক্ত তাহারে চয়ন করিয়া দেবে না দেবতা পায়,
প্রেমিক আদরে উপহার বলে নাহি দেবে প্রেমিকায়।
বিলাসী তাহারে যতনে আনিয়া সাজাবে না ফুলদানী,
রূপের পূজারী কবিরও দৃষ্টি পড়িবে না হোথা জানি।
কেহ তারে নিয়ে গাঁথিবে না মালা মাল্যবদল তরে,
তুচ্ছ বলিয়া নাহি কেহ লবে ফুলশয্যার ঘরে।
তবু আছে তার রূপসম্পদ সুন্দর নিরমল,
উজল বরণ নিটোল গঠন স্নিগ্ধ পেলবদল।
হয় ত তাহারে কাঠুরের মেয়ে তুলিয়া ব্যাকুল করে,
ফুল হৃদয়ে আঁদর করিয়া পরিবে খোঁপার 'পরে।
সার্থক হবে বিকশিত তার অপরূপ রূপরাশি,
বনবাস-ব্যথা যাবে সে ভুলিয়া পুলক পাথারে ভাসি।
অথবা যাবে সে অনাদরে ঝরে কানন-অন্ধকারে,
কুলমানহীন সে যে বনফুল কেহ না খুঁজিবে তারে।

সর্পিল

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রান্তরের প্রান্ত মিলিতে বেলা চারিটা বাজিয়া গেল।

গ্রামে প্রবেশ করিবার আগে পাল্কী থামাইয়া অনন্ত একবার নামিয়া পড়িল, দাঁড়াইল প্রান্তরের দিকে মুখ করিয়া। অতিক্রান্ত পথটি বহুদূর অবধি নজরে পড়ে। যে নিঃসঙ্গ বটগাছটি অনেকক্ষণ আগে ছাড়াইয়া আসিয়াছিল, এতদূর হইতে তাহার অবস্থান আরও করুণ ও রহস্যময় মনে হয়। তার পর দিগন্তে মেশানো পৃথিবীর সীমা। বেলা দশটায় যে ক্ষুদ্র ষ্টেসনটিতে সে অবতরণ করিয়াছিল, তাহাকে অনুসরণ করিয়াই যেন ওই দিগন্ত সেই ষ্টেসনটি পার হইয়া আসিয়াছে। ডাহিনে বামে অর্দ্ধচক্রাকার তরুশ্রেণী;—পাশাপাশি প্রান্তরটির বিস্তার তিন-চার মাইলের বেশী হইবে না। অদূরে প্রকাণ্ড একটা দীঘির জল চক্ চক্ করিতেছে। তাহারই তীরে কোন্ কৃষকের অস্থায়ী হোগলার ঘর। দিবারাত্রি ওই ঘরে থাকিয়া সে তাহার শস্যভরা কয়েক বিঘা পৃথিবীকে পাহারা দেয়।

করতলের ছায়ায় চক্ষুকে আশ্রয় দিয়া অনন্ত চারি দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। পত্র লিখিয়া কেতকী তাহাকে এত দূরে এমন দুর্গম গ্রামে টানিয়া আনিবে কে ভাবিয়াছিল!

কিন্তু দুর্গম গ্রামেও পাল্কী থামিল না। গ্রামবাসীর বিস্মিত দৃষ্টি ও কুকুর জাতীয় কতকগুলি জন্তুর সচীৎকার অভিনন্দন সংগ্রহ করিয়া গ্রাম ছাড়াইয়া পাল্কী জঙ্গলাকীর্ণ কাঁচা পথ ধরিল। থামিল আরও প্রায় আধ মাইল গিয়া।

কেতকীই পাল্কী বেহারা পাঠাইয়াছিল সুতরাং ভুল হইবার কথা নয়। সম্মুখেই কেতকীর আধুনিক বাসগৃহ।

কিন্তু গৃহ বলিয়া চেনা কঠিন। এ যেন রূপধরা পুরাতত্ত্ব।

সেকেলে তিনমহাল বাড়ী, একসারিতে খানচারেক ঘর ছাড়া বাকী সমস্তটাই প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এখানে দাঁড়াইয়া আছে খানিকটা ভাঙ্গা দেয়াল, ওখানে ঝুলিতেছে ছাদের একটু অংশ ও কড়িবর্গার কঙ্কাল,—যে প্রাচীর একদিন গৃহটিকে আড়াল করিয়া রাখিত তাহার চিহ্নমাত্র নাই। চারিদিকে শুধু ইঁটের স্তূপ ও আগাছার জঙ্গল। দেউড়িটা বিপজ্জনক অবস্থায় কোন মতে খাড়া আছে। দেউড়ির সামনে একটি বৃহৎ অশথ তরু বিস্তৃত ছায়া ফেলিয়া স্থানটির অস্বাভাবিক স্তব্ধতা দ্বিগুণ নিবিড় করিয়া তুলিয়াছে।

অদূরে একটি মন্দির।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় মন্দিরটি বেশী পুরাতন নয়; কিন্তু ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিলে ভুল ভাঙ্গে। বুঝিতে পারা যায়, মানুষের যে গৃহ আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে, দেবতার এই আবাসটির বয়স তার চেয়ে কম নয়। কিন্তু আজও জীর্ণতা দেখা দেয় নাই, একটি ইটও খসিয়া পড়ে নাই। কাল যেন দেবতার ভয়ে মন্দিরকে শুধু স্পর্শ করিয়া গিয়াছে, আঘাত করে নাই।

সিঁড়িটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে কীর্ত্তি কালের নয়। কত কাল ধরিয়া কত মানুষের পায়ের আঘাত সিঁড়িটা সহিয়াছে তার ঠিকানা নাই। তাহা সত্ত্বেও এখন পর্য্যন্ত মানুষ যে দেবতার কাছে পৌঁছিবার কাজে তাহাকে লাগাইতে পারে এইটুকুই আশ্চর্য্য।

নিবিষ্ট চিত্তে মন্দির দেখিবার ফাঁকে কখন কেতকী আসিয়া নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, অনন্ত টের পায় নাই। কেতকী কথা বলিতে সে একটু চমকিয়া উঠিল।

তিন বছর পরে তুমি এলে—

অনন্তের চমক লক্ষ্য করিয়া কেতকী হাসিয়া কথাটা শেষ করিল,—আর বাইরে দাঁড়িয়ে দেখছ মন্দির!

অনন্তও হাসিল। বলিল, অভ্যর্থনা করার জন্য তুমি দেউড়িতে দাঁড়িয়ে নেই দেখে রাগ হয়েছিল। কেতকী বলিল, দাঁড়িয়ে থাকতাম; কিন্তু তুমি এত আগে এসে পড়বে ভাবিনি। এখানে পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যায়।

ভাল ভাল খাবার ঘুষ পেয়ে বেহারারা উড়ে এসেছে।

ধাত্রী পান্না

শিল্পী—শ্রীযুক্ত অসিতকুমার রায়

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

COLOURED ILLUSTRATION

কিন্তু অত খাবার পাঠিয়েছিলে কেন বল ত? বেড়িয়ে আসতে যদি পাঠিয়ে থাক, তবে ওদের বিলিয়ে দিয়ে বোধ হয় অন্যায় করেছি—

বলিয়া অনন্ত হাসিতে লাগিল। কেতকী বলিল, বিলিয়ে দিয়েছ বেশ করেছ, কিন্তু নিজে পেটভরে খেয়ে নিয়েছিলে তো?

নিয়েছিলাম। আর খেতে খেতে আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছিলাম এই ভেবে যে, আমি কি খেতে ভালবাসতাম সব তোমার মনে রইল কি করে! লেবুর সরবৎটি পর্য্যন্ত তো ভোল নি?

কেতকীর মুখের পাশে রোদ পড়িয়াছিল, একটু ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু হাসিয়া সে বলিল, যেন কত জন্ম কেটে গেছে, ভোলাই উচিত! তিন বছরেই মানুষের স্মৃতি লোপ হয় এই বুঝি তোমার ধারণা? কি করে চিনলাম ভেবে তো কই আশ্চর্য্য হলে না?

অবিকল এমনিভাবে কেতকী হাসিত, এমনি ভঙ্গীতে কথা কহিত,—প্রত্যেকটি বাক্য তাহার এমন রসাত্মক লাগিত যেন এক একটি সংক্ষিপ্ত স্বতন্ত্র কাব্য।

অথচ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এত বেশী হইয়াছে যে ওই নিয়াই আর একটু হইলে সে প্রথম কথা আরম্ভ করিয়া দিত। ভারি ছেলেমানুষি শোনাইত তাহা হইলে। মনে হইত এ একটু নূতন ভাবে প্রথামত শারীরিক মানসিক কুশল প্রশ্নটিই সে করিয়াছে। তিন বছর পরে দেখা হওয়ার প্রথম দিকে অসংখ্য ছোটখাট প্রশ্নোত্তরের মধ্যে পরিবর্ত্তনের বিবরণ দাখিল করিতে কেতকীরই কি ভাল লাগিত?

কিন্তু গায়ের রঙ মলিন হইয়া দেহের গড়ন ভাঙ্গিয়া গিয়া কি চেহারাই আজ ইহার হইয়াছে? মুখে লাবণ্যের লেশ নাই, চোখ দুটি স্তিমিত।

অসময়ে গা ধুইতে গিয়া স্নান করিয়া আসিয়াছে, তবু!

এখন যে তুমি স্নান করেছ কেতকী? পূজো করবে না কি মন্দিরে?

আমি ওই মন্দিরে পূজো করব! কেতকী যেন আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

মন্দিরে পূজো হয় না?

হয়। ও করে।

এবার অনন্তের আশ্চর্য্য হইবার পালা। শঙ্কর দেব-মন্দিরে পূজা করে! সেই দেবদ্রোহী বিলাসী শঙ্কর! হঠাৎ সে কোন্ দেবতার প্রতি ভক্তি অর্জ্জন করিয়াছে?

এটা কোন্ দেবতার মন্দির কেতকী?

কেতকী মাথা নাড়িয়া বলিল, দেবমন্দির তো নয়। ওর মধ্যে দেবতা নেই।

অনন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, বিগ্রহ নেই তো শঙ্কর পূজো করে কার?

পাংশুমুখে কেতকী বলিল, কুগ্রহের পূজো করে। দুষ্টগ্রহের পূজো করে। ওর কথা বাদ দেও।

সেটা কঠিন কাজ। কেতকীর স্বামীর সম্বন্ধে এত বড় কথাটা বাদ দেওয়া যায় না। অনন্ত বলিল, কুগ্রহ দুষ্ট গ্রহের কথাটা আমায় বুঝিয়ে দাও তো, শুনি।

কেতকীর চোখ ছল ছল করিয়া আসিল, কি বোঝাব? সাতপুরুষের পাগলামি ওর কাঁধে ভর করেছে। এখানে এসে থেকে এমন ভয়ঙ্কর কালীভক্ত হয়েছে যে সে আর বলার নয়। ও মন্দিরে কালীমূর্ত্তি আছে, কিন্তু ও কালীমার পূজো করে না, নিজের পাগলামীর পূজো করে।

অনন্ত একটু ভাবিয়া বলিল, চল মা কালীকে দর্শন করে আসি।

কেতকী সভয়ে বলিল, না।

না কেন?

কেতকীর মুখ পাংশু হইয়া গিয়াছিল, ঢোঁক গিলিয়া সে বলিল, ভয় পাবে। মা কালী বলে চেনা যায় না,—মনে হয় খাঁড়া হাতে জমাট-বাঁধা অন্ধকার। দু'চোখ হীরার মত জ্বল জ্বল করছে। দিনের বেলাও মন্দিরে ভাল করে আলো যায় না—প্রদীপ জেলে দেখতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমার দু'চোখে দু'টো প্রদীপ দপ্ করে জ্বলে ওঠে। প্রথম দিন একা গিয়ে ওই দেখে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম।

কেতকী একবার শিহরিয়া উঠিল। এবং তাহাতেই তাহার শরীর ও মনের বর্ত্তমান অবস্থা অনন্তর কাছে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হইয়া গেল।

কিন্তু সে কিছুই বলিল না। কেতকীর আত্মসম্বরণের প্রক্রিয়াটা নীরবে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

চলো, ঘরে যাই,—কেতকী বলিল।

চলো।…কিন্তু চিঠিতে তুমি তো আমায় কোন খবরই দেও নি! পদে পদে অপ্রস্তুত হচ্ছি।

এ-সব কি চিঠিতে জানানোর মত খবর?

না, তা নয়। অনন্ত স্তব্ধ হইয়া গেল। এ-সব মানে যে সব খবর তার অতি সামান্যই সে জানিয়াছে, সেটুকুও চিঠিতে লেখা কেতকীর পক্ষে সত্যই অসম্ভব। এ বাড়ীর ছবি কি চিঠিতে ওঠে! কেতকীর এই শীর্ণ পাণ্ডুর মুখচ্ছবির বর্ণনা কেতকীর ভাষাতে নাই—চিঠির ভাষাতে তো একেবারেই নাই।

দেউড়ির নীচে আসিয়া কেতকী হাসিয়া বলিল, অমন করে ওপোর দিকে তাকাচ্ছ যে? আমি যখন সঙ্গে আছি ভয় নেই।

তুমি সঙ্গে থাকলে বুঝি মাথায় ইট ভেঙ্গে পড়তে পারে না?

কই আর পারে? তিন বছর এর তলা দিয়ে যাতায়াত করছি, চূণবালিও তো কোন দিন মাথায় খসে পড়েনি। জান, এ বাড়ীর বিপদ আমায় এড়িয়ে চলে।

অনন্ত থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

তবে এইখানে দাঁড়িয়ে তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি কেতকী। এ ভাঙ্গা দেউলে এসে নীড় বাঁধার প্রয়োজন হল কেন তোমাদের?

াত পুরুষের ভাঙ্গা দেউল ছাড়া মানুষ আর কোথায় শান্তি পাবে বল?

অনন্ত বিচলিতভাবে বলিল, এমন ভয়ানক শান্তির দরকার পড়ল কার? তোমার না শঙ্করের?

ওঁর। স্বামীর শান্তিতেই স্ত্রীর শান্তি।

এ কথার সত্যমিথ্যা ভগবান জানেন, অনন্ত নীরবে চলিতে আরম্ভ করিল। ইটের স্তূপ বেড়িয়া আঁকাবাঁকা সরু পথ ঘরগুলি পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে—শঙ্কর ও কেতকীর পায়ে পায়েই পথটি গড়িয়া উঠিয়াছে বোধ হয়।

অনন্ত ভাবিতে লাগিল, শঙ্করের জীবনে যে শান্তির অভাব ঘটিয়াছিল সে তো তাহা টের পায় নাই? সহরের বাস তুলিয়া দিয়া জমিদারীতে গিয়া বাস করিবে অকস্মাৎ যে সময় শঙ্কর এই সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছিল, তার কিছু কাল পূর্ব্ব হইতেই তাহার মধ্যে অনেক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছিল সত্য, কিন্তু তার কারণ যে অশান্তি এরূপ অনুমানের কোন সঙ্গত কারণই ছিল না। যে গাম্ভীর্য তাহার আসিয়াছিল তাহা ছিল প্রশান্ত, জীবনের সর্ব্ব- প্রকার অগভীর আনন্দ উৎসবে যে ক্রমবর্দ্ধমান বিমুখতা দেখা দিয়াছিল তাহা ছিল প্রশান্ত। মনে হইয়াছিল, সে ভাবিতে শিখিয়াছে। প্রত্যেক মানুষের যে একটি করিয়া নিজস্ব অন্তর্জ্জগৎ আছে ধীরে ধীরে তাহার সন্ধান পাইতেছে। অনেকের জীবনেই এ রকম ঘটে। শু বাঁচিয়া থাকার মধ্যেই এমন কতকগুলি চিরন্তন রহস্য আছে সচরাচর যাহার খবর সব মানুষ রাখে না; কিন্তু তুচ্ছ উপলক্ষ্যে হঠাৎ একদিন সেগুলি মানুষকে চিন্তিত করিয়া তোলে, বিচলিত করিয়া দেয়। শঙ্করের জীবনেও এমনি কিছু ঘটিয়াছে মনে হইয়াছিল। উপলক্ষ্যটাও কিছু কিছু সে অনুমান করিতে পারিয়াছিল বৈ কি!

সে যে শঙ্করের অশান্তির বহিঃপ্রকাশ এ কথা কিন্তু কল্পনা করাও চলে নাই।

অথচ নিদারুণ অশান্তিতেই যে তাহার দিন কাটিতে ছিল, আজ আর তাহাতে সংশয় করা যায় না। এখানে কি মানুষ বাঁচিতে পারে যে, সাধ করিয়া অকারণে এখানে সে বাসা বাঁধিয়াছে! বেশী দিন হয় নাই, কত টাকা খরচ করিয়া বাগান-ঘেরা ছবির মত বাড়ী কিনিয়াছিল, বিলাসের আয়োজনের কোন অভাব রাখে নাই। সহরের সব রকম সুখ সুবিধা সে সেখানে লাভ করিত, শিক্ষিত মার্জ্জিত নরনারীর সঙ্গ পাইত, হাসি ও সঙ্গীতে সুমধুর সন্ধ্যা যাপন করিত। আর পাইত কেতকীর ভালবাসা। এখনকার এই শীর্ণা সন্ত্রস্তা কেতকীর ভালবাসা নয়, সে যখন ছিল হাস্যমুখী কল্যাণী বধূ।

সে জীবন পিছনে ফেলিয়া আসিয়া অকারণে শঙ্কর এখানে তাহার সমাধি খুঁজিয়া নেয় নাই। আগাছা কাটাইয়া ইটের স্তূপ সরাইয়া ঘর ক'খানার একটু সংস্কার করিবার ইচ্ছারও তার এখন অভাব! আধুনিকতার আবেষ্টনী হইতে ছুটিয়া আসিয়া ধূলিসাৎ শতাব্দীর গৌরবে সে মুখ গুঁজিয়া দিয়াছে।

শঙ্করের সঙ্গে শেষ দেখা হওয়ার দিন সে যে কাণ্ড করিয়াছিল, তাহাতেই তাহাকে পাগল মনে হইয়াছিল; কিন্তু ইহার তুলনায় সে পাগলামী কত তুচ্ছ!

সে রাত্রির কথা তোমার মনে আছে কেতকী?

কোন্ রাত্রির কথা?

শঙ্করের অসুখ হয়েছিল, বিছানার দুপাশে বসে আমরা রাত জেগেছিলাম?

—পড়ে বৈ কি মনে। সে অসুখ তো আর ভাল হ'ল না। দু'মাস ছটফট করে পাগলের মত এখানে ছুটে এল।…পরদিন তোমার জাপান যাবার কথা ছিল।

অনন্ত চিন্তিতভাবে বলিল, হ্যাঁ। শঙ্কর ঘুমোলে বিদায় দিতে তুমি আমার সঙ্গে গেট পর্য্যন্ত এসেছিলে। কি র অদ্ভুত কারণ দেখিয়ে চিঠি লিখতে বারণ করেছিলে এখনো স্পষ্ট মনে আছে কেতকী।…বাকী রাতটুকু শঙ্কর ঘুমিয়েছিল?

এতদিন পরে কি প্রশ্ন!

মাথা নাড়িয়া কেতকী বলিল, না। ফিরে গিয়ে দেখি বিছানায় উঠে বসে নিজেই কপালে বরফ ঘষছে।

খুব ধীরে ধীরে হাঁটিলেও এতক্ষণে তাহারা ঘরের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছিল।

অনন্ত গলা নামাইয়া বলিল, সেদিন হঠাৎ ওর কি হয়েছিল আজও ঠিক বুঝে উঠতে পারি না কেতকী।

কেতকী বলিল, মাথার মধ্যে ভূমিকম্প হয়েছিল।

দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া অনন্ত যেন ঘরের ভিতরের দৃশ্যটা চোখে সহাইয়া নিতে লাগিল। দারিদ্র্যকে ঘরের মধ্যে সযত্নে বরণ করিয়া নেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেকটি জিনিষ যেন অভিনয় করিতেছে,—দারিদ্র্যের। তক্তপোষে কম্বলের শয্যা—কম্বলটা পুরু শালের মত দেখিতে এবং সম্ভবতঃ খুবই কোমল। ঘরের মাঝখানে বেতের একটি ক্ষুদ্র কৌচ। মেঝে জুড়িয়া ছেঁড়া বিবর্ণ গালিচা পাতা, শঙ্করই হয় ত একদিন যাহা তিন-চারশ' টাকায় কিনিয়াছিল। উত্তর দিকের দেয়াল ঘেঁষিয়া কপাটভাঙ্গা এক আলমারি বই।

খদ্দরের মোটা চাদর গায়ে জড়াইয়া এক প্রান্তে কার্পেটের আসনে সিধা হইয়া বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছে স্বয়ং শঙ্কর। ছোট করিয়া চুল ছাঁটিয়া মাথার পিছনে সে স্থূল শিখা রাখিয়াছে, কপালে আঁকিয়াছে রক্তচন্দনের স্বস্তিক।

কে, অনন্ত? বলিয়া সে ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বইটা সশব্দে বন্ধ করিয়া বলিল, তুমি আসবে আশা করি নি। তারা! তারা! কত অদ্ভুত ঘটনাই তোমার পৃথিবীতে ঘটে!

কি অভ্যর্থনা! অনন্ত হতবাক্ হইয়া গেল।

কেতকী বলিল, আমি ওকে আসবার জন্য চিঠি লিখেছিলাম।

বেশ করেছিলে, কিন্তু কথাটা সময় মত আমায় জানানো বুঝি তুমি উচিত বিবেচনা কর নি?

স্বামীর অসম্ভব গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া কেতকী হাসিয়া ফেলিল। বলিল, না। সময় মত জানালে তুমি ওকে আসতে বারণ করতে।

শঙ্কর একটা অদ্ভুত হাসি হাসিল; তারা, তারা, তোমার সন্তানকে সবাই কি ভুলই বোঝে মা! আসতে বারণ করতাম না কেতকী। অভ্যর্থনার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে আমিও সাদর আহ্বান জানাতাম। ও তোমার বাল্যবন্ধু হতে পারে; কিন্তু বেশী বয়সে কি বন্ধুত্ব হয় না? এসো অনন্ত, জুতো খুলে ঘরে এসে বোস'।

জুতা খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া অনন্ত বেতের কৌচটাতে বসিল। স্বামীর মন্তব্যের কোন জবাব না দিয়া কেতকী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি স্নান করবে?

অনন্ত বলিল, না।

বারান্দায় জল আছে, মুখ হাত ধুয়ে নাও তবে। আমি চা করিগে'। coffee খাবে?

অনন্ত বলিল, coffee!

কেতকী মৃদু হাসিয়া চলিয়া গেল। হাই তুলিয়া শঙ্কর বলিল, তারা, তারা! শুধু কফি নয় অনন্ত, কেক পাবে, পুডিং পাবে, স্যাণ্ডুইচেস্ পাবে। আর—আর একান্তই যদি খেতে চাও, কালটাল, veal, porterhouse steak সব ও তোমায় খাওয়াতে পারবে।—বলিয়া শঙ্কর মুখ বাঁকাইল।

অনন্ত হাসিয়া বলিল, কি যে তুমি বল শঙ্কর!

শঙ্কর বলিল, কি বলি! ও কি হিন্দুর মেয়ে? ও সব পারে। চা'টা খাইয়ে অর্গান বাজিয়ে ও ঠিক তোমায় গান শোনাবে, দেখো! ও না পারে কি?

অনন্ত বিস্মিত হইল। মৃদুস্বরে বলিল, ওর গান তোমার আর ভাল লাগে না শঙ্কর?

শঙ্কর তীব্রকণ্ঠে বলিল, ভাল লাগে? অপমান বোধ হয়! পঁচিশ বছর আগে এ বাড়ীর বৌ অমন গান গাইলে তার কি করা হ'ত জান? গলা টিপে গান বন্ধ করে জন্মের মত বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হ'ত। সোণাগাঁর চৌধুরী বাড়ীর বৌ, সে গাইবে প্রেমের গান!

অনন্ত সত্যই বিস্মিত হইয়া বলিল, প্রেমের গান গায়! এখানে!

শঙ্কর আনমনে আবার বইটা খুলিয়াছিল, কম্পিত হস্তে কয়েকটা পাতা উল্টাইয়া বলিল, ও যখন গান ধরে অনন্ত, এ ঘরের দেয়ালে দেয়ালে ক্রুদ্ধ মুখ দেখা দেয়। সব মুখ আমার চেনা। বাবার মুখ ওই ওখানে ফুটে ওঠে,—আঙ্গুল বাড়াইয়া দক্ষিণের দেয়ালের একটা অনির্দ্দিষ্ট স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, সে কি ভর্ৎসনা তাদের চোখে অনন্ত, একটু তাকিয়ে থাকলে আপনা থেকে মাথা নীচু হয়ে যায়। সাদা ঠোঁট নেড়ে ফিস্ ফিস্ করে তারা আমাকে বলে, কুলাঙ্গার! কুলাঙ্গার!

অনন্ত প্রত্যেকটি দেয়ালে দৃষ্টি বুলাইয়া আনিল। কিই-বা দেখিবার আছে দেয়ালে? শ্যাওলা-ধরা দেওয়ালের উপর চুণকাম করার ফলে যে আবছা অদ্ভুত চিত্রগুলি দেয়ালের গায়ে ফুটিয়া আছে, মানুষের মুখের সঙ্গে তাহাদের কোন সাদৃশ্যই আবিষ্কার করা যায় না।

তবু যেন শঙ্করের পাগলামীতে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়। বলা কি যায়! শঙ্করের মুখেই তাহার পিতৃপুরুষের ইতিহাস সে শুনিয়াছে। আত্মার তৃপ্তি বলিতে যাহা বোঝায় তার সঙ্গে সেই মানুষগুলির সুদূরতম পরিচয়ও ছিল না! কেতকীর গানের অপমানে জাগিয়া উঠিয়া তাহারা যদি কোন ঘরের দেয়ালে ভ্রূকুটিভরা মুখে উঁকি দিতে পারে—এ ঘরের দেয়ালে দেওয়াই সম্ভব।

শঙ্কর একাগ্র দৃষ্টিতে অনন্তকে দেখিতেছিল, হঠাৎ কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তিত করিয়া বলিল, এ' কথাটা ওকে বোলো না ভাই, ভয় পাবে। ও ভারি ভীরু।

তা জানি।

করে কি জান? রাত্রে উঠে এসে জানালা দিয়ে আমায় দেখে যায়। আমি বেঁচে আছি এইটুকু জানলেই যেন ওর ভয় কমে!

অনন্ত শঙ্কিত হইয়া বলিল, রাত্রে ও একা থাকে না কি?

থাকে বৈ কি, ওর মহাল যে ভিন্ন।

অনন্ত বুঝিতে না পারিয়া বলিল, মহাল কি?

শঙ্কর আশ্চর্য্য হইয়া গেল,—মহাল জানো না!—আচ্ছা বলি তোমায় বুঝিয়ে। এ চৌধুরী বংশের কেউ কোন দি স্ত্রীর আঁচল পেতে ঘুমোয় নি ভাই। সে দীনতা এ বংশ রক্তে নেই। নিজের মহলে এ বাড়ীর বৌ প্রদীপ জেলে রা কাঁটিয়েছে চিরদিন,—স্বামীর খুসী হলে দর্শন দিয়েছে, খু না হলে দেয় নি।

অনন্ত গম্ভীর ভাবে বলিল, স্ত্রীকে ভালবাসা এ বংশ রীতি নয়, না?

নাঃ, বলিয়া শঙ্কর হাসিল।—মেয়ে-মানুষকে আ জয় করি, তার সঙ্গে হৃদয় বিনিময়ের কারবার করি না জানো, আমার এক পূর্ব্বপুরুষ রাজা ছিলেন। নি হৃদয়ে রাজত্ব করতে না পারলে আর রাজবংশে জ কেন?

সাবান ও তোয়ালে দিতে কেতকী যে দুয়ারের কা আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কেহই তাহা লক্ষ্য করে নাই নজর পড়িতে শঙ্কর একটু দমিয়া গেল।

কেতকী মৃদুস্বরে বলিল, নিজের হৃদয়-রাজ্য থেকে রাজস্ব তুমি বৎসরান্তে সংগ্রহ কর শুনতে পাই কি?

শঙ্কর নরম সুরে বলিল, শুনলে বুঝি আমার কথা না, সব শুনি নি। যেটুকু শুনেছি তাই ঢের। একটা কথা তুমি জেনে রেখো, যে রাজ্যে শুধু বাণি করছে, তার অধিকার নিয়ে কোন মেয়েমানুষ আজ প মারামারি করেনি। এই বলিয়া সে আপন মনে হাসিল। শঙ্করকে কঠিন কথা বলিতে পারিলে যে তৃপ্তি পায়, অনন্তর কাছে তাহা আর গোপন রহিল না।

এ যেন তাহারি দুর্গতি এমনি ব্যথা বোধ হয়। শঙ্কর আঘাত করা চিরদিন কেতকীর আয়ত্তাতীতই ছিল, নি স্বামীকে ঘা দিয়া সে আজ হাসিতে পারে!

অনন্ত একটা নিশ্বাস চাপিয়া গেল।

কেতকী অনন্তকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, বাথ কাছে সাবান আর তোয়ালে রইল। মুখ হাত ধো এস। তোমার সুটকেশের চাবিটা দাও, কাপড়-জামা করে দি'।

চাবি নিয়া কেতকী চলিয়া গেলে শঙ্করের দুই হা

দশটা আঙ্গুল সজোরে পরস্পরকে আঁকড়াইয়া ধরিল। হতাশ ভাবে সে বলিল, দেখলে অনন্ত! চোখ রাঙ্গিয়ে চলে গেল, ধমক দিতে পারলাম না। দেখলে!

অনন্ত চুপ করিয়া রহিল।

চৌধুরী বংশের ছেলে আমি, স্ত্রীর কড়া কথা চুপচাপ সহ্য করলাম! তারা! তারা! কি লজ্জাই আমার কপালে লিখেছিলি মা?

একটা অদ্ভুত স্তব্ধতার মধ্যে সন্ধ্যা নামিয়া আসে।

পূবের জানালার শিক ধরিয়া কেতকী বহুক্ষণ নিশ্চল নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। যে গ্রামের ভিতর দিয়া এখানে আসিতেছিল তার চেয়ে কাছে বোধ হয় অন্য গ্রাম আছে, অনেকগুলি কুকুরের ডাক অস্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। বিকালে যে ঠাণ্ডা বাতাসটি বহিতেছিল হঠাৎ কখন তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে খেয়াল থাকে না। মনের মধ্যে শুধু পাক খায় শৃঙ্খলাহীন অবাস্তব চিন্তা।

তিন বছর ধরিয়া বান্ধবী ও বন্ধু যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাহা যেন ঠিক ধারণা করিয়া উঠিতে পারা যায় না।

কেতকীর চুলে যে মড়ক লাগিয়াছে খানিক আগে অনন্ত তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল। কি আগুন জ্বলিতেছে ওর মাথায় কে জানে? তালু কতখানি তপ্ত হইয়া ওঠায় চুল ঝরিয়া পড়িতেছে, মাথায় হাত দিয়া তাহা অনুভব করিবার জন্য হঠাৎ একসময় অনন্তর মন কেমন করিয়া ওঠে। কিশোর বয়সে কেতকী একদিন তাহার পায়ে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়াছিল। অনেক দিনের কথা। কেন প্রণাম করিয়াছিল আজ মনে পড়ে না, বোধ হয় কোন কারণ ছিল না। কিন্তু আশীর্ব্বাদ করিতে সেদিন যে খেয়াল থাকে নাই, সে কথাটা স্পষ্টই মনে পড়ে। বিদায় নেওয়ার সময় এবার যদি কেতকী প্রণাম করে—অকারণেই প্রণাম করে—প্রণাম করিতে হয় বলিয়া নয়,—মাথায় হাত রাখিয়া সে আশীর্ব্বাদ করিবে।

কিন্তু কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে?

ইহার কল্যাণের কোন্ পথটা আজ খোলা আছে? মনে মনেও কোন আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিলে আজ ব্যঙ্গের মত শোনাইবে না?

কেতকী কথা কহিল।

সূর্য্য ডুবতে ডুবতে না ডুবতে পূব দিকে কি মেঘ করে এল দ্যাখো! রাত্রে বোধ হয় খুব ঝড় হবে। কি ধুমসো কালো মেঘ!

অনন্ত বলিল, ঝড় হবে বলছ কেন? শুধু বৃষ্টিও তো হতে পারে!

কেতকী মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া বলিল, তা নিশ্চয় পারে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ঝড় হবে। তা ছাড়া কি গুমোট করেছে দেখেছ? আমি রীতিমত ঘামছি।

কাণ পাতিয়া শুনিয়া বলিল, বাইরে কারা কথা বলছে?

দেখি—

বাহিরে গিয়া অনন্ত দেখিল শঙ্কর বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে, বারান্দার নীচে যুক্তকরে দু'জন কৃষকশ্রেণীর লোক। একজন একটি হৃষ্টপুষ্ট পাঁঠার গলরজ্জু ধরিয়া আছে।

শঙ্কর আপনা হইতে বলিল, রাত্রে মার কাছে বলি হবে অনন্ত। জোড়া পাঁঠা বলি দেওয়াই নিয়ম, কিন্তু বলির কথা সারাদিন স্রেফ্ ভুলেছিলাম, অসময়ে লোক পাঠিয়ে একটার বেশী পাওয়া গেল না। সমস্ত রাত্রি আজ পূজো করব।

কালী পূজা?

শঙ্কর প্রশান্ত হাসি হাসিল,—তোমরা বেটিকে কালী বলেই জানো, আমরা বলি শক্তি। যার মহাপ্রলয়ের শক্তির সংযমে সৃষ্টির স্থিতি। এক স্তনে বিষ সঞ্চিত রেখে অন্য স্তনের অমৃতে যে জগৎকে পালন করছে।

ওই পাঁঠাটিকে ছাড়া।

মহাজ্ঞানীর মত মুখ করিয়া শঙ্কর বলিল, ধ্বংস তুমি চেনো না অনন্ত, মৃত্যুর স্বরূপ কিছুমাত্র বোঝ' না। মার ভাণ্ডার থেকে কি কিছু হারায়? যে পোকাটিকে তুমি না জেনে পায়ের নীচে পিষে দেও, সেও না। আজ পাঁঠাটির বলি হবে, কাল কি মা আমার ওকে পালন করবেন না?

বলিয়া বারান্দার নীচে নামিয়া শঙ্কর যেন সস্নেহেই পাঁঠাটির গলদেশ চুলকাইয়া দিতে লাগিল।

ক্ষণকাল নীরবে তাহার কাণ্ড দেখিয়া অনন্ত প্রশ্ন করিল, কিন্তু একাদশীর দিন কি কালীপূজো হয়?

TIGHT BINDING

মার পূজার আবার তিথি অতিথি কিহে সাহেব? মুখ না ফিরাইয়াই শঙ্কর এই জবাব দিল।

তা বটে!

অনন্ত কেতকীর ঘরে ফিরিয়া গেল।

শঙ্কর কি পাগল হয়ে গেছে কেতকী?

কেতকী জানালা ছাড়িয়া নড়ে নাই—এই সুস্পষ্ট প্রশ্নে বিচলিত ভাবে সে ঘুরিয়া দাড়াইল।

তা তো জানি নে। আমার মনে হয় ওঁর রক্তে এই বিকার ছিল, হঠাৎ একদিন প্রকাশ পেয়েছে। এখানে আসবার আগে আমি একটা পার্টি দিয়েছিলাম। একটা দরকারী কথা শুনতে আমায় তেতালার সেই ছোট ঘরে ডেকে নিয়ে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিল। সেই আমার প্রথম শাস্তি। পরে আর কাঁদি নি, সেদিন কেঁদেছিলাম, আর ভেবেছিলাম জাপান কতদূর?

অনন্ত মৃদুস্বরে বলিল, বোস কেতকী। বসে বল।

কেতকী বসিয়া বলিল, তুমি তো ছিলে না, শেষ দু'মাসের ইতিহাস শোন। দু'দিন তিনদিন অন্তর রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখে আঁতকে জেগে উঠত। কাঁপতে কাঁপতে বলত, কেতকী ওঠো, আলো জ্বালো শীগগির। রক্তে আমি নেয়ে উঠেছি। ধড়মড় করে উঠে আলো জ্বালতাম। দেখতাম, ঘামে ওর সর্ব্বাঙ্গ ভেসে গেছে। স্বপ্নের কথা বলতে গিয়ে ও বার বার শিউরে উঠত। গগন-ছোঁয়া কালী-মূর্ত্তি, প্রকাণ্ড জিভ বুকে এলিয়ে পড়েছে, দু'ক'ষ বেয়ে স্রোতের মত রক্ত ঝরছে—এর পায়ের কাছে স্বপ্নে ও দিত নরবলি!

কেতকী জানালার কাছে সরিয়া গেল। তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িতেছিল। বাহিরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, সেই থেকে আমায় এখানে এনে ফেলেছে। একটা ঝিকে পর্য্যন্ত কাছে থাকতে দেয় না, এক-একদিন রাত্রে আমার এমন ভয় করে!—যে তাড়াতাড়ি মেঘ বাড়ছে রাত্রে না জানি কি ঝড় বৃষ্টিই হবে!

অনন্ত বলিল, ঝড় বৃষ্টি হওয়া আর আশ্চর্য্য কি।

আশ্বিনের ঝড় কালবৈশাখীর চেয়ে ভয়ানক হতে পারে, তা জানো?

সুরটি তাহার একটু melo-dramatic। আগামী ঝড়ের চিন্তা যে তাহাকে বিশেষ বিচলিত করিয়াছে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

অনন্ত সহজ ভাবে বলিল, তা নিশ্চয় পারে। কিন্তু তোমাদের বাড়ীতে কি সন্ধ্যাদীপ জ্বলে না? অন্ধকার হয়ে গেল যে!

কে জ্বালবে সন্ধ্যাদীপ? আমি? কাজ নেই সন্ধ্যাকে অমন লজ্জা দিয়ে! বলিয়া কেতকী হাসিল, চাকর লণ্ঠন জেলে আনছে।

চাকর বোধ হয় ওই কাজেই ব্যাপৃত ছিল, অল্পক্ষণ পরেই ঘরে আলো দিয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে কি পরিবর্ত্তন যে ঘটিয়া গেল বলিবার নয়। ঘর আলো হওয়ামাত্র বাহিরের অন্ধকার গাঢ় হইয়া ধ্বংসপুরীকে নিজের মধ্যে যেন সম্পূর্ণ লুপ্ত করিয়া দিল। অনন্তর মনে হইল একটা বিশ্রী দুঃস্বপ্নের শেষে কেতকীর তিন বৎসর পূর্ব্বেকার ঘরখানাতেই সে জাগিয়া উঠিয়াছে;—এ ঘরের চারিদিকে ভাঙ্গা ইঁটের স্তূপ নাই, আগাছার জঙ্গল নাই, আছে ফুলের বাগান এবং বাগানের শেষে সহরের জনবহুল আলোকিত পথ।

পাশের ঘরে বাসনপত্র নাড়াচাড়ার শব্দ পাওয়া যাইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর ও চাকর দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল।

আমরা যাচ্ছি মা।

কেতকী বলিল, সব ভাল করে ঢেকে রেখেছ ঠাকুর? আচ্ছা, একটু দাঁড়াও।

—অনন্তর দিকে চাহিয়া বলিল, খেয়ে নিয়ে তুমিও এদের সঙ্গে চলে যাও। কাছারি-বাড়ীতে এরা তোমার শোবার ব্যবস্থা করে দেবে।

অনন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, কেন? এখানে শোবার ঘর নেই?

আছে। কিন্তু তুমি যাও। এই ভাঙ্গা বাড়ীতে রাত কাটাবে কোন্ দুঃখে?

কেতকীর পাংশু-মুখের দিকে চাহিয়া অনন্ত হাসিয়া বলিল, বেচারীরা ভয়ে ভয়ে চারি দিকে চাইছে, দরকার না থাকলে ওদের ছুটি দাও কেতকী।

তুমি যাবে না?

তুমি যদি যাও, যেতে পারি। যাবে?

কেতকী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আচ্ছা, তোমরা যাও ঠাকুর।

অনুমতি পাওয়ামাত্র তাহারা এমনভাবে প্রস্থান করিল যে অনন্ত হাসি চাপিতে পারিল না।

কেতকী ম্লান মুখে বলিল, তুমি হাসছো, আমার যা হচ্ছে ভগবান জানেন। কি থম্‌থম্ করছে চারিদিক!

অনন্ত হাসি বন্ধ করিল।

হাসা তাহার উচিত হয় নাই।

বাজনা নাই, ভক্তের কোলাহল নাই, একক পুরোহিতের নীরব পূজা। রাত্রির সঙ্গে গুমোট বাড়িয়াছে। তারার জগতে এখন মেঘের পরিপূর্ণ অমাবস্যা। কোথাও যেন শব্দ নাই, জীবনের স্পন্দন নাই, নিশ্চল পাষাণ মূর্ত্তির সামনে ধ্যানস্থ ভক্তের মত সমস্ত জগৎ যেন একটা ভয়ঙ্কর অবরুদ্ধ শক্তির মুক্তি পাইবার প্রতীক্ষায় সমাধি পাইয়াছে।

মাঝে মাঝে এক একটা রাত্রিচর পাখী ডাকিয়া ওঠে, বটগাছে দু'টি তক্ষক পালা করিয়া বীভৎস আর্ত্তনাদ করে, মন্দিরের গায়ে ছোট ছোট চতুষ্কোণ ফাঁকগুলিতে যে বন্য কপোতেরা আশ্রয় লইয়াছে, তাহারা পাখা ঝাপটায়, মন্দিরের পিছনে জঙ্গলাকীর্ণ শুষ্কপ্রায় দীঘিতে ছপ্ ছপ্ করিয়া কি যেন হাঁটে। একটা বড় গুবরে পোকা দেবীকে ঘিরিয়া বোঁ বোঁ করিয়া পাক্ খাইতে খাইতে বারকয়েক এক দিকের দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া মেঝেতে পড়িয়া যায়। কিন্তু এই সব বিচিত্র শব্দে ও অবিশ্রান্ত ঝিঁ ঝিঁ'র ডাকে স্তব্ধতা বাড়ে বই কমে না।

শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া অনন্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল! দেবীকে দক্ষিণে রাখিয়া সে পাশাপাশি হইয়া বসিয়াছে, ঠোঁটে মৃদু মৃদু হাসির আভাস, অর্দ্ধনিমীলিত চোখে স্তিমিত চাহনি। প্রশস্ত কপালে যেন অনুর্ব্বর প্রান্তরের কঠোরতা। বলি হইয়া গিয়াছিল, প্রতিমার সামনে ছিন্ন ছাগমুণ্ডের নৈবেদ্য ও একপাত্র শোণিতের পানীয়। প্রতিমার চোখদুটি আগুনের মত জ্বলিতেছে, কিন্তু রক্ত তিনি একবিন্দুও পান করেন নাই। শঙ্করের কপালেই একটি রক্তের ফোঁটা জমাট বাঁধিয়া আছে।

জামার হাতায় টান পড়িতে অনন্ত সচেতন হইয়া উঠিল। চাহিয়া ছাখে, কেতকী কাঁপিতেছে।

চলে এসো। আমার ভয় করছে।

কথাটা শঙ্করের কাণে গেল।

ভয় করছে কেতকী? মার কাছে অভয় প্রার্থনা কর।

পুনরায় অনন্তকে টানিয়া কেতকী বলিল, এসো।

শঙ্কর বলিল, মাকে প্রণাম করে যাও কেতকী। এসো, মার মাথার সিঁদুর তোমায় পরিয়ে দিই। মার দয়ায় সব ভয় ভুলে যাবে। মা আমার সকলকে ক্ষমা করেন—সকলকে।

এ যেন ছাগশিশুর চেয়ে অসহায়ের উপর হত্যার চেয়ে নিষ্ঠুর অত্যাচার। কেতকী গলায় আঁচল জড়াইয়া প্রণাম করিতে যাইতেছিল, অনন্ত তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। বলিল, মনে মনে প্রণাম কোরো কেতকী। মা মনের প্রণামেই খুসী হন। চলো।

আলোটা তুলিয়া নিয়া কেতকীর হাত ধরিয়া অনন্ত সাবধানে ভাঙ্গা সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিল। দুজনে একসঙ্গে নামার মধ্যে যে বিপদ বেশী, এ খেয়াল তাহার ছিল না।

কিই বা এমন বিপদ? তিন হাত নীচে আছাড় খাইলে মানুষ মরে না।

সাপের কামড়ে বরং মরিলেও মরিতে পারে।

দেউড়ির নীচে তিন চার হাত লম্বা একটা কালো মোটা সাপ টান হইয়া শুইয়া ছিল, আলো চোখে পড়িতে আধ হাত উঁচু ফণা তুলিয়া স্থির হইয়া রহিল।

দুজনে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কেতকী ফিস ফিস করিয়া বলিল, নড়ো না, আলো নেড়ো না। ছুটে এসে ছোবল দেবে।

অনন্ত নড়িল না, আলোও নাড়িল না, মৃদুস্বরে বলিল, এই ভদ্রলোকটির সন্ধানেই চারি দিকে চঞ্চলভাবে তাকাচ্ছিলে বুঝি? আমি ভাবছিলাম মন্দির থেকে নেমে এসেও তোমার ভয় কমে নি। কতক্ষণ পুতুল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে উনি পথ দেবেন?

দু'এক মিনিট।

অভিজ্ঞতা আছে দেখছি। কিন্তু কেতকী, এ বাড়ীর এইসব বিপদও কি তিন বছর ধরে তোমায় এড়িয়ে চলেছে?

কেতকী মৃদু হাসিল, সাপ আর বিপদ কি!

সাপ যে বিপদ নয় সঙ্গে সঙ্গেই সে প্রমাণ পাওয়া গেল। কেতকীর দুই হাতের মধ্য দিয়া ওমনি মোটা আর একটি সাপ সঙ্গীর কাছে আগাইয়া গেল।

কেতকী বলিল, ওর বৌ। ভারি শান্ত।

তা দেখতেই পাচ্ছি। এখানকার যমরাজাও ভারি শান্ত। স্বামীর গায়ের উপর দিয়া পিছলাইয়া গিয়া শান্ত সর্পবধূ একটা ইঁটের স্তূপে ঢুকিয়া পড়িল। ফণা নামাইয়া স্বামীটিও তাহাকে অনুসরণ করিল।

কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে পুনর্ম্মিলন বেচারীর অদৃষ্টে ছিল না। ইঁটের স্তূপের কাছে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই একটা আস্ত ইঁট কুড়াইয়া নিয়া অনন্ত সামনে আগাইয়া গেল এবং সাপের মাথা লক্ষ্য করিয়া সজোরে ইঁটটা ছুঁড়িয়া মারিল।

শিহরিয়া কেতকী অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, এ কি করলে?

অনন্তর তখন কথা কহিবার সময় ছিল না। ইঁটের আঘাতে ফণার খানিক নীচে মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সাপটা ওলোট-পালোট খাইতেছিল, একটির পর একটি ইঁট তুলিয়া অনন্ত ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল। সাপের ফণা ছেঁচিয়া গেল, রক্তাক্ত দেহটা একবার দড়ির মত পাকাইয়া গিয়া আর নড়িল না, লেজের দিকটা শুধু এদিক ওদিক আন্দোলিত হইতে লাগিল।

অনন্ত হাত ঝাড়িয়া বলিল, যাক্। এবার ওর শান্ত বৌটা বাকী রইল।

কেতকী ধরা গলায় বলিল, কেন মারলে?

—সাপ মারতে হয় কেতকী। বেঁচে থাকতে হলে ভাঙ্গা বাড়ীর সংস্কার করার মত এও অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য।

—তাই বলে ইঁট দিয়ে কেউ অতবড় সাপ মারে! যদি না লাগত? চোখের পলকে তাহলে—কেতকী শিহরিয়া উঠিল।

অনন্ত হাসিয়া বলিল, সাপটা মরে গেছে, না লাগার কথা এখন আর ওঠে না। কিন্তু প্রথমবার তুমি যে 'এ কি করলে' বলে চেঁচিয়ে উঠলে সে তো আমার বিপদের কথা ভেবে নয়?

কেতকী বলিল, ওঁর নিষেধ ছিল। একজন চাকর একবার এতটুকু একটা বাচ্চা সাপ মেরেছিল, চাবকিয়ে উনি তার পিঠের কিছু রাখেন্ নি। আজও বোধ হয় বেচারীর পিঠে দাগ আছে। ওঁর মতে,—মা কালীর ডাকিনী যোগিনীরা এ বাড়ীতে সাপ হয়ে আছে—মারলে মহাপাপ হয়, অকল্যাণ হয়, সর্ব্বনাশ নয়।

অনন্ত শান্ত ভাবে বলিল, আমিও ওই রকম কিছু অনুমান করছিলাম কেতকী। সেই জন্যই তো মারলাম।

কেতকীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। অস্ফুটস্বরে সে বলিল, সেই জন্য মারলে?

তবে যে বললে সাপ মারতে হয় বলেই—

সাপ মারতে হয়, কিন্তু ইঁট দিয়ে আমি সাপ মারি না কেতকী। বিপজ্জনক অভ্যাস। লাটি খুঁজি। সেই অবসরে সাপ যদি পালায় একটুও দুঃখিত হই না।

তবে? আজ কি জন্যে এমন করলে? কি বুঝেছ তুমি?

লণ্ঠনের আলোর ব্যাপ্তি আর কতটুকু, চারি দিকের গাঢ় অন্ধকারের হিংসায় এ যেন ক্ষুদ্র অক্ষম ভালবাসা। অনন্ত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে বলিল, আমি কিছু বুঝি নি কেতকী। এই ভাঙ্গা বাড়ীর প্রেম শঙ্করকে কেন পাগল করল সে কি বোঝা যায়! সাপ আর ইঁটের স্তূপের জন্য ওর তো একবিন্দু মমতা থাকার কথা নয়!

কেতকী সহসা হাসিল, না, তা থাকার কথা নয়। ও আরও অনেকদিন বাঁচতে চায়।

অনন্ত বলিল, তা জানি। তাই ওর ঘরে কার্ব্বলিকের গন্ধ পেয়েছিলাম।

ঝড়ের সম্ভাবনা দেখলে ও তাই সারারাত মন্দিরে পূজো করে।

কেতকী প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করিল।

খাবে চল। আলোটা দাও, আমি আগে যাই।

অনন্ত তাহার হাতে আলো দিল, কিন্তু চলিতে আরম্ভ করিল তাহাকে পিছনে রাখিয়া। বলিল, সাপের শান্ত বৌটি যদি স্বামী-হত্যার প্রতিশোধ নিতে চায় আমার ওপরে নেওয়াই উচিত কেতকী। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—

কেতকী বলিল, এসব অলুক্ষুণে কথা বলা কেন? কাল তুমি ভালয় ভালয় ফিরে যেও বাবু।

ঝড় ওঠে শেষরাত্রে।

কেতকী যে বলিয়াছিল আশ্বিনের ঝড় কালবৈশাখীর চেয়ে প্রবল হইতে পারে, ঝড়ের প্রথম ঝাপটার পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাহার সত্যতা প্রমাণিত হইয়া যায়।

অনন্তকে শেষরাত্রে রওনা হইতে হইয়াছিল, সারাদিন গাড়ীতে পাল্কীতে কাটিয়াছে। শুইতেও প্রায় বারোটা বাজিয়া গিয়াছিল। ঘুম যেন চোখ ছাড়িয়া নড়িতে চাহে না। অথচ প্রকৃতির এই তাণ্ডবলীলার মধ্যে ঘুমানোও অসম্ভব। নিদ্রামিশ্রিত নিস্তেজ জাগরণে কিছুই ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় না, কেমন একটা গুরুভার আতঙ্ক বুকে চাপিয়া থাকে। চারি দিক হইতে যেন ভয়ানক একটা বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে, অথচ এমনি অবশ অসহায় অবস্থা যে, প্রতিকারের জন্য আঙ্গুলটিও তুলিতে পারা যাইবে না।

কি যেন ঘটিবে,—ঘটিল বলিয়া! এক অজানা শত্রুর বিলম্বিত প্রতিশোধ কোন্ দিক দিয়া যেন আঘাত করিবে। ভিজা মাটির সোঁদা গন্ধে যেন তাহার হিংসার আভাস মেলে, দেয়ালে দেয়ালে তাহারই সহস্র ক্রুদ্ধ করাঘাতের শব্দ শোনা যায়।

সহসা প্রবল আঘাতে অনন্ত পূর্ণমাত্রায় সচেতন হইয়া ওঠে। কতক্ষণের জন্য তাহায় মনে হয় কে যেন সত্যই তাহার বুকে সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করিয়াছে—একটা পাঁজরও আর আস্ত নাই। নিশ্বাস টানিবার শক্তি খানিকক্ষণ তাহার থাকে না—হাঁ করিয়া আস্তে আস্তে সে হাঁপাইতে থাকে। সামান্য বাতাসটুকু ভিতরে নিতে গিয়াই বুকের পাঁজরগুলি তাহার টন টন করিয়া ওঠে। অস্ফুটস্বরে সে কাতরাইতে আরম্ভ করিয়া দেয়।

কিন্তু বেশীক্ষণ এ ভাবে পড়িয়া থাকা যায় না। দেশলাইয়ের সন্ধানে বিছানা হাতড়াইয়া সে অনুভব করে ধূলা ও কাঁকরে বিছানা ভরিয়া গিয়াছে এবং পাশেই পড়িয়া আছে চূণ সুরকির চাপড়া লাগানো একটি আস্ত টালি। বুকের বেদনা বিস্মৃত হইয়া সে ত্বরিদ্বেগে উঠিয়া বসে। এবার আর তাহার বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, দেয়ালে দেয়ালে যে আর্ত্তবিলাপ আরম্ভ হইয়াছে, সে শুধু বাতাসের কান্না নয়, ওর মধ্যে মিশিয়া আছে প্রত্যেকটি ইঁটের মুক্তি পাইবার শব্দিত ব্যাকুলতা।

দিয়াশালাই খুঁজিয়া লইয়া কম্পিত হস্তে অনন্ত একটা কাঠি জ্বালিল। দুয়ারের অবস্থান দেখিয়া লইয়া কাঠিটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া সে চৌকী হইতে নামিয়া পড়ে।

দরজার বাহিরে পাগলা হাওয়া বারিকণা লইয়া যে খেলা খেলিতেছিল তাহার বর্ণনা হয় না। সমস্ত অন্ধকার যেন সে উন্মত্ত খেলায় আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে। এমন ঝড়-বাদল অনন্ত জীবনে আর ছাখে নাই। পায়ে ভর দিয়া দাঁড়ানো অবধি বুকের ভিতর আবার অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছিল, দেয়াল ধরিয়া ধরিয়া অনন্ত অতি কষ্টে আগাইয়া যায়। মাঝে একখানা ঘরের পরেই কেতকীর ঘর—এই সামান্য দূরত্বটুকু যেন আর অতিক্রম করা যায় না। অনন্ত সজোরে দাঁতে দাঁত কামড়াইয়া ধরে।

অবশেষে কেতকীর দরজাটা হাতে ঠেকে। বিদ্যুৎ ক্রমাগতই চমকাইতেছিল, অনন্ত লক্ষ্য করে বাহির হইতে দরজায় শিকল তোলা রহিয়াছে।

পতনোন্মুখ গৃহ ত্যাগ করিয়া কেতকী মন্দিরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে—এ কথা ভাবিয়া প্রথমটা অনন্ত পরম স্বস্তি বোধ করে। কেতকী ঘুমাইয়া থাকিলে চারি দিকের এই প্রচণ্ড শব্দের মধ্যে তাহাকে ডাকিয়া তোলা সহজ হইত না। দরজায় ধাক্কা দিয়া লাভ ছিল না, বাতাস বহুক্ষণ ধরিয়া বীরবিক্রমে সে কাজ করিতেছে। নিজের কানে পৌঁছিবার মত শব্দও বোধ হয় তাহার ফুসফুসে এখন নাই। কিন্তু যেমন করিয়াই হোক কেতকীকে ডাকিয়া তুলিতে হইত;—এই ঝড়ে এখানে থাকা অসম্ভব। এ ভালই হইয়াছে যে সে আপনা হইতে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজিয়া নিয়াছে।

কিন্তু তাহাকে একবার না ডাকিয়াই কেতকী চলিয়া গেল? ঝড়ের সম্ভাবনা দেখিয়া সন্ধ্যাবেলা ঠাকুর চাকরের সঙ্গে তাহাকে গ্রামে পাঠাইয়া দিবার জন্য যে অমন ব্যাকুল হইয়াছিল?

অনন্ত শিকল খুলিয়া ফেলে। বাতাসের ধাক্কায় দুই পাট দরজা আছড়াইয়া খুলিয়া যায়।

ঘরের কোণে আলো জ্বলিতেছিল, বাতাসে নিভিয়া যায় নাই। অনন্ত দেখিতে পায় আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়া কেতকী বোধ হয় নিরুদ্বেগে ঘুমাইয়াই আছে, আড়াআড়ি ভাবে তাহার বুকের উপর পড়িয়া একটা স্থূল কড়ি-কাঠ।

ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া রাখিয়া কেতকী যে এমন-ভাবে ঘুমাইয়া পড়ে নাই বুঝিতে অনন্তর কষ্ট হয় না। অনেক টানাটানি করিয়াও বাহির হইতে শিকল লাগানো দুয়ারটা যখন সে খুলিতে পারে নাই, তখনই এ ভাবে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়াছে।

কাছে গিয়া অনন্ত দুই হাতে কড়ি-কাঠটা ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিয়া দেয়।

সকালে ঝড় কমে কিন্তু থামে না।

রক্তবর্ণ চোখ মেলিয়া শঙ্কর বহুক্ষণ ইষ্টকস্তূপের নীচে অর্দ্ধাবৃত দেহাংশ দুটির দিকে চাহিয়া থাকে। তার পর একটা ভাঙ্গা ঝুড়ি খুঁজিয়া নিয়া ঝুড়ি ঝুড়ি ইঁট আনিয়া ইঁটের স্তূপে ফেলিতে থাকে।

দেহ দুটিকে সে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া দিতে চায়। সমস্ত রাত্রি যে শয্যায় ইহারা পরস্পরকে ভালবাসিয়াছে অনন্ত-কাল সেই শয্যাতেই ইহারা ঘুমাইয়া থাক, শঙ্করের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু কেহ যেন না জানে।

মানুষের মাটির দেহ মাটিতে পরিণত হইতে কত সময় নেয়? শেষ বেলায় ইটের শেষ ঝুড়িটা তুলিতে না পারিয়া মাটিতে বসিয়া শঙ্কর তাহাই ভাবে।

বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে সে ঠক ঠক করিয়া কাঁপে। তাহাকে ঘিরিয়া থাকিয়া থাকিয়া বাতাস গর্জ্জায়।

অনামা কবি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

সরযূ ও গঙ্গা রেবা সুবর্ণরেখা
সিপ্রা সিন্ধু, কৃষ্ণা, আদি নামের তালিকা;
হেরি যখন, ভাবি মনে এ নাম দেওয়া কার?
দেশের আদিম কবির পদে জানাই নমস্কার।

ব্রহ্মপুত্র, রূপনারায়ণ, অজয়, দামোদর,
রূপের ছবি আঁকলে ভাষায় এ কোন্ কারিকর?
ইচ্ছা করে আলিঙ্গিয়া প্রণতি দিতে,
এমন মধুর নামকরণের সেই পুরোহিতে।

অতসী, অপরাজিতা, রজনীগন্ধা,
চম্পা, পারুল, যূথি জাতি, অমৃতছন্দা,
বঙ্গভাষার সূতিকাগার করলে যা আলো,
দেখে শুনে আমার নয়ন পরাণ জুড়ালো।

বইছে দেশের নদ নদীতে আনন্দধারা,
ফুলে ফলে রাখলে তারা প্রীতির পসরা'
নগর ভূধর অরণ্যানী কেউ পড়েনি বাদ,
লুটলে তাঁদের স্নেহের পরমান্ন পরসাদ।

কাব্য তখন পায়নিকো পথ, খুঁজিছে ছন্দ,
গঙ্গা যেন শিবের জটিল জটাতে বন্ধ;
আদিকবির অনুষ্টুভের আগের এ সব নাম
দিলেন যাঁরা, করছি তাঁদের শ্রীপদে প্রণাম।

ভাষার উষার সাধক কবির যাই বলিহারি,
নামে এমন রুচি যাঁদের নিত্য নেহারি;
ধন্য তাঁরা, ধন্য তাঁদের মোহিনী দৃষ্টি,
ওঙ্কারেতে করলে বিপুল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি।

তাঁরা জনগণের কবি দেশের কবি যে,
তাঁদের দেওয়া নামেই মোদের দেশ যে শোভিছে;
রচেন যাঁরা কাব্য নামের অমৃত-গন্ধী
আজকে আমি তাঁদের সবার চরণ বন্দি।

মধু দিয়ে ভরলে যাঁরা ভাষার মধুক্রম,
তাঁদের কথা যাই যে ভুলে, এমনি মোদের ভ্রম;
নাম দিয়েছে, নয়কো নিজে নামের প্রয়াসী,
কেমন করে বলবো তাঁদের কি ভালবাসি।

তাঁদের দেওয়া মুক্তা লয়ে অন্যে গাঁথে হার,
গোত্র গাঁই ও মেলের মালিক তাঁরাই সবাকার।
তাঁদের স্নেহেই মোদের ভাষা পুষ্ট গরবী
প্রণাম আজি পাঠায় তাঁদের অনামা কবি।

রাজগৃহ ও নালন্দর ধ্বংস-মাঝে

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

দারুণ অর্থ-সঙ্কটের সময়ে এ বৎসর পূজায় আর কলিকাতা ছাড়িয়া কোথাও যাইব না স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম; কিন্তু বন্ধুবান্ধবেরা ধরিয়া বসিলেন যে, তাঁহাদের সঙ্গে অন্ততঃ ৪।৫ দিনের জন্য একটু বাহিরে বেড়াইয়া আসিতেই হইবে। কোন্ জায়গায় যাওয়া হইবে বন্ধুরা কয় দিন ধরিয়া কেবল তাহারই জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিলেন। শেষে কিল-বন্ধু প্রস্তাব করিলেন, রাজগির যাওয়ার ব্যবস্থা করা হউক। রাজগির বা রাজগৃহ এবং সেই সঙ্গে তাহার অদূরবর্ত্তী নালন্দ, প্রাচীন ভারতের এই দুইটি অতি প্রসিদ্ধ স্থান দেখিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরিয়া আসা যাইবে। বহু দিন হইতে রাজগির যাওয়ার ইচ্ছা আমার মনের মধ্যে ছিল। বন্ধুর প্রস্তাব শুনিয়া সকলের সঙ্গে আমিও তাহার সমর্থন করিলাম। তখনই ই, আই, রেলের 'টাইম টেবল' আনা হইল। দেখিলাম, হাওড়া হইতে পাটনার নিকটবর্ত্তী বক্তিয়ারপুর জংশন ৩১০ মাইল; এবং তথা হইতে বিহার-বক্তিয়ারপুর লাইট রেলওয়ের লাস্ট ষ্টেসন 'রাজগির কুণ্ড' ৩৩ মাইল। মোট ১৫ ঘণ্টার মধ্যেই সেখানে পৌছান যায়।

আমরা ছয়জন বন্ধুতে মিলিয়া রাজগির যাইব, ইহাই স্থির হইয়াছিল। কিন্তু যাত্রার দিন সকালে প্রস্তাবকারী বন্ধুই বলিলেন, কোন বিশেষ কারণে তাঁহার যাওয়া ঘটিবে না। আর এক বন্ধু সমস্ত দিনের মধ্যে কোন খবর না পাঠাইয়া, নিরুদ্দেশ রহিলেন। বিজয়ার পর দ্বাদশীর দিন, ২৩শে অক্টোবর শুক্রবার রাত্রি ৮টার দানাপুর এক্সপ্রেস ট্রেণে, শিল্পী—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, সুলেখক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, স্থপতি—শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় ও নিজে, আমরা এই চার বন্ধুতে রাজগির যাত্রা করিলাম।

পরদিন ২৪শে অক্টোবর সকাল ৭টার পর আমাদিগকে বক্তিয়ারপুর জংসনে নামিয়া গাড়ী বদল করিতে হইল। আধ ঘণ্টা পরে লাইট রেলওয়ের ট্রেণ ছাড়িল। কয়েকটী ছোট ষ্টেসন অতিক্রম করিয়া, সাড়ে নয়টা আন্দাজ ট্রেণ বিহার-সরিফে পৌছিল। ইহা পাটনা জেলার বিহার মহকুমার সদর। বক্তিয়ারপুর হইতে দূরত্ব ১৯ মাইল। আরও ৭ মাইল অতিক্রম করিতে নালন্দ ষ্টেসন আসিল। অদূরবর্ত্তী স্তূপ ইত্যাদি দেখিতে পাইলাম। ট্রেণ অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজগৃহের গিরিশ্রেণী স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে লাগিল। মধ্যে আর একটী ষ্টেসন মাত্র পার হইয়া বেলা ১১টার পর আমরা রাজগির আসিয়া পৌছিলাম।

রাজগির পাটনা জেলার বিহার মহকুমার অন্তর্গত একটী গ্রাম। ইহার দক্ষিণে প্রাচীন রাজগৃহ অবস্থিত। বর্ত্তমানে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন এবং মুসলমানের নিকটও রাজগৃহ পুণ্য স্থান রূপে গণ্য। এখানকার জলবায়ু অতি মনোরম বলিয়া স্বাস্থ্যান্বেষী ব্যক্তিরাও রাজগিরে আগমন করিয়া থাকেন। রাজগৃহের উষ্ণ প্রস্রবণের জলে স্নান করিয়া অনেকে রোগমুক্ত হইয়াছেন, এরূপ শুনা যায়। রাজগিরে শ্বেতাম্বরী, দিগম্বরী, সনাতন ও শিখ এই চারিটি বড় ধর্ম্মশালা আছে। এতদ্ব্যতীত বৌদ্ধ ধর্ম্মশালা ও মুসলমানদিগের জন্য মকদুম কুণ্ডের সঙ্গে মুশাফিরখানাও বর্ত্তমান। খালি থাকিলে সরকারী যে ইন্‌স্‌পেক্‌সন্ বাংলা আছে, তাহাতেও স্থান পাওয়া যাইতে পারে। ভাড়া লইয়া বাসের উপযোগী অন্য কোন বাড়ী পাওয়া যায় না। পূর্ব্ব হইতে জানাইয়া ব্যবস্থা না করিলে পূজা বা মেলা ইত্যাদির সময়ে স্থানলাভের জন্য বিশেষ অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা। রাজগিরে কয়েকখানি মাত্র দোকান, একটী ছোট হাঁসপাতাল এবং পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস আছে।

পূর্ব্বে পত্র পাইয়া আমাদের অভ্যর্থনার জন্য কালীচরণ পাণ্ডা ষ্টেসনে উপস্থিত ছিল। তাহার সহিত অদূরবর্ত্তী সনাতন ধর্ম্মশালায় গিয়া উঠিলাম। ধর্ম্মশালার রক্ষক জানাইলেন, আপাততঃ কোন ভাল ঘর খালি নাই।

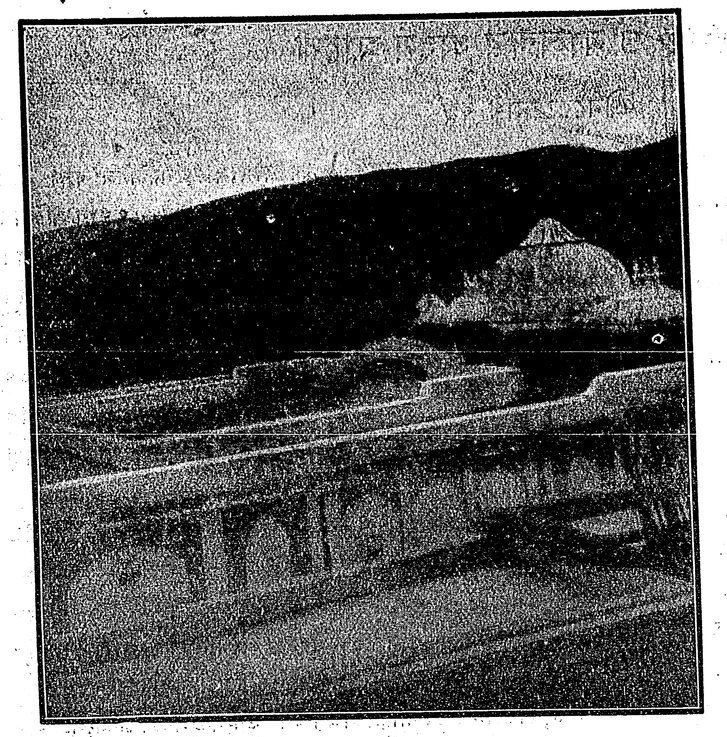

রাজগির—জৈন মন্দির অদূরে বৈভারগিরি ও দূরে রত্নগিরি

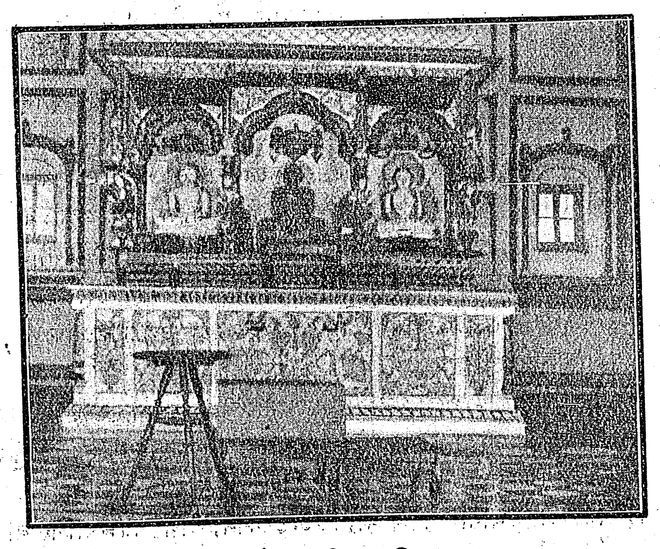

রাজগির—জৈন মন্দিরের ভিতর দৃশ্য

তবে, ঘণ্টা তিন চার পরে দ্বিতলে একটি ঘর খালি হইবে, তিনি সেইটী আমাদের দিবেন। কিছুক্ষণের জন্য তিনি তাঁহার নিজের ঘরই আমাদের ছাড়িয়া দিলেন। আমরা বিশেষ ধন্যবাদ জানাইয়া, জিনিষ-পত্র লইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলাম।

কিছুক্ষণ পরেই আমরা ধর্ম্মশালা হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। সঙ্গে কাপড় গামছা ও কলিকাতা হইতে আনীত খাদ্য-সামগ্রী লওয়া হইল। মাঠের মধ্যের সরু পথ দিয়াই ব্রহ্মকুণ্ডের উদ্দেশে অগ্রসর হইলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রাচীন প্রাকারের ভগ্নাংশ অতিক্রম করিয়া আমরা গিরিবেষ্টিত রাজগৃহের সীমানার মধ্যে পৌঁছিলাম।

রাজগৃহ পূর্ব্বভারতের মগধরাজ্যের সুপ্রাচীন রাজধানী। বিহার প্রদেশের দক্ষিণ ভাগ লইয়াই তখন মগধরাজ্য গঠিত ছিল। বর্ত্তমান বৈভারগিরি, বিপুলগিরি, রত্নগিরি, উদয়গিরি ও স্বর্ণগিরি এই পঞ্চশৈলের মধ্যবর্ত্তী স্থানেই রাজধানী বিস্তৃত ছিল। মধ্য ভারতের সময়ে প্রবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ মগধের অধিপতি ছিলেন। রাজগৃহ তখন 'গিরিব্রজ' নামে অভিহিত হইত। গিরিব্রজের বর্ণনায় মহাভারতে লিখিত আছে—

"এষ পার্থ! মহানভাতি
পশুমান নিত্যমনুমান।
নিরাময়ঃ সুবেশ্মাঢ্যো
নিবেশো মাগধঃ শুভঃ॥
বৈহারো বিপুলঃ
শৈলো বরাহো বৃষভস্তথা।
তথৈব গিরয়শ্চৈব
শুভাশ্চৈত্যক পঞ্চমাঃ॥"
(সভাপর্ব্ব, বিংশোধ্যায়)

অর্জ্জুন! এই সর্ব্বমঙ্গলময় বিশাল মগধ রাজধানী শোভা পাইতেছে; এখানে প্রচুর পশু আছে, সর্ব্বদা জল থাকে, এবং সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা রহিয়াছে; কিন্তু কোন রোগ পীড়া নাই।

বৈহার, বিপুল, বরাহ, বৃষভ এবং চৈতক নামে পাঁচটী মঙ্গলময় পর্ব্বত ঐ দেখা যাইতেছে।"

ইতিহাসোক্ত শিশুনাগবংশীয় শ্রেণিক বিম্বিসার মগধের অধিপতি ছিলেন। রাজগৃহই তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি ভৈভার ও বিপুল গিরির উত্তরে রাজধানী আরও বিস্তৃত করিয়া নবরাজগৃহের পত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে জৈনধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাবীর বিপুলাচলে বহুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। বিম্বিসার মহাবীর স্বামীর একজন প্রকৃত ভক্ত ছিলেন। রাজগৃহ জৈনদিগের নিকট একটা মহাপুণ্যক্ষেত্র বলিয়া গণ্য। জৈন ধনকুবেরগণের যত্নে পঞ্চশৈলের শিখরেই জৈন-মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইয়াছে।

মহাবীরের অনতিকাল পরেই বুদ্ধ শাক্যসিংহ বৈভার-শৈলে আগমন করেন এবং তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার জন্য মগধপতি বিম্বিসার হইতে রাজগৃহবাসী জনসাধারণ সকলেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। বুদ্ধদেব শৈলের শিখরদেশে থাকিতেন। তাঁহাকে দেখিতে হইলে দুরারোহ পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে সাধারণের বড়ই কষ্ট হইত। এই কারণে রাজা বিম্বিসার পাহাড় কাটিয়া সিঁড়ী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। সেই সিঁড়ি এখনও বর্ত্তমান। শাক্যসিংহ বুদ্ধত্বলাভের পূর্ব্বেও এক ব্রাহ্মণের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য রাজগৃহে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন।

বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু পিতাকে হত্যা করিয়া, রাজগৃহে মগধের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি বিশেষ পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন এবং তাঁহার রাজ্য ক্রমে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি শেষে বুদ্ধদেবের শরণাপন্ন হন, এবং তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। বুদ্ধদেব স্বীয় উপদেশাবলি লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। তাঁহার দেহত্যাগের পর তদীয় শিষ্যবর্গ মহারাজা অজাতশত্রুর অধিনায়কত্বে রাজগৃহেই এক সভা করিয়া গুরুর উপদেশ-সমূহ সংগ্রহ পূর্ব্বক তিনখণ্ডে বিভক্ত করেন। ইহাই 'ত্রিপিটক' নামে অভিহিত বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মপুস্তক। অজাতশত্রুর সময়ে ও পরে রাজগৃহের গিরিশ্রেণীর উপরে এবং অন্যান্য নানা অংশে সঙ্ঘারাম, বিহার, স্তূপ প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখনও সে সকলের বহু চিহ্ন বিদ্যমান।

অজাতশত্রু গঙ্গা ও শোনের সঙ্গমের নিকটস্থ পাটলি গ্রামে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার পৌত্র উদয়ের রাজত্ব কালে সেই স্থানে পাটলিপুত্র নগর স্থাপিত হয়, এবং রাজগৃহ হইতে রাজধানী তথায় স্থানান্তরিত করা হয়।

প্রাচীন রাজগৃহের মধ্যে পদার্পণ করিয়া, একবার ভাল করিয়া চারি দিক দেখিয়া লইলাম। সম্মুখে বা আশে-পাশে, উপত্যকাভূমি কি নিকটস্থ গিরিগাত্রে অট্টালিকাদির কোন ধ্বংস-চিহ্ন চক্ষে পড়িল না। তবে, দক্ষিণে নিকটেই পূর্ব্বেকার প্রস্তরমণ্ডিত তোরণের সুস্পষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে, দেখিলাম। বামে অল্প দূরে প্রাকার আর এক স্থানে ভগ্ন করিয়া, ষ্টেসনের দিক হইতে আসিয়া প্রশস্ত পথ ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের পথটি কিছু দূর গিয়াই তাহার সহিত মিলিত হইল। কুণ্ড হইতে স্নান করিয়া ফিরিতেছেন, পথে এমন কয়েকজন যাত্রীর সাক্ষাৎ পাইলাম। পথ সংক্ষেপ করার জন্য আবার একটী ক্ষুদ্র রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইলাম। রাস্তাটী ইন্‌স্পেক্সন্ বাংলার প্রাঙ্গণের ধার দিয়াই গিয়াছে। সেখানে অনেক লোকজন ও কয়েকখানি মোটরগাড়ি রহিয়াছে, দেখিলাম। শুনিলাম, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ছুটিতে সদলবলে আসিয়া বাস করিতেছেন। অল্প দূর যাইয়া পথিপার্শ্বে বৃক্ষমূলে একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত বৌদ্ধমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। ক্রমে আমরা রাজগৃহ মধ্যস্থ একমাত্র ক্ষুদ্রকায়া পার্ব্বত্য নদী সরস্বতীর ধারে আসিয়া পড়িলাম। বামে বিপুল এবং দক্ষিণে বৈভারগিরি। এই স্থলে উভয়ের ব্যবধান অর্দ্ধ মাইলেরও কম বলিয়াই মনে হইল। এক স্থানে নদীতে অতি অল্প জল ছিল, কয়েকখণ্ড প্রস্তর দেওয়া থাকায় সহজেই পার হওয়া গেল। একবারে বৈভারগিরির পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বামে নিকটেই নদীর উপর একটী সুন্দর সেতু রহিয়াছে, দেখিলাম। গিরির নিম্নভাগে, অতি অল্প উচ্চেই ব্রহ্মকুণ্ডের স্থান। সেতুর সংলগ্ন একটি প্রশস্ত সিঁড়ি কুণ্ডে গিয়াছে। আমাদের সম্মুখেও একটী ভাল সিঁড়ি ছিল। তাহা দিয়া উপরে উঠিয়াই বর্ত্তমানে রাজগৃহে হিন্দু তীর্থযাত্রী-দের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য ব্রহ্মকুণ্ড স্থানে গিয়া পৌঁছিলাম।

রাজগৃহ এক্ষণে হিন্দুর নিকট তীর্থস্থান বলিয়া গণ্য হইলেও অতি প্রাচীন কালে এরূপভাবে গণ্য হইত কি না সন্দেহ। কালবশে মগধ হইতে বৌদ্ধ প্রভাব লুপ্ত হইলে এবং ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য স্থাপিত হইলে, বায়ুপুরাণীয় রাজগৃহ-মাহাত্ম্য প্রকাশিত হয়। যে সকল স্থান বৌদ্ধ ও জৈনগণের নিকট পুণ্য-স্থান বলিয়া গণ্য ছিল, সেই সকল স্থান হিন্দুতীর্থ বলিয়া কল্পিত হয়। হিন্দু দেব-দেবীরও প্রতিষ্ঠা করা হয়। নানা বৌদ্ধ কীর্ত্তি ব্রাহ্মণগণ এইরূপে হিন্দুর বলিয়া আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন। রাজগৃহ-মাহাত্ম্যে বহু তীর্থস্থানের উল্লেখ আছে, তীর্থযাত্রীদিগকে পাণ্ডারা সেই সকল তীর্থ এখনও দেখাইয়া থাকেন।

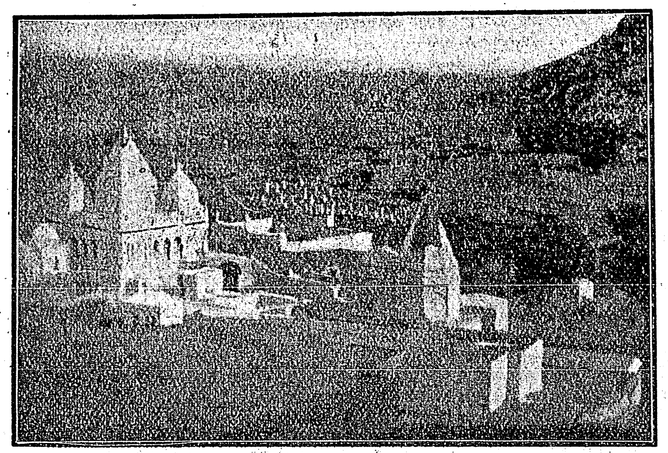

রাজগৃহ—ব্রহ্মকুণ্ড স্নান (বিপুলগিরির অল্পাংশ দেখা যাইতেছে)

ব্রহ্মকুণ্ডের দক্ষিণে পঞ্চচূড়াসমন্বিত বিষ্ণু মন্দির ও বামে শিব-মন্দির দেখিলাম। ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে ফুলের মালা, মিষ্টান্ন ইত্যাদির দুই-তিনটি অস্থায়ী দোকান বসিয়াছিল। একটী দোকানদারের নিকট জামা, কাপড় ইত্যাদি রাখিয়া দিলাম, প্রথমে পার্শ্বস্থিত সপ্তর্ষিকুণ্ডে গিয়া নামিলাম। চারি দিকে প্রাচীর দিয়া বাঁধান দীর্ঘাকৃতি স্নান। গিরিগাত্র হইতে পাথরের নল বাহিয়া তিনটি উষ্ণ

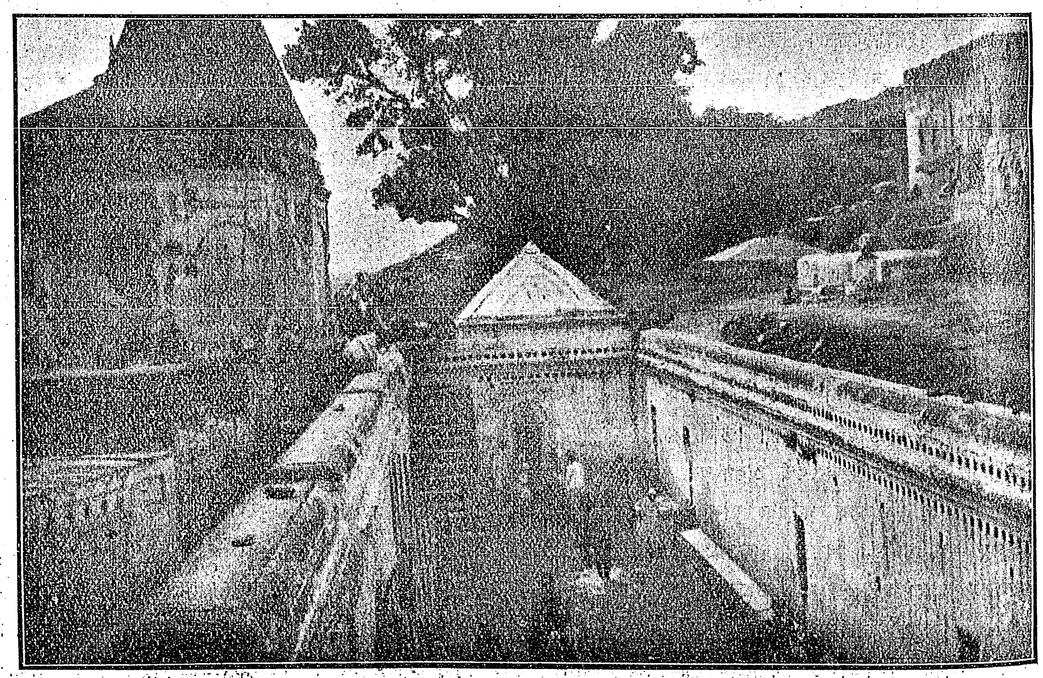

সপ্তর্ষিকুণ্ড—ধারা স্নানের স্থান

জলধারা পড়িতেছে। একটী খুব জোর, দ্বিতীয়টা তদপেক্ষা কিছু কম এবং তৃতীয়টা ক্ষীণ দেখিলাম। ধারার জলে প্রথমে কাপড় ও দেহ ভিজাইয়া লইয়া, তবে ব্রহ্মকুণ্ডের জলে নামিবার নিয়ম। জল অত্যন্ত গরম বোধ হইল। কোন রকমে দেহ ভিজাইয়া লইয়া, বিপরীত দিকের দেয়ালের মধ্যস্থিত দ্বার দিয়া আরও অবতরণ করিয়া, ব্রহ্মকুণ্ডের জলে নামিলাম। গরম প্রায় এক রূপই বোধ হইল। পরে সরকারী রিপোর্ট হইতে জানিতে পারিয়াছি যে, ধারার জলের উত্তাপ ১০৫° হইতে ১০৮° এবং কুণ্ডের জলের ১০০° হইতে ১০৫°। কুণ্ডটী ৭।৮ হাত আন্দাজ সমচতুষ্কোণ বড় চৌবাচ্ছার মত। প্রস্তরমণ্ডিত পার্শ্বের দেওয়াল একতলারও অধিক উচ্চ। প্রাঙ্গণ এবং ধারাস্নানের স্থান হইতে দুইটী সিঁড়ি আসিয়া জলে পৌঁছিয়াছে। মধ্যে দাঁড়াইলে কুণ্ডের জলে কোমর পর্য্যন্ত ডুবিয়া যায়। কুণ্ডের এক কোণে তিনটী প্রস্তর-মূর্ত্তি রক্ষিত আছে। মধ্যে বিষ্ণু, দক্ষিণে মহাদেব ও বামে গণেশ মূর্ত্তি। পাণ্ডার নির্দ্দেশ মত মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া তাহাতে যাত্রীরা ফুল ও জল দিতেছে, দেখিলাম। রাজগৃহ-মাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে, যে, এই ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যার পাতক নিবারিত হয় এবং ইহাতে পিণ্ড দান করিলে গয়ায় পিণ্ডদানের তুল্য ফললাভ হয়। কুণ্ডের তলদেশ হইতে অবিরত জল উঠিতেছে এবং অতিরিক্ত জল

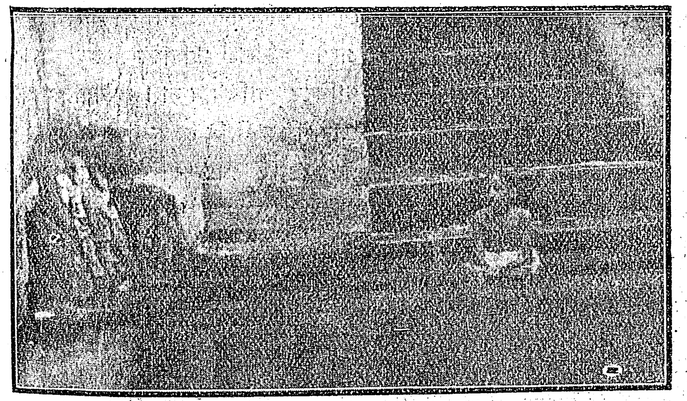

ব্রহ্মকুণ্ড—ভিতর দৃশ্য

দেয়ালগাত্রস্থিত প্রণালী দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। এ জন্য বহু লোকে স্নান করিলেও, কোন বদ্ধ জলের মত কুণ্ডের জলের দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। অনভ্যাস বশতঃ গরম জলে অধিকক্ষণ স্নান করা কষ্টকর বোধ হইতেছিল, অল্পক্ষণের মধ্যেই উঠিয়া আসিলাম। বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া যখন ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম, তখন বিশেষ তৃপ্তি বোধ হইতে লাগিল। সমস্ত ক্লান্তি দূর হইয়া

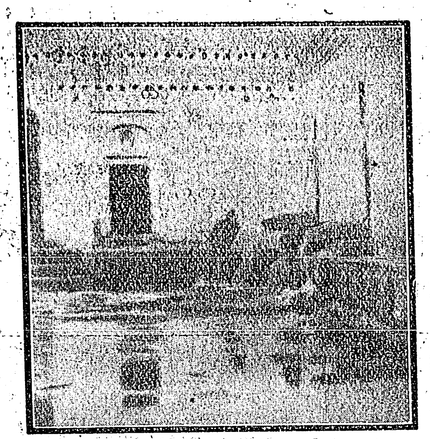

দুইটা ধারা

শরীর যেন অনেকটা হাল্কা হইয়া গেল। প্রাঙ্গণের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আরও দুইটী ছোট অব্যবহৃত কুণ্ড দেখিতে পাইলাম।

ব্রহ্মকুণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মশালায় ফিরিবার পথে একটী বাঁধান বটবৃক্ষতলে আসিয়া থামা গেল। সেখানে আসিয়া আমরা বেশ আনন্দের সহিত আহার সারিয়া লইলাম। পাত্র ভরিয়া উষ্ণপ্রস্রবণের জল আনিয়াছিলাম, তাহা পান করিয়া বিশেষ পরিতৃপ্ত হইলাম। জল একেবারে বর্ণ ও গন্ধহীন, কলের জলের মতই নির্ম্মল। সাধারণতঃ উষ্ণপ্রস্রবণের জল এত পরিষ্কার হয় না। ইহা রাজগৃহের জলের বিশেষত্ব বলা যাইতে পারে। সরকারী পরীক্ষার রিপোর্ট দেখিয়াও, পরে আমরা জলের নির্ম্মলতার বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছি।

রাজগিরে সনাতন ধর্ম্মশালার পশ্চাতেই দিগম্বরী ধর্ম্মশালা। কুণ্ড হইতে ফিরিয়া, জৈন মন্দির ঘুরিয়া,

সেখানে প্রবেশ করিলাম। সে সময় তথায় কয়েকটী বাঙ্গালী পরিবার বাস করিতেছিলেন। স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকায় তাঁহাদের সংখ্যা ২০।২২ জন হইবে। ধর্ম্মশালাটি বেশ সযত্ন-রক্ষিত ও পরিষ্কার দেখিলাম। অনুসন্ধানে জানিলাম, আর ঘর খালি নাই।

ফিরিয়া আসিতেই, সনাতন ধর্ম্মশালার রক্ষক বলিলেন, আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরটী এখনই খালি হইতেছে, এবং তিনি ঘণ্টা খানেকের মধ্যে একবার চূণকাম করাইয়াও দিতেছেন। আমরা তাঁহার ঘরে বসিয়াই কয়েকখানি পোষ্টকার্ডে রাজগিরে পৌঁছান সংবাদ লিখিয়া ফেলিলাম। সেগুলি পোষ্ট অফিসে পাঠাইয়া, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা গেল।

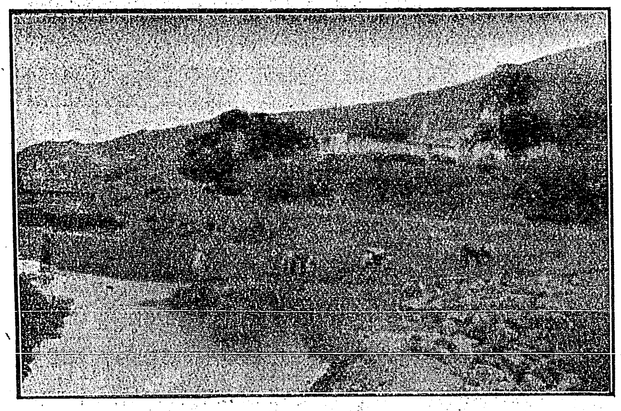

বৈভারের পাদদেশে ব্রহ্মকুণ্ড স্থান। সম্মুখে ক্ষুদ্রকায়া সরস্বতী

ঘরটী পরিষ্কার হইলেই, আমরা তাড়াতাড়ি দ্বিতলে উঠিয়া তাহা দখল করিয়া লইলাম। পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ, তিন দিক খোলা ভাল ঘর, ভিতরে বসিয়াই পাহাড়ের সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু বাহিরের ন্যায় ঘরের ভিতরেও বালির কাজ করা হয় নাই। ইটের উপরই চূণের পোঁচ লাগান হইয়াছে। দ্বিতলে যে ৭।৮ খানি ঘর রহিয়াছে, সকলগুলিরই এই অবস্থা। শুনিলাম, যে ধর্ম্মপ্রাণা মহিলা এই ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন, তাঁহার মৃত্যু ঘটায় ইহা অসম্পূর্ণই রহিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে যাঁহারা ইহার মালিক হইয়াছেন, তাঁহারা কলিকাতার ধনশালী বণিকগণের অন্যতম হইলেও, ইহার দিকে আদৌ দৃষ্টিপাত করেন না।

ঘরে সারি সারি চারিটি ছোট বিছানা পাতিয়া অতি অল্প স্থানই খালি রহিল, তাহাতেই কুকার, ষ্টোভ ও অন্যান্য সামগ্রী গুছাইয়া রাখা গেল। যাত্রীগণের রন্ধনের জন্য একতলের দালানে অল্প অন্তর করিয়া অনেকগুলি উনান পাতা ছিল। কিন্তু আমরা নিজেদের ঘরের মধ্যেই খাদ্য প্রস্তুত করিয়া লইব, স্থির করিলাম।

আশ্রয় পাইলেও আরও ভালর আশায়, নিকটস্থ শ্বেতাম্বরী ধর্ম্মশালার দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ধর্ম্মশালাটী দ্বিতল, বাহির হইতে পরিষ্কার বলিয়াই বোধ হইল। শুনিলাম, রক্ষক কোন কাজে পাটনা গিয়াছেন। যিনি বদলি ছিলেন, তিনি আমাদের জন্য স্থানের ব্যবস্থা করিতে অক্ষমতা জানাইলেন। অগত্যা একটু ঘুরিয়া, দোকান হইতে আবশ্যক খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করিয়া নিজেদের ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিলাম। শিখধর্ম্মশালার অবস্থান তত ভাল বোধ না হওয়ায়, সেখানে আর কোন অনুসন্ধান করা হয় নাই।

সন্ধ্যার সময় কুকারে খিচুড়ি, তৎসঙ্গে তরকারী ইত্যাদি চড়ান হইল। নানা গল্প গুজবে ঘণ্টা তিনেক সময় কাটান গেল। যথাসময়ে খগেনবাবু যখন সকলকে আহার্য্য পরিবেশন করিলেন, তখন সে সকলের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাঁহাকে সুলেখক বলিয়াই জানিতাম, কিন্তু তিনি যে সুপাচকও, তাহা প্রমাণ হইয়া গেল। আহারাদি শেষ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে আমরা নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

রাজগিরে আমাদের প্রথম রজনী প্রভাত হইল। অদূরের পর্ব্বতগুলির দৃশ্য অতি সুন্দর লাগিতেছিল। ২৫শে অক্টোবর রবিবার আমরা স্থির করিলাম, সকালেই বৈভার-গিরি-শিখরে আরোহণ করিব। তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সারিয়া, কিছু জলযোগ করিয়া লওয়া হইল। ব্যবস্থাদি করিয়া, কুকারে ভাত, দাল, তরকারী ইত্যাদি চড়ানর পর সকলে বাহির হইয়া পড়িলাম।

পূর্ব্বের পথ ধরিয়া প্রথমে আমরা ব্রহ্মকুণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কুণ্ডের পার্শ্ব দিয়াই উপরে উঠিবার

থ। পাণ্ডার নিকট হইতে একজন লোক লইয়া আমরা পাহাড়ের উপরে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। অল্প উপরেই ান দিকে গিরিগাত্রে চতুষ্কোণাকৃতি পাথরে বাঁধান একটি ান রহিয়াছে, দেখিলাম। মধ্যস্থলে দুইটী কবরের মত াথা, বাকিটা খালি। একজন লোক বসিয়া ছিল, সে লিল, এটী ফকির সা গিল্ গিল্কা বৈঠক। উঠার পথ শঃ কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। রাজগৃহের গিরিগুলি াধারণ পাথরে (Sand Stone) না হইয়া, গ্রেনাইট াথরে (Granite stone) গঠিত। গিরিগাত্র কাটিয়া সিঁড়ি নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল, তাহা কালপ্রভাবে স্থানে ানে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু পাথর এত মসৃণ হইয়া আছে , হড়কাইয়া পড়িয়া যাইবার ভয় হয়। অতি সাবধানেই উঠিতে লাগিলাম। একজন বন্ধু মধ্যপথেই রহিয়া গেলেন। সেই স্থানে একখানি প্রশস্ত পাথরের উপর বসিয়া কয়েকজন যাত্রী নামিবার পথে বিশ্রাম করিতেছিলেন। আমরা তিন বন্ধুতে ধীরে ধীরে আরও অনেক দূর উঠিয়া, উপরের প্রথম মন্দির দুইটীর স্থানে পৌঁছিলাম। মন্দির অধিক দিনের নয় বলিয়াই মনে হইল। দ্বার বন্ধ থাকায় ভিতর দেখিতে পাইলাম না। সম্মুখে সর্ব্বোচ্চ স্থানে আরও দুইটী মন্দির দেখা যাইতেছিল, অল্পক্ষণ পরেই সেখানে পৌঁছিলাম। উঠিতে আমাদের মোট অর্দ্ধ ঘণ্টা আন্দাজ সময় লাগিল। এই দুইটী মন্দিরও অল্প দিনের বলিয়া বোধ হইল। সঙ্গের লোকটী বলিল, একটি জৈন এবং অপরটী হিন্দু মন্দির। এ দুইটীও বন্ধ ছিল। আমরা সেখানে বসিয়া একটু জিরাইয়া লইলাম। উপর হইতে অন্যান্য পাহাড়, মধ্যের উপত্যকাভূমি ও চারি দিকের দৃশ্য বড় সুন্দর দেখাইতেছিল।

সেখান হইতে উঠিয়া, কাঁটাবনের ভিতর দিয়া এক অতি সরু পথে প্রাচীন বৌদ্ধ-কীর্ত্তির স্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম। একটী ক্ষুদ্র ধ্বংসপ্রায় ছাদহীন গৃহে কয়েকটী মূর্ত্তি রহিয়াছে, দেখিলাম। অতি কষ্টে একখানি ফটো লওয়া হইল। একটু উপরেই যে প্রশস্ত চতুষ্কোণ গৃহের ধ্বংসাবশেষ দেখিলাম, তাহাতে কয়েকটী মূর্ত্তি একটি চালা করিয়া রাখা হইয়াছে। আমরা প্রত্নতত্ত্ববিদ নহি, মূর্ত্তিগুলি কোন্ সময়ের বা তাহাদের বিভিন্ন নাম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যাহাতে দর্শকেরা কোন কিছুর ক্ষতি না করেন, সেই জন্য দুই স্থানেই সরকারী নোটিশ লাগান আছে।

বৈভারগিরি-শিখর-পথে

সেখান হইতে পূর্ব্বরূপ আর একটী সরু পথে সোমনাথ মন্দিরে আসিয়া পৌঁছিলাম। প্রাচীন ক্ষুদ্র মন্দির, সম্মুখের

বৈভারগিরি-শিখরে জৈন ও হিন্দু মন্দির

TIGHT BINDING

ভগ্ন দালানে কয়েকটী অসমাপ্ত প্রস্তর-স্তম্ভ পড়িয়া রহিয়াছে। ভিতরে শিবলিঙ্গের সম্মুখে অবস্থিত প্রস্তরের বৃষটী ভগ্ন। মন্দিরটী প্রাচীন হইলেও, পূর্ব্বদৃষ্ট বৌদ্ধ

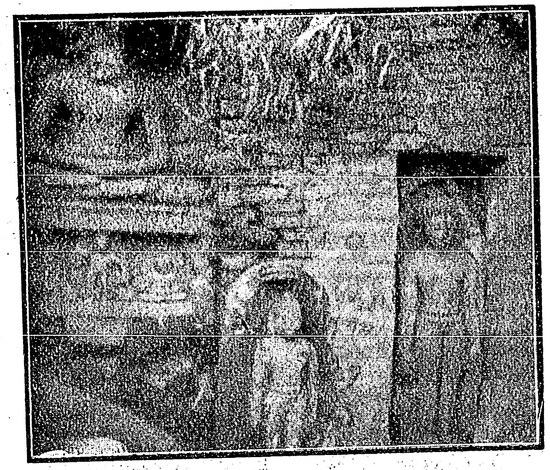

বৈভার-শিখরে আবিষ্কৃত বৌদ্ধমূর্ত্তি

কীর্ত্তিগুলির পরবর্ত্তী কালের বলিয়া মনে হইল। এখানেও সরকারী নোটিশ দেখিলাম।

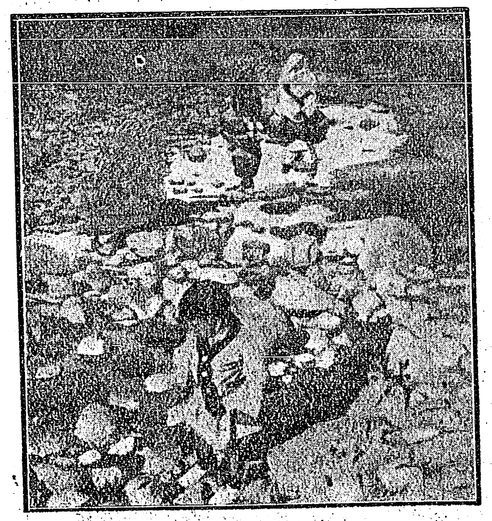

রাজগৃহ—গিরিবেষ্টিত প্রাচীন ভূমির এক অংশ

ফিরিবার সময় অন্য একটা পথ ধরিলাম। কিছু দূর যাইয়া মূল পথে আসিয়া পড়িলাম। নামিবার সময় কষ্ট কম হইলেও, অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইল। যাহা হউক, অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে আমরা ব্রহ্মকুণ্ডে ফিরিয়া আসিলাম। দেখিলাম, উঠিবার সময় মধ্যপথে পরিত্যক্ত বন্ধুবর আমাদের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। অল্পক্ষণ বিশ্রামের পর কুণ্ডে স্নান করিয়া আমরা ধর্ম্মশালায় ফিরিলাম। যথাসময়ে আহারাদি শেষ করা হইল।

বেলা সাড়ে তিনটার পর একজন লোক সঙ্গে লইয়া রণভূমি দর্শনের ইচ্ছায় বাহির হইয়া পড়িলাম। এই প্রাচীন রণভূমিতেই না কি মহাবীর্য্যশালী ভীম, মগধরাজ প্রবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধকে বাহু-যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মকুণ্ডের নিম্নদেশ দিয়াই আমাদের যাইতে হইল। পুলের পরেই সরস্বতীর দুই ধারে দুইটী বাঁধান ঘাট রহিয়াছে, দেখিলাম। এই ঘাটে সরস্বতীর জলে স্নান, হিন্দু তীর্থযাত্রীদের একটী প্রধান করণীয়রূপে গণ্য। অল্পদূর আগাইয়া যাইতেই শ্মশান। নদীর দুই পার্শ্বস্থিত দুইটী পরিত্যক্ত চিতা হইতে তখনও ধূম উঠিতেছিল।

পায়ে-চলা সঙ্কীর্ণ পথ উপত্যকার উপর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। উচ্চ গিরিবেষ্টিত স্থানের মধ্যে কি নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল। বনফুলের মৃদু গন্ধে তৃপ্তি বোধ হইতেছিল। নিজেদের ক্ষেতে বেড়া দিবার জন্য কৃষকেরা জঙ্গল হইতে কাটিয়া কুলকাঁটার বোঝা লইয়া যাইতেছে, দেখিলাম। পথে রণভূমি দেখিয়া ফেরত যাত্রী কয়েকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। মাইলখানেক যাইয়া আমরা 'সোণভাণ্ডারে' আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ইহাই প্রসিদ্ধ সপ্তপর্ণী গুহা। বুদ্ধের নির্ব্বাণের অনতিকাল পরে এইখানেই প্রথম বৌদ্ধ সঙ্ঘের অধিবেশন হইয়াছিল। গিরিগাত্র কাটিয়া একটী প্রশস্ত গৃহ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। দৈর্ঘ্য ২০ হাত এবং প্রস্থ ১০ হাত আন্দাজ হইবে। ভিতর দিককার দেওয়ালের মধ্যে ঠিক খিলানের মত চিহ্ন ছিল। সঙ্গের লোকটী জানাইল, ঐখানে আরও ভিতরে যাওয়ার পথ ছিল, তাহা পাথর দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। টর্চ্চ আলো দিয়া দেখিয়া, স্থপতিরা কিন্তু বলিলেন, ওটা ফাটার চিহ্ন। গৃহের সম্মুখভাগে থামের উপর ছাদ দেওয়া বারাণ্ডা ছিল, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান দেখিলাম। সম্মুখে প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষার সরকারী নোটিশ দেখিলাম।

বামে বিপুল এবং দক্ষিণে বৈভারগিরির মধ্যস্থল দিয়াই যাইতেছিলাম। এইবার রত্নগিরি, উদয়গিরি ও স্বর্ণগিরি সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতে লাগিল। 'রণভূমি' পৌঁছানর পূর্ব্বে আমাদিগকে আবার একটী প্রাচীন প্রাকার ভেদ করিয়া যাইতে হইল। আমরা রণভূমিতে আসিয়া পৌঁছিলাম। চতুর্দ্দিকে প্রস্তরসমাকীর্ণ উপত্যকাভূমির মধ্যস্থলে প্রশস্ত স্থান। অন্যত্র হইতে আনীত মৃত্তিকা দিয়া, দুই তিন হাত উচ্চ ও সযত্নে সমতল করা হইয়াছে, মল্লযুদ্ধের উপযুক্ত করিয়াই নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হইল। ভীম ও জরাসন্ধের মল্লযুদ্ধের বর্ণনায় মহাভারতে লিখিত আছে—

"এবমাদীনি যুদ্ধানি প্রকুর্ব্বাণৌ পরস্পরম।
তয়োর্যুদ্ধং ততোদ্রষ্টুং সমেতাঃ পুরবাসিনঃ॥
ব্রাহ্মণাবর্ণিজশ্চৈব ক্ষত্রিয়াশ্চ সহস্রশঃ।
শূদ্রাশ্চ নরশার্দ্দূল! স্ত্রিয়ো বৃদ্ধাশ্চ সর্ব্বশঃ॥"
(সভাপর্ব্ব—দ্বাবিংশোঽধ্যায়)

"ভীম ও জরাসন্ধ পরস্পর উক্তরূপ নানাবিধ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদের যুদ্ধ দেখিবার জন্য পুরবাসীরা উপস্থিত হইল। এবং সমস্ত স্থান হইতে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রীলোক ও বৃদ্ধ সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন জনসমূহে পরিপূর্ণ হইয়া সে স্থানটা একেবারে রন্ধ্রশূন্য হইয়া গেল।"

আমরা জনমানবহীন রণভূমিই দর্শন করিলাম। রণভূমির পরের স্থান অধিক জঙ্গলাকীর্ণ মনে হইল। পুনরায় পূর্ব্বের সমস্ত পথ অতিক্রম করিয়া আমরা যখন ধর্ম্মশালায় পৌঁছিলাম, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।

ঘণ্টা তিনেক সময় রন্ধনের হাঙ্গামাতেই কাটিয়া গেল। লেখক, শিল্পী ও স্থপতি, তিন বন্ধুই রন্ধনে যোগ দিয়াছিলেন। আমার ও-বিষয়ে অভিজ্ঞতা না থাকায়, আমি তাঁহাদের কৃত রন্ধনের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া উৎসাহ প্রদানেই ব্যাপৃত ছিলাম। আহারাদি শেষ করিয়া উঠিতে রাত্রি সাড়ে নয়টা হইয়া গেল।

লক্ষ্মীপূজা—কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রি, জ্যোৎস্নার আলোকে চারিদিকের দৃশ্য বড় সুন্দর বোধ হইতেছিল। পরামর্শ করিয়া কয় বন্ধুতে ধর্ম্মশালা হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। জনহীন পথে বেড়াইতে বেড়াইতে রেল ষ্টেসনে আসিয়া থামা গেল। ষ্টেসন মাষ্টার মহাশয় তখনও ঘরের মধ্যে বসিয়া হিসাব নিকাশ করিতেছিলেন। একখানি বেঞ্চ ছিল, তাহাই টানিয়া আনিয়া চাঁদের আলোতে লাইনের ধারে পাতিয়া বসিলাম। একটু পরে মাষ্টার মহাশয় বাসায় চলিয়া গেলেন, এবং জানাইয়া গেলেন যে, আমরা যতক্ষণ ইচ্ছা তাঁহার এলাকার মধ্যে বসিয়া থাকিতে পারি। সেখানে বসিয়া গল্পে-গানে আমাদের অনেকটা সময় কাটিয়া গেল। বাসায় ফিরিয়া শয়ন করিতে প্রায় বারটা বাজিল।

পরদিন ২৬শে অক্টোবর সোমবার অতি প্রত্যূষেই ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ছয়টার সময়ই আমাদিগকে নালন্দ লইয়া যাইবার জন্য গোযান আসিবার কথা ছিল, সেজন্য তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু গাড়ী পৌঁছিতে

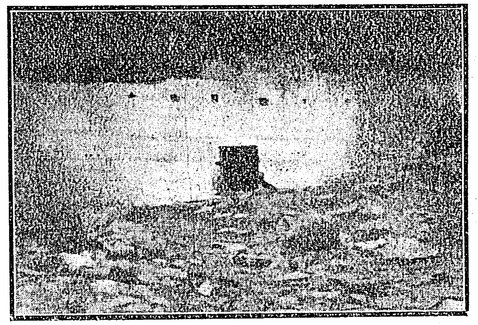

রাজগৃহ—সোনভাণ্ডার

সাতটা বাজিয়া গেল। ছইএর উপর ছেঁড়া চট বাঁধা ছিল, ভিতরে দেওয়া খড়ের উপর আমরা একটী সতরঞ্চি বিছাইয়া লইলাম। সঙ্গে একবেলার আহারের উপযোগী রুটি, মাখন, মিষ্ট ইত্যাদি লইয়া, সাড়ে সাতটায় আমরা নালন্দ অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

রাজগির হইতে নালন্দ মাত্র চার ক্রোশ পথ। আমাদের শকটচালক আশ্বাস দিল, বলদ দুইটী বিশেষ কর্ম্মঠ এবং তাহার নিজের অপেক্ষাও বুদ্ধিমান। তিন ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাইয়া দিবে। শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। রাজগির গ্রামের যে-অংশ দিয়া আমাদের গাড়ি অগ্রসর হইল, তাহাতে তিন চারখানা পাকা বাড়ী ব্যতীত সবই খোলার বাড়ী দেখিলাম। গ্রাম ছাড়াইতেই রেলের লাইনের রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। এই রাস্তাটি

TIGHT BINDING

বক্তিয়ারপুর হইতে আসিয়া রাজগিরে শেষ হইয়াছে। রাস্তার একধারে লাইট রেলওয়ের লাইন পাতা, বাকি-টুকুতে সরুল স্থলে দুইখানি গাড়ীও পাশাপাশি একসঙ্গে যাইতে পারে না। রাস্তার অবস্থাও ভাল নয়। গাড়ি-ঘোড়ার চলাচল অতি বিরল বলিয়া আমাদের গোযান একরূপ নির্ভাবনাতেই চলিতেছিল।

রাস্তার দুই পাশেই বিস্তৃত ধানের চাষ, মাঝে মাঝে আক, মূলা এবং অন্যান্য শাকসব্জির ক্ষেতও চক্ষে পড়িল। ছোট বড় জলাশয় মাত্রেই পানিফলের চাষ দেখিলাম। পূর্ব্বে শিলাও লাইট রেলওয়ের শেষ ষ্টেসন ছিল, রাজগির যাত্রীদের এইখানেই নামিতে হইত। রাজগির গ্রাম এখনও শিলাও থানারই অন্তর্গত।

শিলাও ছাড়িয়া যাইতে অল্পক্ষণ দেরী হইয়া গিয়াছিল। আরও দেড় ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া যখন নালন্দ ষ্টেসনে পৌঁছিলাম, তখন সাড়ে দশটা বাজিয়া গিয়াছে। ষ্টেসনের পাশ দিয়া আমরা বড়গাঁওএর রাস্তা ধরিলাম। দূরে স্তূপ দেখা যাইতেছিল, শীঘ্র পৌঁছানর জন্য মনের ব্যস্ততা আরও বাড়িয়া গেল। রৌদ্রের তীব্রতা বোধ

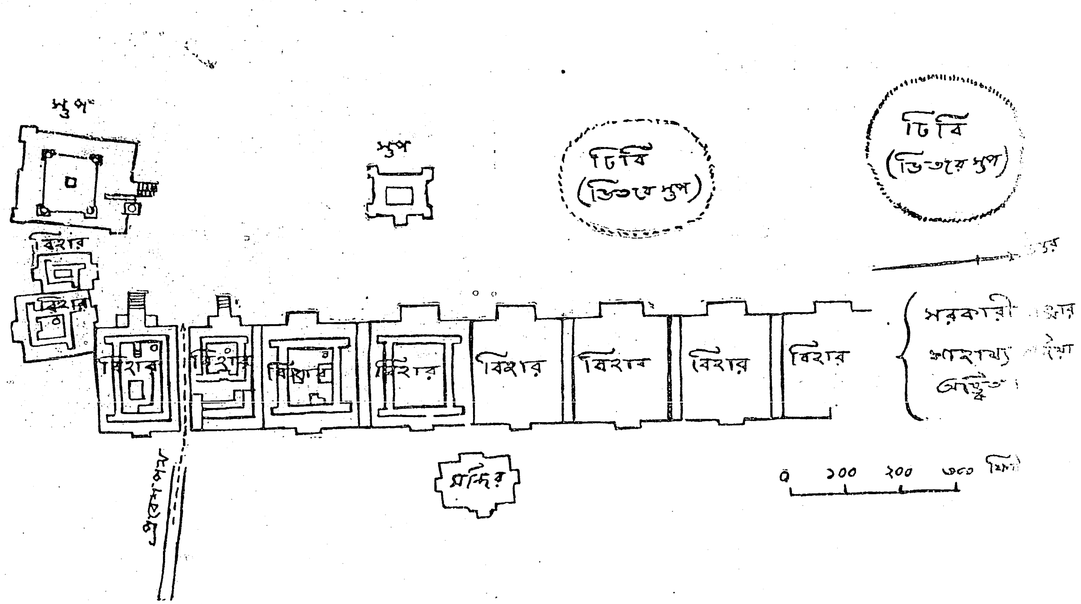

নালন্দ—খননস্থানের নক্সা

অনভ্যস্ত আরোহীদের গাড়ীতে অসোয়াস্তিই হইতেছিল। দেখিলাম, গাড়ী ছাড়িয়া হাঁটিয়া যাওয়াতেই অধিক আরাম। মধ্যে আর একটী ছোট গ্রাম অতিক্রম করিয়া দেড় ঘণ্টা আন্দাজ পরে, দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী শিলাও গিয়া পৌঁছিলাম। শিলাও বেশ বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। বাজারের ভিতর দিয়া যাইতে অনেক দোকান পসার দেখিতে পাইলাম। শিলাওএর খাজা বিশেষ বিখ্যাত। দশ-বারখানি দোকানে স্তরে স্তরে খাজা সাজান রহিয়াছে দেখিয়া, কিছু না কিনিয়া আর থাকিতে পারা গেল না। হইতেছিল, সেজন্য হাঁটিবার চেষ্টা না করিয়া শকট-চালককেই তাগাদা দিতেছিলাম! প্রথমে ফাঁকা রাস্তা, পরে একটী ছোট গ্রামের মধ্য দিয়া অর্দ্ধ ক্রোশ আন্দাজ রাস্তা অর্দ্ধ ঘণ্টায় অতিক্রম করিয়া, বেলা এগারটার পর আমাদের গোযান বড়গাঁও প্রান্তে নালন্দ বিহারের ধ্বংসা-বশেষের সম্মুখে আসিয়া থামিল। পূর্ব্বের বিহার-গ্রাম নামই বর্ত্তমানে বড়গাঁও নামে পরিণত হইয়াছে।

রাজগৃহের নিকটস্থ নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন কালে জগদ্বিখ্যাত ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পরে ইহার প্রতিষ্ঠা

হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ভারতের নানা স্থান এবং সুদূর চীন, শ্যাম প্রভৃতি দেশ হইতে বৌদ্ধ ছাত্রেরা শিক্ষা-লাভার্থ এখানে সমবেত হইত। সুপ্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হুয়েন সঙ্ সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি পাঁচ বৎসর কাল ছাত্ররূপে নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস করেন। সে সময় বাঙ্গালী ভিক্ষু শীলভদ্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাস্থবির ছিলেন। এখানকার বিহারসমূহে ন্যূনাধিক দশ সহস্র ছাত্র বিনাব্যয়ে আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিদ্যাভ্যাস করিত। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য ও চিকিৎসা-বিদ্যার অধ্যাপনা হইত। রাজকোষ হইতে সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করা হইত। বহু সংখ্যক কৃতবিদ্য বৌদ্ধ পণ্ডিত জ্ঞান ও ধর্ম্মোপদেশ দানে নিয়ত ব্যাপৃত থাকিতেন। পালবংশের রাজত্ব সময়ে যখন বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের অতিশয় প্রভাব ছিল, তখন নালন্দ একটী প্রধান বৌদ্ধতীর্থ বলিয়া গণ্য ছিল। রাজা দেবপাল দেব কনিষ্ক-বিহার হইতে সমাগত আচার্য্য বীরদেবকে নালন্দ-বিহারের সঙ্ঘ স্থবির নিযুক্ত করেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নালন্দ-বিহার বিরাজমান ছিল। মুসলমান আক্রমণে ইহার ধ্বংসসাধন ঘটে।

নালন্দ-বিহারের ধ্বংসাবশেষের সম্মুখে, রাস্তার বিপরীত দিকেই গভর্মেণ্টের আর্কিওলজিকেল বা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বাংলার ফটক দেখিয়া, প্রথমে তাহাতেই প্রবেশ করিলাম। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থ একটী সুন্দর তাঁবুতে তখন সেণ্ট্রাল সারকেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও নালন্দ খননের ভার-প্রাপ্ত বাঙ্গালী কর্ম্মচারী উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা আমাদিগকে প্রথমে খননস্থান দেখিতে বলিলেন। বাংলা-সংলগ্ন ক্ষুদ্র মিউজিয়মটী বারটার সময় খোলা হইবে, ইহাও জানাইয়া দিলেন। তথা হইতে বাহির হইয়া আমরা খননস্থানের প্রবেশ-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

দ্বারে প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের একজন চাপরাসী ছিল, সে আমাদিগকে লইয়া ইষ্টক নির্ম্মিত দুইটী উচ্চ দেওয়ালের মধ্যস্থিত প্রাচীন পথ দিয়া বিস্তৃত প্রাঙ্গণে উপস্থিত করিল। প্রাঙ্গণের পূর্ব্ব দিকে সারি সারি বিহার-সৌধ ও পশ্চিম দিকে স্তূপগুলি অবস্থিত। নালন্দর এই বিরাট ধ্বংসাবশেষ দৈর্ঘ্যে প্রায় দুই হাজার ফিট এবং প্রস্থে প্রায় সাত শত ফিট স্থান জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে। ফটো তুলিবার আশায় ক্যামেরা বাহির করিতেই, চাপরাসী নিষেধ জানাইল। নিকটেই একজন কর্ম্মচারী বসিয়া ছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে চারিজনের জন্য আট আনা দিয়া "দর্শনার্থীর পাশ" গ্রহণ করিতে হইল। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের প্রকাশিত, নালন্দ খননের একখানি ইংরাজী সচিত্র বিবরণ-পুস্তিকা সেই সময় ক্রয় করিয়া লইলাম। সঙ্গের চাপরাসী আমাদের সমস্ত স্থান দেখাইবার ভার লইল।

সর্ব্বাগ্রেই আমরা ধ্বংস-স্থানের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষক দক্ষিণধারে স্থিত প্রধান স্তূপে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বিশালকায় চতুষ্কোণ স্তূপ একটী বাঁধান প্রাঙ্গণের মধ্যস্থানে

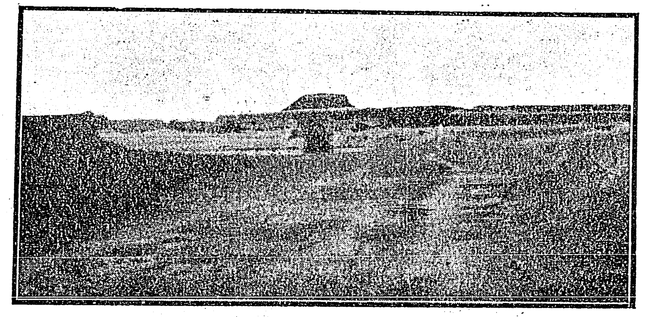

নালন্দ— খননস্থানের বাহিরের দৃশ্য

অবস্থিত। প্রাঙ্গণের চারি দিকে অনেকগুলি ক্ষুদ্র স্তূপও দেখিতে পাইলাম। পূর্ব্ব দিকে, বামে অবলোকিতেশ্বরের একটী দণ্ডায়মান বৃহৎ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া গেল। ইহার উপরে একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত আচ্ছাদন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সিঁড়ি বহিয়া স্তূপের সর্ব্বোপরি উঠিতেই, সমগ্র খনন স্থানটী একসঙ্গে সুস্পষ্ট দেখা গেল। আশেপাশের অনেকদূর পর্য্যন্তও দেখিতে পাইলাম। উপরে পূর্ব্বকালে যে একটী ছোট মন্দির ছিল, তাহার প্রমাণ বিদ্যমান। মন্দিরের অবশিষ্ট নিম্নাংশের দেওয়ালগাত্রের মূর্ত্তিগুলি অবিকৃতই রহিয়াছে, দেখিলাম। শিল্পীবন্ধু মূর্ত্তিগুলির, স্থপতিবন্ধু গাঁথনির প্রশংসায় ব্যস্ত ছিলেন। আমি নালন্দর ধ্বংসাবশেষের বিশালতা দেখিয়া বিস্ময় ও আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম। জগতে নানা দেশে প্রাচীন দুর্গ, রাজ-

প্রাসাদ, সমাধি-মন্দির ও ধর্ম্মমন্দির প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান। কিন্তু এত বড় প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ধ্বংসাবশেষ কোথাও আছে কি না আমার জানা নাই। দেড় সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার নালন্দ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মত এইরূপ বিশাল প্রতিষ্ঠান, বর্ত্তমান যুগেও যে কোন শিক্ষাভিমানী সভ্য জাতির ও দেশের পক্ষে মহা গৌরবের বিষয়, বলিয়াই বোধ করিলাম। মানসচক্ষে যেন প্রাঙ্গণমধ্যে সহস্র সহস্র পীতবসন-পরিহিত সৌম্যমূর্ত্তি বৌদ্ধ ছাত্র ও আচার্য্যের গমনাগমন দেখিতে পাইতেছিলাম। হঠাৎ বন্ধুদের আহ্বানে চমক ভাঙ্গিল। দেখিলাম, তাঁহারা নামিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমিও নামিতে সুরু করিলাম।

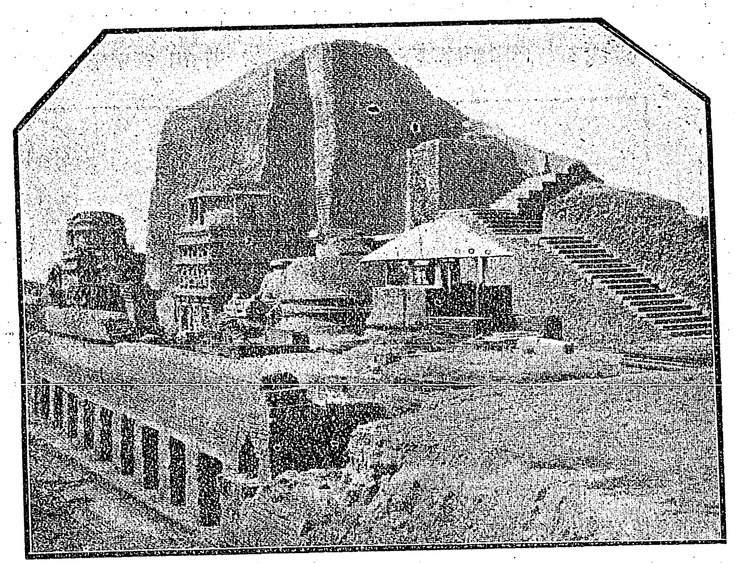

নালন্দ—প্রধান স্তূপের সাধারণ দৃশ্য

খননের ফলে প্রকাশ পাইয়াছে যে, প্রথমে এই স্থানে একটী ক্ষুদ্র স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। পরে সর্ব্বপ্রাচীনটীর ধ্বংসাবশেষের উপরে ও চারি দিকে কয়েকটী স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া আকার বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। বর্ত্তমান বড় স্তূপটী অন্ততঃ সাতটী ছোট স্তূপের সমষ্টিতে গঠিত। তিনটি একবারে বড় স্তূপের মধ্যে প্রবিষ্ট রহিয়াছে এবং বাকি চারটী বাহিরে সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে একটী স্তূপ অতি সুরক্ষিত ভাবেই আছে, বলা যাইতে পারে। এই স্তূপটীর গাত্রে সারি সারি সুন্দর বুদ্ধ ও বোধিসত্বমূর্ত্তি সজ্জিত দেখিলাম। পার্শ্বদেশ ঘুরিয়া স্তূপের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে নাগার্জ্জুনের মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম।

স্তূপের প্রাঙ্গণ হইতে বাহির হইয়া, তাহার পূর্ব্বপার্শ্বস্থিত দুইটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বিহার-সৌধের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া, সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বড় বিহার-সৌধে উপস্থিত হইলাম। প্রশস্ত সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া, পূর্ব্বেকার যে সকল প্রস্তর-স্তম্ভের উপর ছাদ রক্ষিত ছিল, তাহার অতি নিম্ন অংশ মাত্র এখন অবশিষ্ট রহিয়াছে, দেখিলাম। বারাণ্ডা অতিক্রম করিয়া ভিতরে প্রবেশ-পথের পার্শ্বস্থিত গৃহ হইতে খননের সময় একটী তাম্র-ফলক পাওয়া গিয়াছে। ইহা পাল রাজবংশের তৃতীয় রাজা দেবপালের সময়ের। তিনি নবম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ফলকে লিখিত আছে যে, "সুবর্ণদ্বীপের (সুমাত্রার) অধিপতি শ্রীবলপুত্রদেব, নালন্দে একটী বিহার-সৌধ নির্ম্মাণ করাইয়া, তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও আগত ভিক্ষুদের স্বাচ্ছন্দের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ, শ্রীনগর (পাটনা) বিভাগের রাজগৃহ ও গয়া জিলার কয়েকটী গ্রাম দান করিলেন। তিনি নিজ রাজ্যের কয়েকটী গ্রাম দেবপালদেবকে দিয়া, পরিবর্ত্তে ঐ সকল গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

প্রবেশ-পথের আশে পাশে, বালি ও চূণের জমাটে নির্ম্মিত বিশেষভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত কয়েকটী মূর্ত্তির অংশ দেখিতে পাওয়া গেল।

নালন্দ খননের ফলে একটা বিশেষ বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে যে, এই একই স্থান কয়েকবার পরিত্যক্ত ও পুনর্গৃহীত হইয়াছিল। উপরিস্থিত ধ্বংসপ্রাপ্ত বিহার-সৌধের নিম্নে তৎপূর্ব্বেকার ধ্বংসপ্রাপ্ত বিহারের সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

আমরা নিম্নেকার বিহারটীতে ভিক্ষুদের বাসোপযোগী সারি সারি গৃহ দেখিতে পাইলাম। পূর্ব্বদিকের মধ্যভাগে যে পূজার স্থান ছিল, সেখানে একটা বৃহৎ আকারের ভগ্ন

উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তির পদদ্বয় ও বস্ত্রের অংশ মাত্র রহিয়াছে, দেখা গেল। বারাণ্ডায় অন্য অনেকগুলি ভগ্ন প্রস্তর-মূর্ত্তিও দেখিলাম। এক কোণে, শিব ও পার্ব্বতীকে পদতলে চাপিয়া দণ্ডায়মান, গলে নানা ভঙ্গীর ক্ষুদ্র বুদ্ধ-মূর্ত্তি যুক্ত দীর্ঘ মাল্য পরিহিত ত্রৈলোক্য-বিজয়ের ভগ্ন মূর্ত্তির নিম্ন ভাগ মাত্র রহিয়াছে, দেখিতে পাইলাম। প্রাঙ্গণের মধ্যে একটী উচ্চ চতুষ্কোণ চৈত্য ও এক কোণে বাঁধান কূপ রহিয়াছে দেখিলাম।

উপরে নির্ম্মিত বিহারে ভিক্ষুদের বাসগৃহের বিশেষত্ব দেখা গেল। তাহাতে প্রতি গৃহে, মেঝে হইতে হাতখানেক উচ্চ দুইটী করিয়া শয়নমঞ্চ গাঁথা রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম।

পার্শ্ববর্ত্তী বিহারের উপরের অংশে উপস্থিত হইলাম। এই বিহার-সৌধের অর্দ্ধাংশ খুব নীচে পর্য্যন্ত খনন করিয়া, তৎপূর্ব্বে নির্ম্মিত বিহারের ধ্বংসাবশেষ দেখান হইয়াছে। নীচেকার বিহারটী যে অগ্নিতে ধ্বংস পাইয়াছিল, তাহার প্রমাণস্বরূপ দগ্ধ দেওয়াল ও চৌকাট বর্ত্তমান রহিয়াছে, দেখিলাম। বিহারের প্রাঙ্গণের এক কোণেও একটী বাঁধান কূপ দেখিতে পাইলাম।

উক্ত বিহারের সংলগ্ন আর একটী বিহারে এক দিকের বাস-গৃহগুলি খনন মুক্ত করা হইয়াছে এখানে এক সারি গৃহের পশ্চাতে, মধ্যে প্রবেশদ্বার-যুক্ত আর এক সারি গৃহ দেখা গেল।

পরের বিহারে ইষ্টক-মণ্ডিত দুইটী প্রাঙ্গণ দেখিলাম। নীচেরটী প্রথমকার বিহারের ও উপরেরটী তাহার ধ্বংসের পরে নির্ম্মিত অপর একটী বিহারের, বুঝিতে পারা গেল। উপরের প্রাঙ্গণে ভিক্ষুদিগের রন্ধন কার্য্যে ব্যবহৃত দুই জোড়া লম্বা আকারের চুল্লী দেখিতে পাইলাম। এক ধারে একটী বাঁধান কূপ দেখিলাম। এই বিহার ও পরবর্ত্তী বিহারের মধ্য দিয়া একটী রাস্তা রহিয়াছে, দেখা গেল।

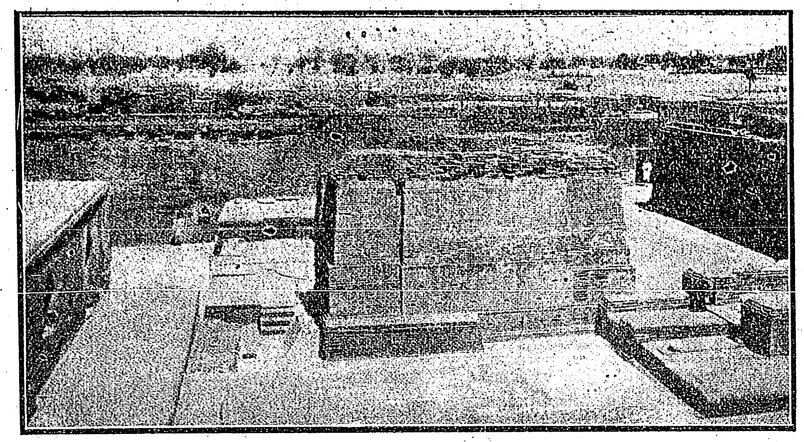

[নালন্দ—বড় বিহারের প্রাঙ্গণমধ্যস্থ চৈত্য এবং পার্শ্বের গুহাবলি

শেষে যে বিহারটীতে যাইলাম, তাহার প্রাঙ্গণ খনন করিয়া দেখান হইয়াছে যে, এক স্থানে একই নক্সা অনুযায়ী পর পর তিনবার বিহার নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল।

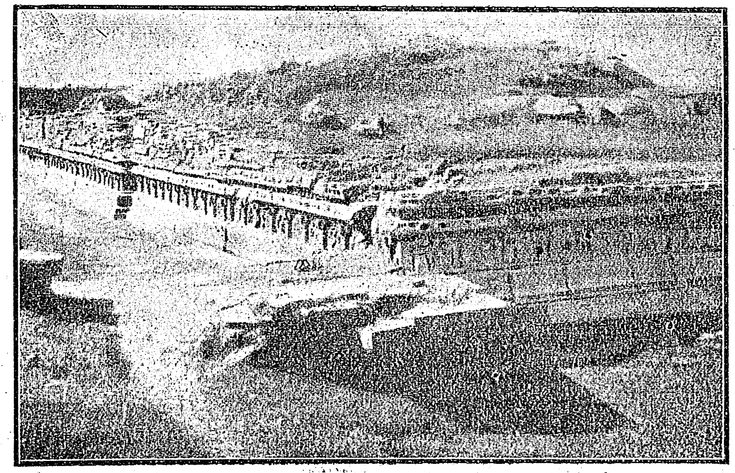

নানা মূর্ত্তিশোভিত প্রস্তর-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ

এই বিহারের পশ্চাতেই একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত বৃহৎ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা গেল। চারি দিকে নানারূপ খোদিত মূর্ত্তি—বিভিন্ন ভঙ্গীর মনুষ্য, বাদনরত কিন্নরী, শিব-পার্ব্বতী, কার্ত্তিকেয়, জাতকের গল্পের চিত্র, সাপুড়িয়া, ধনুর্দ্ধারী প্রভৃতি রহিয়াছে, দেখিলাম।

চাপরাসী জানাইল, দ্রষ্টব্য সকল বস্তুগুলিই আমাদের দেখান হইয়াছে। তাহাকে কিছু বকশিস দিয়া বিদায় করিলাম। খনন-কার্য্য চলিতেছে, সেই অবস্থায় দেখিবার জন্য আমরা মুক্ত প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া অপর দিকে দ্বিতীয় স্তূপের স্থানে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, স্তূপটী প্রায় খনন মুক্ত হইয়াছে এবং হেলান অবস্থায় রহিয়াছে। অনেক অংশ বিকৃত হইলেও, স্থান বিশেষের কারুকার্য্য এখনও যেন নূতনের মত বোধ হইল। প্রথম স্তূপের অপেক্ষা আকারে ছোট হইলেও, সংস্কারের পর এটীও যে একটী বিশেষ দর্শনীয় বস্তু হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নিকটে একটী চালার ভিতর মৃত্তিকা-নির্ম্মিত অতি বৃহৎ ভগ্ন বুদ্ধ-মূর্ত্তি রহিয়াছে, দেখিলাম। পার্শ্বে একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত ভগ্ন ছোট মন্দিরও দেখা গেল।

শুনিলাম, এখন প্রায় আড়াই শত শ্রমজীবী খনন-কার্য্যে নিযুক্ত আছে। পূর্ব্বে প্রায় সাত শত জন কাজ করিত। ছোট লাইন বসাইয়া ট্রলি করিয়া মৃত্তিকা দূরে ফেলা হইতেছে। খনন মুক্ত বিহার-সৌধ ও স্তূপের মেরামতের জন্য বিভিন্ন আকারের ইট ও টালি ইত্যাদি ঐখানেই প্রস্তুত করা হইতেছে। ইংরাজী ১৯১৫ সাল হইতে খনন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহা শেষ হইতে আরও কত বৎসর লাগিবে, তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না।

বিহার স্থান হইতে বাহির হইয়া আমরা প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের বাংলার মধ্যস্থ ক্ষুদ্র মিউজিয়মে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ইহা দৈনিক মাত্র এক ঘণ্টার জন্য (১২টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত) খোলা থাকে। দুইটী নব-নির্ম্মিত সুন্দর গৃহে খনন কালে প্রাপ্ত নানা প্রকার মৃৎপাত্র, ব্রোঞ্জ ধাতু নির্ম্মিত মূর্ত্তি ও ধুনুচি, লৌহ-নির্ম্মিত তালা, কয়েকটী মুদ্রা ও তাম্রফলক এবং উৎকীর্ণ ইষ্টক প্রভৃতি সযত্নে রক্ষিত আছে, দেখিলাম।

দেখা শেষ হইলে, আবার গোযানে আরোহণ করা গেল। বেলা দেড়টা আন্দাজ নালন্দ ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। ছোট ষ্টেসন, মাষ্টার মহাশয় তখন পার্শ্বের ঘরটীতে নিদ্রার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার অনুমতি লইয়া, আমরা টিকিট ঘরের মধ্যে বসিয়াই আহার সারিয়া লইলাম।

দুইটার সময় আমাদের গোযান রাজগির যাত্রা করিল। মধ্যপথে শিলাওএ ফিরিয়া আমরা সকলেই কলিকাতা লইয়া যাইবার জন্য আবশ্যকমত খাজা ক্রয় করিয়া লইলাম। রাজগিরে ধর্ম্মশালায় আসিয়া পৌঁছাইতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল।

সুবিধা মত যাতায়াতের ট্রেণ না থাকায় আমরা রাজগির হইতে নালন্দ দেখিয়া আসিতে গো-যানের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। কিন্তু পরে মনে হইয়াছিল, চার ক্রোশ পথ হাঁটিয়া গিয়া, ট্রেণে ফিরিবার ব্যবস্থা করিলেই ভাল হইত। সময়ও কম লাগিত।

রন্ধনোৎসাহী বন্ধুরা সে রাত্রে আর উৎসাহ দেখাইলেন না। সেজন্য দোকান হইতে আনীত পুরী, তরকারী ও মিষ্টান্নের দ্বারা নৈশ ভোজ সমাধা করা গেল। আমরা সাড়ে নয়টার মধ্যেই শুইয়া পড়িলাম।

আমাদের রাজগির বাসের তৃতীয় রাত্রি প্রভাত হইল, ২৭শে অক্টোবর মঙ্গলবার, সকলে ছয়টার মধ্যেই উঠিয়া পড়িলাম। প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া এবং ব্যবস্থাদির পর কুকারে রান্না চড়াইয়া বাহির হইতে আটটা বাজিয়া গেল। ষ্টেসনের পথ ঘুরিয়া আমরা প্রথমে ব্রহ্মদেশীয় ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইলাম। এটী অন্য ধর্ম্মশালা হইতে একটু দূরে বিপুলগিরির প্রায় পাদদেশে অবস্থিত। বাড়ীটি ছোট, সুন্দর ও সযত্নরক্ষিত। বাসের গৃহ অল্প বলিয়া পার্শ্বেই আবার একটী নূতন বাড়ী নির্ম্মিত হইতেছে, দেখিলাম। ধর্ম্মশালাস্থিত একটী গৃহে, কারুকার্য্য খচিত স্বর্ণাভ সিংহাসনের উপর সুন্দর বুদ্ধমূর্ত্তি দর্শন করিলাম।

সেখান হইতে বাহির হইয়া, প্রাচীন প্রাকার অতিক্রম করিয়া অল্প দূর যাইতেই বামে একটী ছোট রাস্তা পাইলাম। সেই রাস্তা ধরিয়া আমরা বিপুলগিরির পাদদেশে স্থিত মকদুমকুণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

মুসলমানগণের বিহার বিজয়ের পর, বহু মুসলমান সাধু সুখস্বাস্থ্যময় রাজগৃহে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে পীর মকদুমশাহের নাম বিহার অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। মকদুমশা বিপুলাচলের পাদদেশে স্থিত তীর্থ

ঋষ্যশৃঙ্গ-কুণ্ডে আসিয়া বাস করেন এবং নানা অলৌকিক ক্রিয়া দেখাইয়া সাধারণের ভক্তি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হন। ঋষ্যশৃঙ্গ-কুণ্ড তখন হইতে মকদুমকুণ্ড বলিয়া গণ্য হয়। অদ্যাবধি বহুদূর স্থান হইতেও ভক্ত মুসলমানগণ এই কুণ্ড দর্শনে আসিয়া থাকেন।

সদর দ্বার দিয়া কুণ্ডারাসে প্রবেশ করিতে, বামে স্নানের কুণ্ড ও দক্ষিণে একটী মস্‌জিদ দেখিতে পাইলাম। মস্‌জিদের পরেও একটি ছোট কুণ্ড রহিয়াছে, দেখিলাম। ভিতরে প্রাঙ্গণের দুই পার্শ্বের সারি সারি গৃহে অনেক মুসাফির ছিলেন। তন্মধ্যে একজন পাবনাবাসী মুসলমান ভদ্রলোক অনেকক্ষণ আমাদের সঙ্গে আলাপ করিলেন। প্রাঙ্গণের শেষ দিকে কয়েক ধাপ উপরে উঠিয়া, পর্ব্বতগাত্র-স্থিত পীরের বাসের গুহাটীর সম্মুখভাগ গাঁথিয়া সুন্দর একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া রাখা হইয়াছে, দেখিলাম। পার্শ্বের আর একটী সরু সিঁড়ি দিয়া পর্ব্বতগাত্রে অল্প দূর উঠিয়া, সমাধিস্থান দেখা গেল। সঙ্গে ক্যামেরাটী না থাকায়, কোন চিত্র সংগ্রহ করা হইল না।

তথা হইতে বাহির হইয়া, আমরা অল্পক্ষণের মধ্যেই ব্রহ্মকুণ্ডে গিয়া উপস্থিত হইলাম। শেষের দিনের স্নান সারিতে একটু অধিক সময়ই ব্যয় করা গেল। ফিরিবার সময় কেবল মনে হইতে লাগিল, আরও কয়েক দিন থাকিয়া রাজগৃহের সকল দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়া যাইলে ভাল হইত। ধর্ম্মশালায় পৌঁছাইতে আমাদের দশটা বাজিয়া গেল।

যথাসময়ে আহারাদি শেষ করিয়া, একটু বিশ্রাম করিতেছিলাম, কালীচরণ পাণ্ডা তাহার খাতা লইয়া উপস্থিত হইল। খাতা পরীক্ষা করিয়া তাহাতে অনেক জানিত বিশিষ্ট বাঙ্গালীর হস্তাক্ষর দেখিলাম। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ দেহত্যাগের বর্ষে (১৯২৫) গোড়ার দিকে রাজগৃহে কয়েক দিন সপরিবারে বাস করিয়া গিয়াছিলেন। খাতায় তাঁহার হস্তাক্ষরও দেখিতে পাইলাম। পাণ্ডাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ ও মাত্রানুযায়ী পারিশ্রমিক দিয়া, সকলে তাহার খাতায় নাম ঠিকানা ইত্যাদি লিখিয়া দিলাম। জিনিষপত্র গুছাইয়া লইয়া, ধর্ম্মশালার রক্ষককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়া, আমরা তিনটার পর ষ্টেসন অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

চারটার সময় আমাদের ট্রেণ ষ্টেসন ত্যাগ করিল। শেষবারের মত রাজগৃহের গিরিশ্রেণীর দিকে চাহিয়া রহিলাম। কোলাহলময় কর্ম্মজীবনের মধ্যে কয়দিন মাত্র অবসর গ্রহণ করিয়া রাজগৃহে যে শান্তিলাভ করিয়াছি এবং ভারতের প্রাচীন গৌরবের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিয়া একসঙ্গে যেরূপ দুঃখ ও আনন্দ অনুভব করিয়াছি, তাহার স্মৃতি কখনও মুছিবার নয় বলিয়াই মনে হইতে লাগিল।

সন্ধ্যা সাতটা আন্দাজ আমরা বক্তিয়ারপুরে আসিয়া পৌঁছিলাম। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরেই কলিকাতাগামী দানাপুর এক্সপ্রেস্ আসিয়া পড়িল। আমরা তাহাতে উঠিয়া, পরদিন ২৮শে অক্টোবর বুধবার সকাল ছয়টায় যথাসময়েই হাওড়ায় উপস্থিত হইলাম।

নিবেদন—এই প্রবন্ধে লিখিত প্রাচীন বিবরণ সমূহ সংগ্রহের জন্য মহাভারত, বিশ্বকোষ, সরকারী বিবরণ, অভিধান ও ইতিহাস পুস্তকাদি হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, সেজন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এতৎসহ প্রকাশিত চিত্রগুলির মধ্যে কতকগুলি আমার সহযাত্রী বন্ধুদের গৃহীত। নালন্দর ভিতরের চিত্র তিনখানি প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের প্রকাশিত বিবরণ পুস্তিকা হইতে গ্রহণ করিয়াছি। অন্য কতকগুলি চিত্র অগ্রজতুল্য শ্রীযুক্ত তারাদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতে পাইয়াছি। এ জন্যও সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলাম।

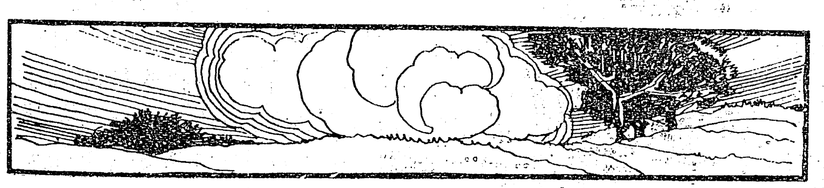

আর এক দিক

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

খোলা জানালার পথে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের এক টুক্‌রো চোখে পড়ে। বাতাস আস্‌চে কত দূর থেকে, কত মাঠ পার হয়ে, কত কুটীরের উপর দিয়ে। রাত বোধ হয় দুটো হবে। সহর আর রেঁচে নেই, এমনি রাত্রে জেগে থাকতে থাকতে তাই মনে হয়; মনে হয় পৃথিবীর প্রাণ-চাঞ্চল্য হঠাৎ থেমে গেচে। এমনি রাত্রে টেবিলের ধারে বসে থাকতে থাকতে অনেক কথাই মনে হয়। পৃথিবীর বিপুলতার তুলনায় নিজের সীমাবদ্ধ শক্তির কথা মনে করে দুর্ব্বলতা বোধ করতে হয় নিজের মধ্যে।

প্রকাশও ফিকে-নীল আলো-জ্বালা ঘরটীতে বসে বসে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। তার হাতে একটা চুরুট, কিন্তু কতক্ষণ যে সেটাতে টান দেওয়া হয় নি তা ওর আর মনেই নেই। সেটাতে ছাই এতখানি জমা হয়েচে যে এখুনি তার গায়ে পড়'বে। কিন্তু প্রকাশ তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে, তারার-ফুল-বিছানো আকাশের দিকে। ঠিক সে দিকে ও হয় ত চেয়ে নেই, বুঝি কোন দিকেই ও চাইচে না।

ওর টেবিলের ওপর খানকয়েক ইংরিজী বই, একটা পেন্, পেনের কালি, একটা ছাইদানি, গোটাকতক আলপিন্, খানকয়েক খাতা, একটা লেটার-প্যাড্। লেটার-প্যাড্‌টার ওপর একখানা খাম। খামের ওপর অপটু হস্তে লেখা তারই নাম—প্রকাশ রায়। চিঠিখানা ও পড়েচে, বেশ ভাল করেই পড়েচে। খুব কম হলেও বার পাঁচেক তাকে চিঠিখানা পড়তে হয়েচে। এইবার চিঠিখানার জবাব তাকে লিখ্‌তে হ'বে। কি লিখ্‌বে তা সে জানে, তবে কি করে লিখ্‌বে তাই নিয়ে ভাবনা। চিঠি সে জীবনে অনেককে লিখেচে, কিন্তু অনেককে যা লেখা যায় আজকের চিঠিখানি ঠিক সে রকম হবে না। আজ রাত্তিরেই চিঠিখানা তাকে শেষ করতে হবে, কারণ, সে চলে যাচ্চে বাইরে এবং সুমিতা তাকে লিখেচে চিঠি পেয়েই যদি না আসতে পারো ত তখুনি চিঠির জবাব দিও। সুমিতার প্রথম প্রস্তাব প্রকাশ রাখতে পারচে না, কাজেই ওর শেষ কথাটা ও রাখবে। এমন ভাবে রাখবে যে সুমিতা আর কখনও তাকে চিঠি দিতে বলবে না।

প্রথমে এল সম্বোধন-সমস্যা। ইতিপূর্ব্বে সে সুমিতাকে চিঠি লেখে নি; আজই প্রথম এবং শেষও। শুধু মিতা বলে ডাকলে সুমিতা হয় ত হাসবার সুযোগ পেতে পারে এবং তাতে বড় বেশী কবিতা হ'য়ে যায়। 'প্রিয়া' প্রমুখ সম্বোধনগুলো পুরানো হয়ে গেচে, যদিও সুমিতাই তার প্রিয়া, যে প্রিয়া অহেতুক ঘনিষ্ঠতা ও অকারণ দূরত্ব দিয়ে নিজেকে অপরূপ করে রাখে; যে কাছে টানে, কিন্তু কাছে আসে না। চিঠিতে সেই শব্দটা ও কিছুতেই প্রয়োগ করবে না।

অনেক ভেবে স্থির হল, শুধু সুমিতা ছাড়া আর কিছু সে সম্বোধনে ব্যবহার করবে না। নিরাভরণ সুমিতা,—নিরলঙ্কার।

প্রকাশ লিখ্‌ল—

সুমিতা,

তোমার চিঠি পেলাম একটু আগে। এতদিন তুমি চিঠি লেখো নি সেইটেই আশ্চর্য্যের। চিঠি লিখে তুমি ভালই করেচ; নইলে আমার যা বলবার তা বোধ হয় কোন দিন বলাই হত না। একটী একটী করে আমি তোমার সমস্ত কথার জবাব দেব; এমন অনেক কথাই বলব যা তুমি ভাবতে পারো না। কিন্তু বলা দরকার।

হঠাৎ আমি কেন গা-ঢাকা দিলাম তুমি তা জানতে চেয়েচো। এখনও গা-ঢাকা দিই নি এই চিঠিই তার প্রমাণ। তোমাকে আমার কথাগুলো না জানিয়ে ঠিক স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। এই চিঠির পর আমার আত্মগোপনের আর কোন বাধা রইল না। তুমি হয় ত ভাবচো যে এইবার আমি তোমার নিন্দা সুরু করব; কিম্বা লিখ্‌বো যে উত্তেজনাপূর্ণ একটা কবিতা লিখে আমি জেলে যেতে বসেচি, না হয় আমার টাকা-কড়ির এত অভাব যে মর্য্যাদা বজায় রাখবার মতো কাপড়-জামা জোগাড় করতে না

পেরে তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারচি না। তুমি জানো, তোমার নিন্দা আমি মুখের সামনেই করেচি, এবং তাতে তুমি রাগ কর নি কোন দিন। উত্তেজনাপূর্ণ কবিতা ছেড়ে আমি এখন প্রেমের কবিতা লিখ্‌চি এবং সেগুলির মূলে আছো তুমি নিজে—এ কথাও বোধ হয় তোমার অজানা নয়। আর পোষাক? পোষাকের দিক দিয়ে কোন দিনই আমি আপটু-ডেট্ নই, দৃষ্টি থাকলেই তা বোঝা যায়। পাঞ্জাবীর মালিন্য ঢাকবার জন্যে আমি কোন দিন সেটাকে ফরসা চাদর দিয়ে আবৃত করতে চাই না।

তুমি প্রশ্ন করতে পারো যে আমি তোমায় ভালবাসি কি না! ভালবাসি কি না, সেটা এত সহজে আমি বুঝতে পারি না যে তোমার সঙ্গে মাত্র ছ'টী মাসের আলাপের পরেই তার জবাব দিতে পারব। ছ'টী মাস তোমার-আমার জীবনের কতটুকু,—একটা সামান্য ভগ্নাংশ বই ত নয়। ছ'টী মাস আমি তোমার সঙ্গে আলাপ করেচি, এতে তুমি লিখেচ যে আমায় অত্যন্ত কাছে না পেলে তোমার অস্বস্তির আর অন্ত থাকে না। চোখে ঘুম নেই, আহারে নেই রুচি, তৃতীয়ার চাঁদের মত তোমার তনু ক্ষীণ হয়ে গেছে, এ সব কথা যে লেখ নি এ জন্য তোমায় ধন্যবাদ। হ্যাঁ, অস্বস্তি বোধ করাটা স্বাভাবিক বলে বুঝতে পারি। আর কিছু লিখলে আমি মনে মনে বোধ হয় হাসি চাপতে পারতাম না। কারণ, আমার মত এই যে ছ' মাস আমরা যে নৈকট্য অনুভবের সুযোগ পেয়েচি, আগামী ছ' মাস যদি তা আর না পাই তা হলে তোমার মনের বর্ত্তমান অবস্থা কেটে যাবে। আসল কথা এই যে আমি বিশ্বাস করি না তুমি আমায় ভালবাস। ভাল লাগাকেই আমরা অনেক সময় ভালবাসা বলে ভুল করে ফেলি এবং তার জন্যে পরে আর অনুতাপের অন্ত থাকে না। দুটোর মধ্যে তফাৎ অনেক। মনে করো না যে মানুষের ভালবাসায় আমার বিশ্বাস নেই। আমার বিশ্বাসের আদর্শ এত উঁচু যে সব ভালবাসাকে স্বীকার করতে আমার কুণ্ঠা বোধ হয়।

তোমাতে আমাতে কত জনকোলাহল-ক্ষান্ত দুপুরে মুখোমুখী বসে গল্প করেচি, নিশ্চয়ই সে সব তোমার মনে আছে। কখনও দু'জনে পাশাপাশি দু'টী চেয়ারে, কখনও আমি চেয়ারে, তুমি নীচে—আমার হাঁটুর উপর মাথা রেখে। ঘরের কপাট ভেজানো থাকৃত, কিন্তু সেই আধ অন্ধকারেই দেখতাম তোমার স্বচ্ছ দু'টী চোখ একাগ্র বিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে আছে; কখনও বা তোমার একটী হাত এসে আমার হাতের মুঠিতে আশ্রয় নিয়েচে। তোমার ছেলে-মানুষী প্রশ্নগুলির উত্তরে আমিও ছেলে-মানুষের মত জবাব দিয়েচি; তুমি যখন বড় বড় কথা জান্‌বার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করেচো, আমি সাধ্যমত তার উত্তর দিয়েচি। আর্ট সম্বন্ধে আমার ধারণা কি শুন্‌তে শুন্‌তে তুমি তন্ময় হয়ে যেতে; কখনও বল্‌তে 'আমি কিছুতেই তেমন হ'তে পারি না! কি করে সে রকম হ'তে পারি, তুমিই তা বলে দাও!'

বলেচি আমি অনেক কথা এবং তুমি তা শুনেওচ। কিন্তু সুমিতা, তোমার অতীত ও ভবিষ্যতের বিস্তৃতির তুলনায় সেই ভাব-ব্যাকুল মুহূর্ত্তগুলি কতটুকু? তার জন্যে এমনি করে উতলা হলে কি করে চলে—?

তুমি কলকাতা সমাজের নাম-করা মেয়ে। 'নাম-করা' কথাটার মধ্যে একটা খারাপ ইঙ্গিত আছে, আমি সেটুকু বাদ দিয়েই শব্দটা ব্যবহার করলাম। তোমায় নইলে সহরের সঙ্গীত-সভাগুলি অনেকখানি ঝিমিয়ে থাকে, সভা-সমিতিতে তোমার ঘন ঘন ডাক। কত ভ্যারাইটী-পারফরমান্সে তোমার নাম দেখেচি। তোমার জীবন তাই সীমাবদ্ধ নয়; তোমার ভক্ত অনেক, স্তাবক বহু। আমিও তাদের যে-কোন দলের একটী। তোমার কণ্ঠে সুরের যাদু, চোখে অতল রহস্য। তোমার বাবা কেবল ধনী নন,—ব্যারিষ্টার এবং ব্যারিষ্টার হলেই আমাদের দেশে যা হয় তাই—অর্থাৎ জন-নেতা। তবু তুমি আমার জন্যে অনেকখানি ভাবো এটা নিশ্চয়ই সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু জীবনের দিক্-নির্ণয় তোমার আজও বোধ করি হয় নি। যদি তা করতে তা হলে আমায় চিঠি লেখবার আগে অন্ততঃ একশ বার তোমায় ইতস্ততঃ করতে হত। তা হ'ক্, তোমার পথের ইঙ্গিত আমিই দিলাম এই চিঠিতে।

অপূর্ব্ব চৌধুরীকে তুমি চেনো, আমি তাকে চিনি। অপূর্ব্ব আই-সি-এস্ হয়ে ফিরেচে এ কথাও তোমার জানতে বোধ হয় বাকি নেই। অপূর্ব্বর বাপ প্রচুর পয়সা রেখে গেছেন। আমার যদি একটী মেয়ে থাক্‌ত, তা হলে আমি তার জন্যে অপূর্ব্বর মতই একটী ছেলের খোঁজ

করতাম। অপূর্ব্বর চেহারা এত চমৎকার যে রূপের দিক্ দিয়েও সে একশ লোকের মাঝে বিশিষ্ট হয়ে থাকতে পারে। অপূর্ব্বর কথা আমি তোমার মুখে শুনেচি, আরও অনেকের মুখে শুনেচি। শুনেচি অপূর্ব্ব তোমার বাবার বিশিষ্ট কোন বন্ধুর ছেলে—উপযুক্ত ছেলে। অপূর্ব্বর সঙ্গে তোমার বিবাহ বাবা দেবেন এ কথাও যে তুমি জানো না, এই বা কি করে বলা যায়। অথচ আশ্চর্য্য এই যে তুমি অপূর্ব্ব সম্বন্ধে, কখনও শ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলতে পারো না। আমার কাছেই তুমি তাকে নিয়ে কত তামাসা করেচ। অপূর্ব্ব যে ভাবে সমাজে চলা-ফেরা করে তা নাকি তোমার আদৌ মনে লাগে না। তুমি বলো যে অপূর্ব্ব ব্যবহার-শাস্ত্র খুব ভাল বোঝে, কিন্তু মানুষের সঙ্গে তার ব্যবহারটা ঠিক সুকোমল নয়।

তোমার মনের সঙ্গে একটী জায়গায় আমার মিল রয়েচে। আমাদের দুজনেরই শিল্পী মন; আমরা দুজনেই পৃথিবীর সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করে যেতে পারি। আমি যদি কবিতা লিখে নিয়ে যাই, তা হলে তোমার তা শোনবার জন্য আগ্রহ থাকে খুব বেশী; তুমি যদি রবীন্দ্রনাথের নূতন কোন গান শেখো তা হলে আমিই অবশ্য তা সকলের আগে শুনব এবং এমন তন্ময় হয়ে শুনব যে আমার মনেই থাকবে না যে ঘণ্টা কয়েক পরে আমায় ফিরে যেতে হ'বে বাড়ী; বাড়ী গিয়ে দেখ্‌ব ছোট বোনটার জ্বর এখনও ছাড়ে নি, উপরন্তু বিনা-ভিজিটে ডাক্তার আর আসতে পারবেন না বলে হয় ত আশ্বস্ত করে গেছেন এবং বাবা একতলার অন্ধকার ঘরটীতে পড়ে পড়ে বাতের যন্ত্রণায় অসহ্য চীৎকার করচেন। ভেবে দেখো যে এই একটী মাত্র দিক ছাড়া আর কোন বিষয়ে তোমার-আমার মধ্যে মিল নেই।

আর অপূর্ব্ব?

তোমার গত জন্ম-তিথিতে হীরের যে আংটী দিয়েছিল তারই দাম হবে অন্ততঃ দেড় হাজার টাকা; অপূর্ব্ব সপ্তাহের প্রত্যেক দিন এক একখানা মোটর চড়ে বেড়াতে পারে। তুমি বলো যে অপূর্ব্ব বড় 'রুড্'; ও সর্ব্বদাই নিজেকে জাহির করবার জন্য ব্যস্ত। তোমার কাছে এটা ভাল লাগে না, তুমি একটী, স্বল্প ও সংযত-বাক্ মানুষ চাও, যে কোন দিন তোমার স্বাধীন ইচ্ছাকে আঘাত করবে না। যে তোমাকে কেবল ভালবাসাই দেবে না, তোমার ভাল লাগা বা 'হবি'গুলোকেও ভালবাসবে। এ-রকম রাজ-যোটক মিল হলে অবশ্য সুখেরই কথা, কিন্তু সে সুখের ব্যবহারিক মূল্য কতটুকু সে নিয়ে তর্ক করা যেতে পারে।

তোমার জন্ম-দিনে আমি রেশমী কাপড়ের ওপর একটী কবিতা—আমারই লেখা একটী কবিতা ছাপিয়ে দিয়েছিলাম। জিনিষটা আমার পক্ষে শুধু ব্যয়-সাধ্য নয়, বড়-মানুষী। তবু দিয়েছিলাম, কারণ সে দেওয়ার মধ্যে আনন্দ ছিল এবং জানতাম যে তুমিও তাতে তৃপ্তি বোধ করবে। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে আমার সেই উপহার এবং তোমার সেই তৃপ্তির দাম কতটুকু? সাদা চোখে আমার উপহারটা একটা কবিতা—যার কোন দাম নেই এবং তোমার সেই তৃপ্তিটুকু নিছক মনোবিলাস ছাড়া আর কিছু নয়।

কবিতার এক জায়গায় আমি লিখেছিলাম—

কত লোক দেয় কত হাসির উৎসবে;
জানি মোর দান সেথা খুব ম্লান হ'বে!
তবু মর্ম্ম-মিতা,
তব নামে রচিলাম আমার কবিতা।

এই তবুর দাম আমার কাছে যত বেশীই হ'ক্, পৃথিবী—যেখানে স্বার্থের সঙ্গে স্বার্থের, মনুষ্যত্বের সঙ্গে লাভ-লোকসান আর লোভের প্রতিনিয়ত সংঘাত বাধ্‌চে—সেই পৃথিবী তার কোন দামই দেবে না।

ভালবাসা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের এবং তোমার যা আদর্শ, তার পরিণতি বিবাহ। আমাদের তথা-কথিত ভালবাসার পরিণতি বা পরিণাম যদি তাই হয়, তাহলে তোমার এবং আমার তার চেয়ে দুরদৃষ্ট আমি কল্পনাও করতে পারি না। মনে করো আমাদের বিবাহিত জীবনের কোন একদিন সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ আকাশ অন্ধকার করে মেঘ জড়ো হ'তে লাগল এবং তার পর নামল বৃষ্টি। জানালার কাচ বেয়ে জল গড়াচ্চে, বাইরে বাজ পড়ার শব্দ—টেব্‌ল-ল্যাম্পের সামনে বসে আমার লেখা একটা নতুন কবিতা তোমায় পড়ে শোনাচ্চি। হয় ত তাতে লিখেচি যে আলোক-চিহ্নহীন এমনি উতলা আকাশের নীচে, এমনি জল-ছন্দের মাঝখানে ঘরের কোণে বসে

থাকবার মত অভিশাপ আর নেই; এমনি রাত্রে তুমি এসো, দু'জনে একটা টু-সীটার মোটরে চড়ে ছুটে যাই—লোকালয় ছাড়িয়ে, সহর ছাড়িয়ে, রেলের লাইন পার হয়ে-দিকরেখা-হারা মাঠের উপর দিয়ে। নিজেদের ইচ্ছামত আমরা ছুটব, নিজেদের খুসীমত আমরা যে দিকে হক্ যাব। ঝড়ো-হাওয়ায় তোমার খোঁপা যাবে ভেঙ্গে, জলভেজা চুলগুলি পিঠের উপর, মুখের উপর লুটিয়ে পড়বে; আমি ষ্টীয়ারিং বসে যা-খুসী তাই চীৎকার করব··· ইত্যাদি·····

এই কবিতা শুনে তুমি যদি আকাশের মত উতলা হয়ে ওঠো, তাতে অবশ্য আমি পুলকিতই হ'ব, কিন্তু কবিতা শুনে, খানিক চুপচাপ বসে থাকবার পর, তুমি যদি হঠাৎ বলে ওঠো যে চলো অন্ততঃ রেড্-রোড পর্য্যন্ত দু'জনে মোটরে ঘুরে আসি, তাহলে সম্মতি দেবার আগে অন্ততঃ আমায় পাঁচ মিনিট্ ভাবতে হ'বে। কারণ, কবিতায় একটা ভাবকে প্রকাশ করতে পয়সা খরচ হয় না এবং ট্যাক্সিতে বসে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করলেও ড্রাইভার মিটারের প্রতি অমনোযোগী হ'বে না। পাঁচ মিনিট্ ভেবে আমি হয় ত সম্মতি দেব, কিন্তু সেই পাঁচ মিনিটই আমার এবং তোমার অন্তরের আনন্দকে শুকিয়ে মারবার পক্ষে যথেষ্ট।

টেম্পারামেণ্টের মিল্ আছে বলেই তোমার আমার জীবনে মিল হতে বাধ্য, এ কথা যদি মনে করো, তা হলে তোমার ধারণার প্রশংসা করা আমার পক্ষে কঠিন হবে। পক্ষান্তরে আমি জানি যে প্রথম জীবনে টেম্পারামেণ্টের মিল ছিল না, অথচ বিয়ে হয়েচে এবং তার কয়েক বৎসর পরে একজন নিজের বৈশিষ্ট্যকে এমন ভাবে হারিয়ে ফেলেচে যে কোন কালে তাদের জীবনে অসামঞ্জস্য ছিল তা আর বোঝবার উপায় নাই।

কিন্তু এ-সব তর্কের কথা; এবার আমার প্রকৃত বক্তব্যটা বলি। প্রকৃত বক্তব্যটা এই যে, অপূর্ব্ব তোমাকে সমস্ত মন দিয়ে ভালবাসে। টাকার জন্য তার মনে যদি কোন গর্ব্ব থাকে তা হলে সেটা সহজাত। তার জন্যে তাকে অপরাধী না করে, যারা তাকে সেই টাকার উত্তরাধিকার দিয়ে গেচেন তাঁদেরি দোষী করা বেশী যুক্তি-যুক্ত হ'ত। সত্যি টাকা জিনিষটার বৈশিষ্ট্যই এই যে মানুষের ওপর ওটা একটা ছাপ রেখে যাবেই—যে কোন দিক্ দিয়েই হ'ক্। নিজেকে যদি কোন দিন বিশ্লেষণ করতে পারো তা হলে দেখবে যে তোমার ওপরেও তার একটা ছাপ রয়েচে। তোমার বাবার যদি প্রচুর পয়সা না থাক্‌ত, তা হলে প্রশংসার চেয়ে তোমাকে আজ নিন্দাই কুড়োতে হত বেশী এবং সকলের ভ্রূভঙ্গি উপেক্ষা করে তুমি প্রায় নিরাবরণ হয়ে মঞ্চের উপর দাঁড়াবার সাহস খুঁজে পেতে না। তুমি জানো, আর্ট-এর জন্য তোমার এ-টুকু নির্লজ্জতা আমি মার্জ্জনা করতে পারি, কিন্তু সকলে আমার মত আর্ট-এর জন্য পাগল নয়। এ-কথাটা কেবল প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করলাম।

আগেই বলেচি যে অপূর্ব্ব তোমায় ভালবাসে, এ কথা তুমিও যে জানো না, এ কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। অপূর্ব্বর ভালবাসা এত গভীর তা আগে আমার জানা ছিল না, মাত্র চার পাঁচ দিন আগে হঠাৎ তা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে আত্মপ্রকাশ করেচে।

রাত তখন এগারোটা হবে। একটা রেস্তরাঁয় ঢুকলাম চা খেতে। গিয়ে দেখি এক কোণে অপূর্ব্ব আর তার দু'জন বন্ধু। অপূর্ব্বর সামনে চায়ের পেয়ালা, তার হাতের দামী সিগারেট্‌টা থেকে কেবল ধোঁয়া বার হচ্চে, মুখের কাছে সেটাকে নিয়ে যাবার অবসর তার নেই। স্থান, কাল একেবারে ভুলে গিয়ে ও বন্ধুদের কাছে কেবল তোমার কথাই বল্‌চে। অপূর্ব্বর তখন মনেই নেই যে ও সদ্যঃ-পাশকরা আই-সি-এস, ওর বাপ কলকাতার এক-ডাকে-চেনা বড়-লোক!

অপূর্ব্ব বলছিল,···'কিন্তু আজও ওকে বুঝতে পারলাম না। মনটাকে এমনি সঙ্গোপনে রেখেচে যে সেখানে পৌঁছয় কার সাধ্য!···অথচ, ওর জন্যে আমি কি না পারি, আমাকে সিভিলিয়ানির মোহ ছেড়ে ও যদি কোন দিন অপরিচিত একটী গাঁয়ে গিয়ে বাসা বাঁধতে বলে, তাও বোধ হয় আমি পারি!'

রেস্তরাঁয় বসা আর তখন হয় নি। পথে নেমে কেবলই ভাবলাম, এত বড় নিষ্ঠার কোন দামই সুমিতা ওকে দিচ্চে না,···সত্যি, তোমার ওপর আমার সেদিন রাগ হয়েছিল। সেই তুমি আমাকে লিখেচো চিঠি; এমন ভাষায় তুমি চিঠি লিখেচ যে অপূর্ব্বকে যদি তুমি তার একটী লাইনও

লিখতে তাহলে সে আনন্দে বোধ হয় উন্মাদ হয়ে যেত। কিন্তু আমি জানি অপূর্ব্বকে তুমি তা লিখবে না। কারণ, মেয়েদের একটা নিষ্ঠুর আনন্দ রয়েচে যার ভালবাসা নিশ্চিত ভাবে পাওয়া গেচে তার প্রতি ঔদাসীন্য দেখানর মধ্যে। অথচ, তোমাকে যদি বলা হয় যে অপূর্ব্বর প্রতি তুমি একেবারে বিমুখ হও, তোমার বাবার কাছে গিয়ে বলো যে অপূর্ব্বর এখানে আর আসবার দরকার নেই; তা হলে তুমি বোধ হয় সে সাহসও করতে পারবে না। একসঙ্গে একাধিক পুরুষ-চিত্তকে নিয়ে খেলা করার মোহ তোমাদের মত মেয়ের ভয়ানক বেশী। কিন্তু খেলার সবচেয়ে বড় একটী মুস্কিল এই যে তার জন্যে অনেক সময় আসল কাজে ভুল হয়ে যায়। সে ভুল তুমিও করচো। যাতে সেটা বেশী দিন স্থায়ী না হয়, অনেক দূর এগোতে না পারে, তারি জন্যে এতগুলি অপ্রিয় কথা তোমায় লিখতে হ'ল। আশা করি তুমি আমায় ক্ষমা করবে।

সকলের শেষে আর একটী প্রশ্নের উত্তর দেব। প্রশ্নটা উঠেচে আমার নিজেরই মনের মধ্যে। জানালা খুলে দিয়ে তোমায় চিঠি লিখতে বসেছিলাম; আকাশে ছিল একটুকরো চাঁদ এবং একরাশ তারা। চাঁদের সেই টুকরোটুকু নিভে গেছে—খালি অন্ধকার, তারাময় আকাশ। তোমার একটা ছবি রয়েচে আমার টেবলের সামনে, দেওয়ালে টাঙ্গানো। ছবিটার দিকে চেয়ে নিজের মনেই প্রশ্ন জাগলো, তোমায় পেলে আমি সুখী হব না কেন?

না, সত্যিই তা সম্ভব নয় সুমিতা।

আমাদের যুগে সবচেয়ে বড় অভিশাপ এই যে আমরা নিজেদের বুঝতে পারলাম না; কি চাই তার সঠিক সংজ্ঞা দিতে পারি না। তুমিও না, আমিও না। আমরা যে সময়ে নিজেদের অনুভব করতে শিখ্‌লাম সেটা না নতুনের, না অতীতের। পুরানো বনিয়াদ আজ ভেঙ্গে পড়চে—কিন্তু এর পর কি হবে তা আমরা বুঝতে পারচি না। বুঝতে পারচি যে এতকাল পুরুষ আর নারী যে-পথে, যে-ভাবে চলে এসেচে, সে পথ আমাদের নয়। কিন্তু কোন্ পথ ধরলে ঠিক জায়গায় পৌঁছতে পারব, তা এখনও জানা হল না। সেই জন্যে প্রতিবার পা ফেলতে গিয়ে আমাদের এত সন্দেহ, এত আশঙ্কা। এই অনিশ্চয়তার বিষ তোমাকে যতখানি গ্রাস করেচে, আমাকে তার চেয়ে কম করে নি। কিন্তু অপূর্ব্ব মুক্তি পেয়েচে এ অভিশাপ থেকে; সে নিজেকে ভাল করে জানে। তাই তার কাছে তোমার ভয় পাবার কিছু নেই।

তোমাকে আর অপূর্ব্বকে যদি আমি ভুল বুঝে থাকি, তা হলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তোমার আশঙ্কা বোধ করবার কোন কারণই থাকে না এবং আমার বিশ্বাস সে কারণ কোন দিন ঘটবে না।

আমার স্নেহ আর কুশল-কামনা।

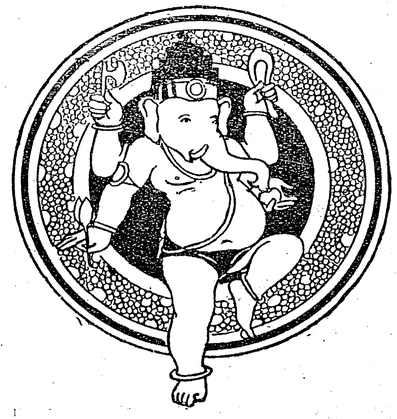

বিবিধ-প্রসঙ্গ

বাংলা বানান

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

গৌষের "ভারতবর্ষে" ভাষা-প্রবীণ শ্রীযুত বীরেশ্বর সেন মহাশয় আমার লিখিত "বাংলা বানান" প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়াছেন। আমি সমালোচনাই চাই। কারণ বাংলা একার সম্পত্তি নয়, কে কি আকারে সে সম্পত্তি ভোগ করিতে চান, তাহা না জানিলে একদেশদর্শিতা হয়। আমার প্রবন্ধের অন্তর্গত দুই একটী বিষয়ে আবার কিছু লিখিতেছি।

ক খ গ ইত্যাদির ধ্বনিকে 'বর্ণ', এবং আকৃতিকে 'অক্ষর' বলি। সেন-মহাশয় লিখিয়াছেন, "আমরা সর্ব্বত্র অনুস্বারকে ঙ রূপে উচ্চারণ করিয়া থাকি"। যদি তাই, তাহা হইলে তাঁহার "বাঙ্‌লা" ও আমার "বাংলা", উচ্চারণে একই। "বাংলা" বানানে তাঁহার আপত্তি থাকিতে পারে না।

কিন্তু আসল প্রশ্ন, ঙ অক্ষরের উচ্চারণ কিরূপ? সংস্কৃত কি ছিল তাহা উপস্থিত প্রবন্ধে না জানিলেও চলে। বাংলা সকল অক্ষরের উচ্চারণ সংস্কৃতের তুল্য নয়। ঙ অক্ষরেরও না হইতে পারে। পারম্পর্যক্রমে ঙ অক্ষরের কি উচ্চারণ চলিয়া আসিয়াছে? "ধাম সা ধাঙ ধাঙ", কিম্বা "পাখীজাতি যদি হঙ; পিয়া পাশে উড়ি যাঙ" (কর্ত্তা মুং), এই দুই উদাহরণে ঙ অক্ষরের উচ্চারণ উঁ কিম্বা ওঁ নয় কি? "শাঙন মেঘ", এখানে ঙ স্পষ্ট উঁ। ইহাই পাঠশালায় ব্রঁঅ বা ওঁঅ পড়া হয়। ধ্বনি দ্বারাই অক্ষরের নাম হইয়াছে। যেমন, 'ক্ষ' বলা হয় 'ক্‌ষ'। এই কারণে ক্ষ-মা বাংলায় খে-মা হইয়াছে। ধ্বনি দ্বারা অক্ষরের নাম না হইলে আর কি প্রকারে হইতে পারিত? ঙ অক্ষরের উচ্চারণ উঁ। ঞ অক্ষরের ইঁ অতএব ভা-ঙা=ভা-উঁআ বা ভা-ওঁআ। সেন মহাশয় পরে লিখিয়াছেন, "অনুস্বারকে ঙ রূপে উচ্চারণ করা ভুল।" ঙ-এর উচ্চারণ অঁ তুল্য। যদি তাই, তাহা হইলে ভা-ঙা=ভা-অঁা।

ব-ঙ্গ হইতে ব-ঙ্গা-ল, ব-ঙ্গা-লী, বা-ঙ্গা-লা। অতএব বা-ঙ্গা-ল, বা-ঙ্গা-লী বা-ঙ্গা-লা। কিন্তু চলিত ভাষায় বলি বা-ঙ্গ্‌-লা। অনুস্বার, বাঙ্গালা উচ্চারণে ঙ্‌। ইহার উদাহরণ দিয়াছি। এই হেতু আমি বাং-লা বানানও করি। এই রূপ, জংলা, হেংলা, নোংরা, খেংরা, ইত্যাদি।

দেশভেদে অক্ষরের উচ্চারণ-ভেদ আছে। পূর্ব্ববঙ্গে ঙ অক্ষরের নাম উ-মা। অর্থাৎ এখানেও উঁআ। গঙ্গার পশ্চিম ও পূর্বপারে কয়েকটি অক্ষরের উচ্চারণ-ভেদ আছে। সেন-মহাশয় পূর্বপারের অনুগামী হইয়াছেন। পশ্চিম পারে অর্থাৎ রাঢ়ে কেহ বা-ঙা-লী বলে না, ছাপায় বা-ঙা-লী দেখিলেও সকলে পড়িবে বা-ঙ্গা-লী।

সেন-মহাশয় "বলে কয়ে চলে গেল" বানানের দোষ দেখাইয়া লিখিতে চান "বোলে কোয়ে চোলে গেল।" কিন্তু এই বানানে দুইটী দোষ ঘটে। ধাতু চিনিতে পারা যায় না। হয়, 'ব-ল, ক, চ-ল' ধাতু পরিত্যাগ করিতে হয়, নয় 'ব-ল বো-ল, ক কো, চ'ল চো-ল,' দুই দুই রূপ রাখিতে হয়। কিন্তু পরিত্যাগের জো নাই। কারণ, 'সে বলে, কয়, চলে,' আছে। দুই দুই রূপ স্বীকার করিলে ধাতুরূপ বাড়িয়া যায়, দুই রূপের পৃথক প্রয়োগ শিখিতে হয়। (২) বাংলা ভাষা মুখে যাহাই বলি, দেশভেদে কত রকমই বলি। কিন্তু লৈখিক রূপ এক। এই কারণে 'বো-লে, কো-য়ে, চো-লে' রূপ প্রচলনের সময় হয় নাই।

যাহাঁরা মৌখিক রূপ লেখেন, তাঁহাদের কেহ 'ব'লে, ক'য়ে, চ'লে', কেহ 'বলে' কয়ে' চলে' লেখেন। এই ঊর্ধ্ব 'কমা' কোন্ বর্ণের চিহ্ন? লেখককুল এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চান না, ইঙ্গিতে বলেন, বুঝিয়া লও। 'সে চলিল',—সে চ'লল, এখানে ঊর্ধ্ব কমা ঈষৎ ইকারের চিহ্ন। কিন্তু 'সে চলিয়া গেল'—'সে চলে' গেল,' এখানে ঊর্ধ্ব কমা কদাপি ইকার নয়, য়-ফলা মনে করিতে হইতেছে। একটা চিহ্নের নানা অর্থ রাখিলে ভাষাশিক্ষা কঠিন হইয়া পড়ে, এই কারণে আমি শৃঙ্গ চিহ্ন দ্বারা ঈষৎ ই জানাইতে চাই, এবং 'বল্যে কয়্যে চল্যে' লিখিয়া য়-ফলা দেখাইতে চাই।

'ব'লে ক'য়ে চ'লে' লিখিবার যুক্তি আছে। 'সে চলিল, তুমি বলিবে'—'সে চ'ল্‌ল তুমি ব'ল্‌বে'। সেইরূপ, 'বলিয়া চলিয়া',—'ব'লে, চ'লে'। অর্থাৎ সর্ব্বত্র প্রথম অক্ষরের পরে ঈষৎ ই চিহ্ন। এবং যেহেতু পরে ই থাকিলে পূর্ব অ-স্বর ঈষৎ ওকার হয়, সেহেতু, 'চ'লল, ব'লবে, ব'লে চ'লে'=উচ্চারণে 'চোল্‌ল বোল্‌বে বোলে চোলে'। কিন্তু হেতুটী হেত্বাভাস। কারণ, 'চ'লল ব'লবে' ইত্যাদিতে 'ইল ইবে' বিভক্তির 'ল, বে' থাকে, যদ্দ্বারা মূল রূপ বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু 'চ'লে ব'লে' লিখিলে 'ইয়া' প্রত্যয়ের কোন চিহ্ন থাকে না, প্রকৃত উচ্চারণও পাই না। এই কারণে আমার মনে হয় 'বল্যে কয়ে চল্যে' লেখা ভাল। আমি জানি 'বোল্লে চোল্লে' পড়িবার আশঙ্কা আছে। আরও জানি নব্যেরা পুরাতন বর্জন করিতে উৎসুক। কিন্তু চাকর্য্যে বাবু, পুণ্যে বাতাস, তিল্যে পাটালী, গুড়্যে সন্দেশ ইত্যাদি বহুবহু শব্দে য়-ফলা যোগ না করিলেও নয়, য়-ফলা না দিলে অধিকরণ কারক বুঝাইবে, বিশেষণ বুঝাইবে না।

এখানে দুই একটা শব্দ দেখি। 'ঠাকুর্দ্দা' বানানে দুই দোষ। (১) ঠাকুর-দাদা, সংক্ষেপে ঠাকুর্‌-দা। অতএব দুইটা দ লেখা ভুল। (২) ঠা-কু-র্দ্দা বানান দেখিলে পড়িতে হয় ঠাকুর্‌দ্‌-দা। মাঝে একটা

দ আসিয়া পড়ে। লেখিকা এত ভাবেন, নাই। কারণ অর্চ্চনা মূর্চ্ছনা, নির্জ্জন নর্ত্তন নর্দ্দন নির্ম্মাণ নির্য্যাস নির্ব্বাণ ইত্যাদি শব্দে রেফ আসিলেই ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয়। পূর্ব্বকালে, একশত বৎসর পূর্বেও, তর্ক্ক, দুর্গ্গা অর্থাৎ তর্‌ক্ক, দুর্‌গ্‌গা বলা ও লেখা হইত। কেহ কেহ এখনও বলেন। কিন্তু কালক্রমে দ্বিত্ব উচ্চারণ লুপ্ত হইতেছে, গোটাকয়েকে ঠেকিয়াছে। মুদ্রাকর-মহাশয়েরা পুরাতন অক্ষর ধরিয়া আছেন, বানানের দুইটী বিধি শিখিতে হইতেছে। লেখকমহাশয়েরা মন করিলে অর্ধ ঊর্ধ্ব বানান চলিতে থাকিবে। আমি বিধি-সাম্যের প্রয়োজন দেখিয়া দ্বিত্ব বর্জন করিয়া থাকি। 'ঠাকুর-দাদা' হয় 'ঠাকুদা' নয় 'ঠাকুদ্দা'। এই দুয়ের 'ঠাকুদ্দা' ঠিক। মৌখিক নামে রেফ শোভা পায় না। এইরূপ, 'ঠাকুরমা'—ঠাকুমা; 'ঠাকুরঝি'—ঠাকুঝি; 'ঠাকুরজামাই'—ঠাকুর্জ্জামাই।

ভিতর শব্দ সং অভ্যন্তর। ভিতর বহুকাল হইতে আছে। 'ভিতরে এস' অভ্যন্তরে। 'ঘরের মধ্যে, ভিতরেও বটে, মাঝেও বটে। 'তোমাদের ভিতরে কে সাহসী'—'ভিতরে' অশুদ্ধ প্রয়োগ। 'আজে-বাজে' কাজের, আ-জেকে হঠাৎ বা-জের "ছায়া" বলিতে পারি না। বিশেষণে "ছায়া" পূর্বগামী হইবার উদাহরণ পাই না। বরং মনে হয় 'বাজে বাজে' হইতে 'আজে বাজে'। এইরূপ, 'বিজি বিজি' (বীজ বীজ) হইতে 'ইজিবিজি' 'হিজিবিজি' জড় দ্রব্যের ছায়া পশ্চাৎগামী হয়, শব্দেরও হয়। যেমন, কাপড়-চোপড়। কিন্তু 'চোপড়' ছায়া নয়, একটা দ্রব্য। জামা-টামা'-র 'টামা'টি "ছায়া"। সেন-মহাশয়ের 'টল-টল', 'টল-মল' শব্দ দুয়ের অর্থ স্বীকার করিতে পারি না। অনেকে এইরূপ যুগল শব্দের ভুল প্রয়োগ করেন। প্রয়োগ দেখিয়া শব্দের অর্থচিন্তা বটে, কিন্তু প্রয়োগে প্রভেদ পাইলে মূল শব্দের অর্থদ্বারা শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করিতে হয়। ইতি

—

জেলালুদ্দিন রুমি

শ্রীবিষ্ণুপদ রায় এম-এ, বি-এল্

বৈষ্ণব কবিগণ একদিন বঙ্গসাহিত্যে যেমন যুগান্তর আনিয়াছিলেন, সুফীগণও তেমনই ভাষায়, ছন্দে, ভাবের গভীরতায় এবং আবেগের প্রবলতায় পারস্য সাহিত্যকে এক অপরূপ সৌন্দর্য্য ও নূতন বৈচিত্র্য দান করিয়াছিলেন। সুফী কবিগণের মধ্যে যাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া যায় জেলালুদ্দিন মহম্মদ তাঁহাদের শিরোমণি। সাধারণতঃ ইনি মৌলানা রুমি বলিয়াই পরিচিত।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নন্দী মহাশয় কবি সেখ-সাদি সম্বন্ধে একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। পারস্য সাহিত্যে সেখ সাদির স্থান অতুলনীয়, কিন্তু আমার মনে হয় সাদি অপেক্ষা রুমিই বাঙ্গালী হৃদয়ের নিকটতর প্রতিবেশী। রুমির জীবনে ও তদ্ রচিত কাব্যে সুফী-সাধনা তাহার সকল সৌন্দর্য্য লইয়া পূর্ণ বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে। এই সুফী সাধনার সহিত বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও বাউল মতের অতি নিগূঢ় ও গভীর সম্বন্ধ আছে। রুমির গজল সাধারণ পারসি গজলের মত মানবীয় প্রেমের উচ্ছ্বাস মাত্র নহে। অনেক সময় তাহা বৈষ্ণব কবির পদের বা বাউলের গানের পারসি অনুবাদ বলিয়া ভ্রম হয়। রুমি স্বীয় জীবনে যে বৈরাগ্য ও ত্যাগের আচরণ দেখাইয়াছেন তাহাতে তিনি আমাদের হৃদয় জয় করিবেনই করিবেন। তিনি যে ভাবোল্লাসপূর্ণ ভক্তিময় জীবন যাপন করিয়াছিলেন, তাহা শুধু বৈষ্ণব মহাজনগণেই সম্ভব। কেবলমাত্র এই কারণেই নহে, রুমি দেশকাল-পাত্র-নির্ব্বিশেষে জগতের অন্যতম মহাকবি বলিয়া সম্মানিত হওয়ার যোগ্য। ইয়োরোপের একাধিক ভাষায় রুমির জীবনী আলোচিত ও রুমির কাব্য অনূদিত হইয়াছে। স্বনামধন্য অদ্বিতীয় জার্ম্মাণ পণ্ডিত হেগেল রুমির দার্শনিক প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। জার্ম্মাণ পণ্ডিত ডি ভন রোজেনবার্গ ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনা নগরী হইতে রুমির দেওয়ানা কাব্যের অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইংলণ্ডের সুধীসমাজেও রুমির যথেষ্ট আদর আছে। ড্যাভিস প্রমুখ কাব্য-সমালোচকগণ রুমির কাব্যালোচনা করিয়া বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে রেড হাউস মসনবি কাব্যের এক অনুবাদ প্রকাশ করেন। তৎপরে ইংরাজি ভাষায় আরও কয়েকখানি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ নিবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত মৌলানা শিব্‌লি রুমির জীবনী ও কাব্য আলোচনা করিয়া উর্দ্দু ভাষায় একখানি সুন্দর গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

মহাপুরুষ মহম্মদের পবিত্র নামের সহিত আরও একজন মহাপুরুষের স্মৃতি ইসলামের ইতিহাসকে চিরদিন উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। ইনি হজরত মহম্মদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী, সর্ব্বপ্রধান সহকর্ম্মী, সর্ব্বপ্রকার মহৎ কার্য্যে দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ও উপযুক্ত উত্তরাধিকারী আবুবকর সিদ্দিক। দুঃখ, বিপদ ও মৃত্যু-শঙ্কার মধ্যে আবুবকর সর্ব্বদা গুরুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। সহজ সরল আদর্শ জীবন লইয়া এই বর্ষীয়ান ধর্ম্মবীর মহম্মদের ত্যক্ত আসনের সম্মান যথাযোগ্য ভাবে রক্ষা করিয়াছেন। এই ধর্ম্মপ্রাণ আবুবকরের বংশে কবি রুমির জন্ম। কবির পিতা এবং পিতামহও আদর্শ চরিত্র ও ধর্ম্মপ্রাণতার জন্য তাঁহাদের জীবনে লক্ষ লক্ষ লোকের পূজা পাইয়াছেন। কবির পিতামহ হোসেন একজন সুবিখ্যাত সুফী ছিলেন। খোরাসানের রাজা মহম্মদ খোয়ারজম্ (১১৯৯—১২২০) নিজের একমাত্র কন্যা মালিক-ই-জাহানকে হোসেনের হস্তে সম্প্রদান করেন। এই নরপতি বিখ্যাত আক্রমণকারী চেঙ্গিস খাঁর সমসাময়িক। ১২১৯ খৃষ্টাব্দে চেঙ্গিসকে বাধা দিতে গিয়া ইনি পরাজিত হন।

হোসেনের পুত্র ও কবির পিতা বাহাউদ্দিন সুফী সাধনায় এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, তাঁহার উপদেশ গ্রহণের জন্য দেশ-দেশান্তর হইতে প্রতিদিন তাঁহার গৃহে সহস্র সহস্র লোক সমাগত হইত। প্রভাত হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত তিনি অধ্যাপনা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন; আহারান্তে দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নানা স্থান হইতে সমাগত লোকদিগকে লইয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেন। জুম্মাদিনে বাহাউদ্দিন

শিল্পী—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস

স্নেহের ডাক

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

COLOURED ILLUSTRATION

বক্তৃতা শুনিবার জন্য খোয়ারজম সা স্বয়ং উপস্থিত হইতেন। দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ ইমাম ফক্‌রুদ্দিন রাজিও রাজার সহিত বাহাউদ্দিনের নিকট আসিতেন। বাহাউদ্দিন দার্শনিককে লক্ষ্য করিয়া প্রায়ই বলিতেন—ভগবৎ-প্রেমই মুক্তির একমাত্র উপায়—শুষ্ক তর্কশাস্ত্র আলোচনায় কোনই লাভ নাই। ফকরুদ্দিন মনে মনে রুষ্ট হইতেন, কিন্তু রাজার ভয়ে বাহাউদ্দিনকে কিছু বলিতে পারিতেন না। মধ্যযুগের রাজারা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন—জনসাধারণের মধ্যে কাহারও অসাধারণ ক্ষমতা বা প্রভাব প্রতিপত্তি দেখিলে তাঁহারা শঙ্কিত হইয়া উঠিতেন। বহু প্রভাবসম্পন্ন ধর্ম্মগুরু এই ভাবে প্রাচীন নরপতিগণের হস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছেন। ফক্‌রুদ্দিনের প্ররোচনায়, ও স্বদেশীয় সমাজে বাহাউদ্দিনের অসামান্য প্রভাব দর্শনে রাজার মনে ঈর্ষার উদ্রেক হয়। ফলে রাজা কবির পিতার সহিত নানা দুর্ব্ব্যবহার আরম্ভ করেন ও বাহাউদ্দিন চির দিনের জন্য স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করেন (১২১২ খৃঃ অব্দ)। এই সময় জেলালুদ্দিন ছয় বৎসরের বালক। স্বদেশ ত্যাগের পর বাহাউদ্দিন প্রথমে নিশাপুরে উপস্থিত হন। সুবিখ্যাত সূফী লেখক ফরিদুদ্দিন আত্তর এই সময় নিশাপুরেই ছিলেন। কথিত আছে আত্তর বালক জেলালুদ্দিনকে দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—এই প্রচ্ছন্ন মণি একদিন জগৎ আলোকিত করিবে। আত্তরের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। নিশাপুর হইতে পিতাপুত্রে বাগদাদ গমন করেন ও তথা হইতে মক্কা গমন করেন। ফিরিয়া আসিয়া বাহাউদ্দিন লারেন্দা সহরে এক প্রসিদ্ধ বিদ্যাপীঠে অধ্যক্ষরূপে সাত বৎসর অতিবাহিত করেন। পরিশেষে এসিয়া মাইনরের নৃপতি আলাউদ্দিন কায়কোবাদের আহ্বানে বাহাউদ্দিন এসিয়ামাইনরে গিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। "বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে"—এই চাণক্য-নীতি ইস্‌লামের গৌরবময় যুগে সকল উন্নতিশীল রাজ্যেই সযত্নে পালিত হইত। রাজা কায়কোবাদ বাহাউদ্দিনকে রাজোচিত সম্মান ও সমারোহ সহকারে সম্বর্দ্ধনা করেন। এসিয়ামাইনরকে লোকে তৎকালে রুম রাজ্য বলিত; ইহা হইতেই জেলালুদ্দিন 'রুমি' আখ্যা লাভ করেন।

১২০৭ খৃষ্টাব্দে খোরাসানের অন্তর্গত বালাখ্ নগরে জেলালুদ্দিন রুমি জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি রুমির পিতা বাহাউদ্দিন একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক ছিলেন। বাহাউদ্দিন নিজেই পুত্রের শিক্ষাভার গ্রহণ করেন। তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে বুর্‌হানুদ্দিনও খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। কিছুকাল পরে বাহাউদ্দিন এই শিষ্যের হস্তে পুত্রের শিক্ষাভার ন্যস্ত করেন। বুর্‌হানুদ্দিনই প্রকৃত পক্ষে কবির শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু উভয়ই। পিতাপুত্রে যখন কৌনিয়ায় আসেন তখন কবির বয়ঃক্রম ১৮ বৎসর। ১২৩১ খৃষ্টাব্দে বাহাউদ্দিনের মৃত্যু হয়। রুমি শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য সামদেশে (বর্ত্তমান সিরিয়া) গমন করেন। তদ্দেশস্থ দামাস্কাস ও আলেপ্পো নগর তৎকালে জ্ঞানবিজ্ঞান-চর্চ্চার প্রধান কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত ছিল। প্রথমে আলেপ্পো নগরে গিয়া ছাত্রাবাসে থাকিয়া প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কামালুদ্দিনের নিকট রুমি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কামালুদ্দিনের লিখিত আলেপ্পো নগরের ইতিহাস বহু ইয়োরোপীয় ভাষায় অনুদিত হইয়াছে। কবি আলেপ্পো হইতে দামাস্কাস গমন করেন। এখানে কাহার নিকট তিনি জ্ঞানলাভ করেন তাহা জানিতে পারা যায় নাই। কবির শিষ্য ও জীবনচরিত-লেখক সেপাশালার বলিয়াছেন যে, কবি দামাস্কাসে বুর্‌হানিয়া নামক মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেন; কিন্তু অন্য কোনও গ্রন্থে এই বুর্‌হানিয়া মাদ্রাসার উল্লেখ পাওয়া যায় না। ছাত্রাবস্থায় বিভিন্ন শাস্ত্রে রুমি এমন অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন যে কাহারও কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে নিরাকরণের জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। ইসলামের অন্তর্গত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতবাদ কবি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। কবির রচিত মহাকাব্য 'মসনবি'ই তাহার প্রমাণ দিতেছে। ৪০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সকল শাস্ত্রে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া অদ্বিতীয় পণ্ডিতরূপে রুমি কৌনিয়ায় ফিরিয়া আসিলেন এবং অতি অল্প কালের মধ্যে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন অধ্যাপক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন।

এই পর্য্যন্ত কবির যে জীবন তাহা শুষ্ক জ্ঞানীর জীবন। এ সময়ে তিনি সাধারণ পণ্ডিতগণের ন্যায় শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেন, ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, বক্তৃতা করিতেন, শাস্ত্রের বিধান (ফতোয়া) দিতেন এবং গীতবাদ্যাদি ধর্ম্মের পরিপন্থী বলিয়া মনে করিতেন। প্রেম, ভক্তি ও বৈরাগ্যের রাজ্য হইতে তখনও তাঁহার আহ্বান আসে নাই। সুবিখ্যাত সূফী সাধক সাম্‌স্ ই তাব্রেজের সহিত আলাপ ও বন্ধুত্বই কবির জীবনে এক বিরাট পরিবর্ত্তন উপস্থিত করে। ইঁহাদের প্রথম মিলন নদীয়ার অদ্বিতীয় পণ্ডিত নিমাই এর সহিত ঈশ্বরপুরীর প্রথম সাক্ষাতের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই সাক্ষাতের পর হইতেই বিদ্যার অহঙ্কার ও জ্ঞানের দম্ভ প্রেম-ভক্তির প্রবল স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গেল! জ্ঞানগর্ব্বী অধ্যাপক দীনহীন সন্ন্যাসীতে পরিণত হইলেন! সাম্‌স্-ই-তাব্রেজ ও জেলালুদ্দিন রুমির প্রথম সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে নানাপ্রকার অত্যাশ্চর্য্য কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। রুমির জীবন-চরিত-লেখকগণ কেহ কেহ এই সকল কিংবদন্তীর উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেগুলি এত অলৌকিক যে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা সমীচীন মনে হয় না। কথিত আছে, মৌলানা একদিন অধ্যাপনা কার্য্যে রত ছিলেন, তাঁহার আশে পাশে রাশি রাশি বহুমূল্য গ্রন্থ। সহসা এক দরবেশ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'এ সকল গ্রন্থে কি আছে?' মৌলানা বলিলেন,—'ইহাতে যে কি আছে তাহা আর তুমি কি বুঝিবে?' সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থগুলি অগ্নিদগ্ধ হইতে আরম্ভ করিল। মৌলানা জিজ্ঞাসা করিলেন—'ইহা কি?' দরবেশ বলিল, 'ইহাতে যে কি আছে তাহা আর তুমি কি বুঝিবে?' ইহার পর হইতেই রুমির জীবনে পরিবর্ত্তন আসে। বলা বাহুল্য এই কিংবদন্তীর দরবেশ সাম্‌স্-ই-তাব্রেজ।

বিখ্যাত ভ্রমণকারী ইব্‌ন্-ই-বাতুতা কৌনিয়ায় গিয়া রুমির সমাধিস্থান দর্শন করেন। তিনি সেখানে লোকমুখে যাহা শুনিয়াছিলেন ও স্বয়ং যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সাম্‌স্-ই-তাব্রেজ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা এইরূপ। একদিন এক ফেরিওয়ালা মোহনভোগ বিক্রয় করিতে করিতে রুমির নিকট উপস্থিত হয় ও তাঁহার নিকট এক গোটা মোহনভোগ বিক্রয় করে। রুমি

সেই মোহনভোগ খাওয়ার পর হইতে পাগলের মত হইয়া নিরুদ্দেশ হন। কয়েক বৎসর পরে ফিরিয়া আসেন, কিন্তু তখন আর কাহারও সহিত কোনও কথাবার্ত্তা বলিতেন না, কেবল কবিতা আবৃত্তি করিতেন। এই সকল কবিতার সমষ্টি হইতেছে মস্‌নবি কাব্য। এই ফেরিওয়ালাই সুফীগুরু সাম্‌স্-ই-তাব্রেজ। ইব্‌ন্-ই-বাতুতা কৌনিয়া নগরে দেখেন যে সেখানকার লোকেরা রুমির মসনবি কোরআনের মত শ্রদ্ধার চোখে দেখিয়া থাকে।

এ সম্বন্ধে রুমির শিষ্য সেপাসালার যাহা লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে কোনও অলৌকিক ব্যাপারের উল্লেখ নাই। তিনি লিখিয়াছেন, সাম্‌স্ সাধারণ সুফীদের মত ছিলেন না। তিনি যে ধর্ম্মজগতে কোনও উন্নত স্থান অধিকার করিয়াছেন, বাহিরের আচরণ দেখিয়া কোনও দিন কেহ তাহা ভাবিতে পারিত না। ভগবৎ-প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া তিনি কৌনিয়ায় উপস্থিত হন। এক সরাইএ উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। দু একটী কথার পর রুমি তাঁহার অনুরক্ত হন এবং শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। ৬৪২ হিজরিতে এই ঘটনা ঘটে। ইহার পর রুমি অধ্যাপনা-কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সাম্‌স্‌এর সহিত নির্জ্জনে অবস্থান করিতেন এবং অন্নপান পরিত্যাগ করিয়া কেবল ধ্যানধারণায় সময় অতিবাহিত করিতেন। সহরে সকলেই বলিতে লাগিল যে, এক পাগল আসিয়া রুমির মত একজন প্রবীণ পণ্ডিতের মাথা বিগড়াইয়া দিয়াছে। শিষ্যেরাও বিরক্ত হইয়া উঠিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া সাম্‌স্ কাহাকেও কিছু না বলিয়া কৌনিয়া পরিত্যাগ করিলেন। সাম্‌স্‌এর বিচ্ছেদে মৌলানা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। বহু দিন পরে সাম্‌স্ দামাস্কাস হইতে এক পত্র দেন। রুমির পুত্র সুপতান ওয়ালাদ বহু শিষ্য লইয়া সাম্‌স্‌কে পুনরায় কৌনিয়ায় আনিবার জন্য যাত্রা করেন। ফিরিয়া আসিয়া সাম্‌স্ দুই বৎসর কৌনিয়ায় অবস্থান করেন। কথিত আছে মৌলানার শিষ্যদের হস্তেই তিনি নিহত হন। এ বিষয়ে এক সেপাসালার ভিন্ন আর সকল জীবনচরিত লেখকই একমত। সেপাসালার বলিয়াছেন যে সাম্‌স্ পুনরায় নিরুদ্দেশ হইয়া যান ও তাঁহার আর কোনও সন্ধান মিলে নাই।

সাম্‌স্-ই-তাব্রিজএর অন্তর্দ্ধানের পর হইতেই রুমির কবিত্বশক্তি যেন সহসা শতধারায় উৎসারিত হইয়া উঠিল। এই সময় হইতে তাঁহার প্রসিদ্ধ কাব্যগুলির রচনা আরম্ভ হয়।

এই সময় সুবিখ্যাত পারস্যবিজয়ী হালাকুখাঁর সেনাপতি বেচুখাঁ কৌনিয়া আক্রমণ করেন। বহু দিন ধরিয়া নগর অবরুদ্ধ থাকায় নগর-বাসীরা বিব্রত হইয়া মৌলানার শরণাপন্ন হয়। মালেকিব্-উল-আরেকিন নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, কবি আক্রমণকারী সৈন্যগণের সম্মুখস্থ এক টিলার উপর দাঁড়াইয়া নমাজ পড়িতে আরম্ভ করেন। সৈনিকেরা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ধনুতে শরযোজনা করে, কিন্তু জ্যা আকর্ষণে অসমর্থ হয়। সংবাদ পাইয়া সেনাপতি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হন এবং নিজে মৌলানাকে আক্রমণ করিতে ধাবিত হন ; কিন্তু এক পদ অগ্রসর হইতে অসমর্থ হন। এই গল্পের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, মৌলানা সাহসে নির্ভর করিয়া শত্রুসৈন্যের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া উপাসনা আরম্ভ করেন এবং তাঁহার এই নির্ভীকতা দেখিয়া সেনাপতি মুগ্ধ হইয়া পড়েন। যাহা হউক, যে কারণেই হউক মৌলানার এই কার্য্যের জন্যই সেবারে নগরবাসীরা রক্ষা পায় এবং তাঁহার প্রভাবপ্রতিপত্তি সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হয়।

সাম্‌স্-ই-তাব্রিজের অন্তর্দ্ধানে মৌলানা একেবারে মুষড়াইয়া পড়েন। সকল সময়ে তিনি দুঃখিত চিত্তে থাকিতেন। একদিন চঞ্চল চিত্তে ইতস্ততঃ বেড়াইতেছিলেন, নিকটে তাঁহার প্রতিবেশী সালাহুদ্দিন জারকুব্ (স্বর্ণকার) দোকানে বসিয়া হাতুড়ি দিয়া রৌপ্যখণ্ডে আঘাত দিতেছিলেন। হাতুড়ির শব্দকে বাদ্যধ্বনি মনে করিয়া মৌলানা দোকানের সম্মুখে জ্ঞানশূন্য হইয়া নৃত্য আরম্ভ করেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যাইতে লাগিল—নৃত্য থামিল না। তাঁহার এই ভাব দেখিয়া সালাহুদ্দিনের চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি মৌলানার পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। মৌলানা তাঁহাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। দোকানে যাহা কিছু ছিল সালাহুদ্দিন সকলই বিলাইয়া দিলেন। এই দিন হইতে সালাহুদ্দিনই সাম্‌স্‌এর স্থান অধিকার করিলেন। সালাহুদ্দিন পূর্ব্ব হইতে সুফী-সাধনায় উন্নত স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি মৌলানার পিতা বাহাউদ্দিন ও তদীয় শিষ্য বুরহানুদ্দিনের শিষ্য ছিলেন।

মৌলানা স্ব-রচিত কয়েকটী গজলেও এই সালাহুদ্দিনের উল্লেখ করিয়াছেন। নিরক্ষর স্বর্ণকারকে এই সর্ব্বজনমান্য মহাকবির অন্তরঙ্গ বন্ধু হইতে দেখিয়া কবির শিষ্য ও অন্যান্য বন্ধু-বান্ধব বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। কবির পুত্র সুলতান ওয়ালাদ স্ব-রচিত মসনবি কাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন

'তাব্রিজে মোরা দিলাম্ তাড়ায়ে তখন কি জানি হায়,
'নুর' হবে দূর তার ঠাঁই শেষে জুড়িয়া বসিবে ছাই !
শিষ্যেরা সদা করে কানাকানি গুরুরে আসিয়া বলে
'বিদ্যা-বিহীন এই হীনজন কেন রবে তব দলে ?'

গুরু ত তাহার বাহির দেখিয়া মুগ্ধ হন নাই। প্রেমের রাজ্যে শুষ্ক জ্ঞানের কি অধিকার আছে ? তিনি শিষ্যগণের এ সকল কথায় কর্ণপাত করিলেন না। দেখিয়া শুনিয়া তাহারাও নিরস্ত হইল। সুলতান ওয়ালাদ সালাহুদ্দিনের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ৬৬৪ হিজরিতে সালাহুদ্দিনের মৃত্যু হয়। মৌলানা নিজের পিতার সমাধির পার্শ্বে তাঁহাকে সমাহিত করেন। শোকসন্তপ্ত কবি লিখিয়াছেন,—

তোমার বিরহে কাঁদিছে বন্ধু, দূরে ওই আসমান,
খুনের মাঝারে লুণ্ঠিত হিয়া, কাঁদিছে আমার জান।

সালাহুদ্দিনের মৃত্যুর পর কবির প্রিয়তম শিষ্য হেসামুদ্দিন অন্তরঙ্গ সাধক-সঙ্গীর স্থান অধিকার করেন। তান্ত্রিক সাধনায় উত্তর-সাধক যেমন অপরিহার্য্য সুফী-সাধনায় এই অন্তরঙ্গ বন্ধুরও সেইরূপ প্রয়োজন। তাই মৌলানা একজনের পর আর একজনকে এই ভাবে নিজের বিশিষ্ট বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। হেসামুদ্দিনের ঐকান্তিক ইচ্ছায় ও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে মৌলানা তাঁহার বিখ্যাত মহাকাব্য মসনবি রচনা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি মুখে মুখে কবিতা রচনা করিয়া আবৃত্তি করিতেন ও প্রিয়শিষ্য হেসামুদ্দিন তাহা লিপিবদ্ধ করিতেন। মসনবির প্রথম খণ্ড

সমাপ্ত হওয়ার পর হেসামুদ্দিনের স্ত্রীবিয়োগ হয় ও বহুদিন গ্রন্থরচনা বন্ধ থাকে।

১২৭৩ খৃষ্টাব্দে কৌনিয়া নগরে এক ভয়ঙ্কর মহামারী উপস্থিত হয়। প্রতিদিন অসংখ্য লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। বিপন্ন নগর-বাসীরা তাহাদের দুঃখবিপদের আশ্রয়ভূমি মৌলানা রুমির নিকট উপস্থিত হইলেন। মৌলানা তাহাদিগকে বলিলেন—ধরণী ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছে। উপযুক্ত খাদ্য মিলিলেই শান্ত হইবে। এই উপযুক্ত খাদ্য যে কি তাহা অচিরেই বুঝিতে পারা গেল।

কয়েক দিনের মধ্যে রুমি নিজে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। সে যুগের ধন্বন্তরি-তুল্য চিকিৎসক আকমালুদ্দিন ও গজ্জোলকোর চিকিৎসায় নিযুক্ত হইলেন। পীড়ার সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধনী ও নির্ধন সকলেই কবির রোগ-শয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। খ্যাতনামা পণ্ডিত সদ্‌রুদ্দিন মৌলানার সেবার জন্য শিষ্যগণের সহিত কৌনিয়ায় আগমন করিলেন। তিনি কবির আরোগ্য কামনা করিয়া ভগবানের করুণা-ভিক্ষা করিলেন। তখন রুগ্ন কবি তাঁহার হাতে ধরিয়া বলিলেন—বন্ধু, আর কেন ? প্রেমিক-প্রেমিকার মাঝখানে এই যে ক্ষুদ্র অন্তরাল, ইহা ছিন্ন হউক ; জ্যোতিতে জ্যোতিঃ মিলিত হউক।' সকলেই বুঝিল কবির মৃত্যুর বিলম্ব নাই। সুফীগুরুরূপে কাহাকে মনোনীত করিয়া যাইতেছেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি হেসামুদ্দিনের নাম করেন। পুত্র সুলতান ওয়ালাদ একজন বড় সুফী ছিলেন। কবি নিজেও তাহা জানিতেন। তথাপি তাঁহার নাম না করিয়া হেসামুদ্দিনকে নিজের স্থানে কার্য্য করিতে আদেশ দান করিলেন। কবির পঞ্চাশ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) ঋণ ছিল। নিজের সম্পত্তি হইতে উক্ত ঋণ শোধ দিয়া বাকী সম্পত্তি বিলাইয়া দিবার জন্য শিষ্যগণকে অনুরোধ করিলেন। উত্তমর্ণেরা সেইখানেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা বলিলেন "আপনি ঋণমুক্ত।" কবি তখন সদ্‌রুদ্দিনকে শেষ নমাজ পড়িবার জন্য অনুরোধ করিলেন। দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রদীপ্ত সুফী-সূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে সমাধিভূমিতে লইয়া যাওয়ার জন্য শব উত্তোলিত হইল। আবালবৃদ্ধবনিতা রোদন করিতে করিতে শবের অনুগমন করিল। খৃষ্টান ও ইহুদিরাও ইজিদল ও তওরিত পাঠ করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। বাদশাহ স্বয়ং এই শোভাযাত্রার সহিত ছিলেন। তিনি ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ইনি তোমাদের কে ? তাহারা বলিল—ইনি যদি আপনাদের নিকট মহম্মদ হন তবে আমাদের নিকট ইসা ও মুসা। জনতা ক্রমে এত বাড়িয়া চলিল যে শব সমাধিভূমিতে পৌঁছিতে প্রায় সন্ধ্যা হইল। কবির শেষ ইচ্ছানুসারে সৈয়দ সদ্‌রুদ্দিন নমাজের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন, কিন্তু সহসা চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কাজি সেরাজুদ্দিন নমাজ পড়িলেন। কবিকে সমাহিত করিয়া সকলে বিষণ্ণ চিত্তে গৃহে ফিরিল।

রুমির সমাধিভূমি বহু কাল ধরিয়া সম্মানিত হইয়া আসিয়াছে। ইব্‌ন্-ই-বাতুতা যখন কৌনিয়ায় উপস্থিত হন, তখন এই সমাধির নিকট এক বৃহৎ লঙ্গরখানা (ভোজনাগার) দেখিতে পান। এই ভোজনাগারে যে কোনও অতিথি আগমন করিলেই আহার্য্য পাইত।

কবির পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে তাঁহার জীবনচরিত-লেখকগণ বিশেষ বিবরণ দেন নাই। প্রায় ২০ বৎসর বয়সে কবি সমরকন্দবাসী লালা সারাফুদ্দিনের কন্যা গউহর খাতুনের পাণি-গ্রহণ করেন। তিনি এই স্ত্রীর গর্ভে আলাউদ্দিন ও বাহাউদ্দিন নামে দুই পুত্র লাভ করেন। বাহাউদ্দিন সুলতান ওয়ালাদ নামে পরিচিত। ইনি "দরবাবনামা" নামে একখানি মস্‌নবি কাব্য লিখিয়াছেন। এই কাব্যে রুমির জীবনের অনেক কথা বিবৃত হইয়াছে। সুলতান ওয়ালাদ পিতার উপযুক্ত পুত্র। তিনি নিজেও এক সুফী ছিলেন। পাণ্ডিত্যের দিক দিয়া দেখিলেও তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। ফলতঃ মৌলানার বিরাট ব্যক্তিত্বের অন্তরালে পড়ায় সুলতান ওয়ালাদের প্রতিভা নিষ্প্রভ মনে হয়। অন্যথা অন্য স্থানে ও অন্য যুগে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি উচ্চতর স্থান অধিকার করিতে পারিতেন। ১৩১২ খৃষ্টাব্দে ৯৬ বৎসর বয়সে সুলতান ওয়ালাদের মৃত্যু হয়।

রুমি সুফীমতাবলম্বিগণের মধ্যে এক নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ইব্‌ন্-ই-বাতুতার ভ্রমণকালে এই সম্প্রদায় জালালিয়া সম্প্রদায় নামে পরিচিত ছিল। মৌলানার নাম জালালুদ্দিন ছিল বলিয়াই বোধ হয় জালালিয়া নামের উৎপত্তি। এসিয়া মাইনর, মিশর, সিরিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে এই সম্প্রদায় মৌলবিয়া সম্প্রদায় নামে পরিচিত। জীবিত লেখকগণের মধ্যে মৌলানা সিরলি লিখিয়াছেন যে তিনি এই সম্প্রদায়ের সভা ও চক্রাকারে নৃত্য স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সুফী মত রুমির জীবনে অপূর্ব্ব রূপান্তর আনয়ন করিয়াছিল। তিনি যে একজন অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী সর্ব্বশাস্ত্রে গভীর-জ্ঞানসম্পন্ন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নাই। সমাজে এই পাণ্ডিত্যের সম্মান ও মর্য্যাদাও যথেষ্ট ছিল। প্রথম জীবনে সম্মান ও পদমর্য্যাদার দিকে তাঁহার পূর্ণ দৃষ্টি ছিল। তিনি সর্ব্বদা বহু শিষ্য-সমন্বিত হইয়া শাস্ত্রচর্চ্চা ও তর্কবিতর্কতাদি করিতে ভালবাসিতেন। যখন পথে বাহির হইতেন সঙ্গে অগ্রে ও পশ্চাতে বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত গমন করিতেন। সাম্‌স্-ই-তাব্রিজের সহিত সাক্ষাতের পর হইতে জীবন-নাট্যের পট-পরিবর্ত্তন হইল। জপ, ধ্যান, ধারণা ইত্যাদিই এখন জীবনের প্রধান অবলম্বন হইল। প্রেমের মায়াদণ্ড স্পর্শে পণ্ডিত কবি পাগল সুফীতে পরিণত হইলেন। বৈষ্ণব-পদাবলীতে কৃষ্ণ-প্রেমানুরাগিনী রাধিকার অবস্থায় বা নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শেষ দশায় আমরা যে দিব্যোন্মাদ দেখিয়াছি, রুমির পরমধন্য জীবনেও তেমনই উন্মাদ আসিয়াছিল। অন্নে রুচি নাই, নয়নে নিদ্রা নাই, অহরহ শুধু প্রেমাস্পদের ধ্যানেই আনন্দ। নিদ্রা সম্বন্ধে রুমি নিজেই বলিয়াছেন,—

নিখিল ঘুমায় কেহ জেগে নাই
আমি যে আত্মহারা,—
বসিয়া বসিয়া সারা নিশি জাগি
গণি আকাশের তারা।

নয়নের নিদ লয়েছে বিদায়
আসিবে না কোনও ছলে,
তোমার বিরহ-গরল খাইয়া
ডুবেছে মরণ-জলে।

নমাজে দণ্ডায়মান হইবামাত্র তাঁহার চিত্ত প্রেমাস্পদের চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া যাইত। সেফাসালার বলিয়াছেন, "আমি কতবার দেখিয়াছি মৌলানা সন্ধ্যার সময় নমাজে দাঁড়াইয়া সমস্ত রাত্রিই কাটাইয়া দিয়াছেন।" উপাসনা আরম্ভ করা মাত্র অনর্গল অশ্রুধারায় বক্ষ প্লাবিত হইত। তাঁহার ব্যাকুল ভাব ও কাতরতা দেখিয়া দর্শকমাত্রেরই চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিত। সাংসারিক সম্পদে সম্পূর্ণ বীতস্পৃহ ভাব, সর্ব্বভূতে দয়া, সকলের নিকট দৈন্য ও বিনয়, তীব্র বৈরাগ্য রুমির শেষ জীবনকে ক্রমেই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়াছিল।

এক শীতের রাত্রিতে প্রিয়শিষ্য হেসামুদ্দিন চিল্লির গৃহে যাইয়া দেখেন, —দ্বার রুদ্ধ, সকলে নিদ্রিত। কাহারও ঘুমের ব্যাঘাত না করিয়া—মৌলানা দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শীতের ক্লেশকর বাতাস বহিতেছে, বরফ পড়িতেছে; কিন্তু তিনি কাহাকেও আহ্বান করিলেন না, কোনও সাড়া দিলেন না বা দ্বারদেশে কোনরূপ শব্দ করিলেন না। গভীর রাত্রিতে দ্বারবান দুয়ার খুলিয়া দেখে মৌলানা একাকী সেই শীতের মধ্যে বসিয়া আছেন। সে তাড়াতাড়ি হেসামুদ্দিনকে সংবাদ দিল। হেসামুদ্দিন আসিয়া মৌলানার পদতলে পড়িলেন। মৌলানা তাঁহার গলা জড়াইয়া আলিঙ্গন করিলেন। শুধু মানুষ বলিয়া নয় তিনি কোনও প্রাণীকে কষ্ট দেওয়া অনুচিত মনে করিতেন। তিনি একদিন' বহু শিষ্যসহ কোনও স্থানে যাইতেছিলেন; সঙ্কীর্ণ পথ, আর সেই পথরোধ করিয়া এক কুক্কুর শুইয়া ছিল। মৌলানা কুক্কুরের বিশ্রাম ভঙ্গ ভয়ে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। একজন লোক তাঁহার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কুক্কুরটীকে পথ হইতে তাড়াইয়া দেওয়ায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আর একদিন মৈনুদ্দিনের গৃহে মৌলানা সশিষ্য সঙ্গীতের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। কারজিখাতুন নামে এক মহিলা নানাবিধ মিষ্টান্ন পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সকলেই গানে মত্ত ছিল। ইত্যবসরে এক কুক্কুর আসিয়া সেই মিষ্টান্নগুলি খাইয়া ফেলে। ইহা দেখিয়া এক শিষ্য ক্রোধপরবশ হইয়া কুক্কুরটীকে প্রহার করিতে যান। মৌলানা তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন—উহাকে মারিও না, তোমাদের অপেক্ষা উহার প্রয়োজনই অধিক ছিল। মহাপুরুষগণ নিজেরা এক দিকে যেমন শিশুর মত সরল-স্বভাব হন, অন্য দিকে তেমনই শিশুদিগকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন। ঈশার নিকট একবার কতকগুলি শিশুকে আসিতে নিষেধ করায় তিনি বলিয়াছিলেন,—

"Suffer the little children to come unto Me, and forbid them not; for of such is the Kingdom of Heaven"

Jesus Christ.

"শিশুদিগকে আমার নিকটে আসিতে দাও, বাধা দিও না; কারণ, স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই।"

মৌলানার শিশুপ্রীতি সম্বন্ধে অনেক গল্প শোনা যায়। কথিত আছে, একদিন পথে মৌলানাকে দেখিয়া কতকগুলি বালক আসিয়া তাঁহার হস্ত চুম্বন করিল। তিনি একে একে প্রত্যেকের হস্তচুম্বন করিয়া নানারূপ আলাপ করিতে লাগিলেন। একটী বালক গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। মৌলানাকে এই অবস্থায় দেখিয়া সে দূর হইতে বলিল,—মৌলানা, এখানে দাঁড়াইয়া থাকুন, আমার কাজ হইলে আসিতেছি।' মৌলানা বহুক্ষণ ধরিয়া দাড়াইয়া থাকিলেন; বালকের হাতের কাজ শেষ হইলে সে নিকটে আসিয়া তাঁহার হস্তচুম্বন করিল।

সংসারের কোনও বস্তুতেই তাঁহার স্পৃহা ছিল না। কৌনিয়ারাজ হইতে আরম্ভ করিয়া সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় সকলেই মৌলানার নিকট বহুমূল্য উপহার পাঠাইয়া দিতেন, কিন্তু তিনি একটী দ্রব্যও স্পর্শ করিতেন না। হয় হেসামুদ্দিন, না হয় জারকুবের গৃহে পাঠাইয়া দিতেন। রাজকোষ হইতে মাসিক ১৫ স্বর্ণমুদ্রা বৃত্তি পাইতেন, তাহাতেই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। সাধারণের এ অর্থ বিনা পরিশ্রমে গ্রহণ করা রুমির ন্যায় ধার্ম্মিক ব্যক্তির নিকট কখনই বিধেয় বোধ হইতে পারে না। তাই রুমি যে কোনও লোক যে কোনও অবস্থায় ব্যবস্থার জন্য তাঁহার নিকট আসিলেই বিনা অর্থে তাহাকে ব্যবস্থা লিখিয়া দিতেন।

অধিকাংশ সময়ই ওয়াজদ্ বা ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। বাহ্যজ্ঞান তখন একেবারেই থাকিত না। বসিয়া থাকিতে থাকিতে নৃত্য আরম্ভ করিতেন, সহসা কাহাকেও কিছু না বলিয়া গৃহ হইতে অন্তর্হিত হইতেন, সাত আট দিন কোনও 'সংবাদই পাওয়া যাইত না। তার পর হয়ত অনেক অনুসন্ধানের পর কোনও নির্জ্জন স্থানে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় পাওয়া যাইত। এইরূপ ভাবে-ভোলা একজন মানুষ এই বঙ্গদেশেও আসিয়াছিলেন। নীলাচলে মহাপ্রভুর শেষ জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, প্রেমের ঠাকুরের মায়াদণ্ড-স্পর্শে এই পৃথিবীর মানুষের এইরূপ রূপান্তর যে অসম্ভব নহে তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে। সেই নিদারুণ বিরহযন্ত্রণা, সেই কৃষ্ণনাম শ্রবণমাত্রেই অচেতন অবস্থা, সেই নির্জ্জন নিশীথে গম্ভীরা হইতে পলায়ন, সেই দয়িতদর্শনাকাঙ্ক্ষায় 'আকুলি ব্যাকুলি' বঙ্গদেশ কোনও দিন ভুলিতে পারিবে না।

মৃদঙ্গের ধ্বনি শুনিলেই যেমন নবদ্বীপচন্দ্র আত্মহারা হইতেন, রবাবের ঝঙ্কার শ্রবণ মাত্রেই মৌলানা রুমিরও তেমনই বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইত। কথিত আছে রুমের অধিপতি একবার এক প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক মুশলমানকে কাজির পদে নিযুক্ত করেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তি রাজাকে তিনটী সর্ত্ত দেন। তাহার মধ্যে একটী সর্ত্ত ছিল—কৌনিয়া হইতে সকল প্রকারের সঙ্গীতালোচনা বন্ধ রাখা। রাজা সকল সর্ত্তেই রাজি হইলেন কিন্তু মৌলানা সঙ্গীত ভালবাসিতেন বলিয়া এই বিষয়ে সম্মত হইতে পারিলেন না। এই সংবাদ শুনিয়া রুমি হাসিয়া বলিয়াছিলেন,—রবাব অনেক অদ্ভুত ক্ষমতা রাখে, তাহার প্রথম নমুনা দিয়াছে—এই ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে বিচারকের দায়িত্ব হইতে মুক্ত করিয়া।

পণ্ডিত-শিরোমণি হইয়াও রুমি বিনয় ও দৈন্যের অবতার ছিলেন। তিনি উপাসনা-মন্দিরে কোনও দিন সকলের অগ্রে দাঁড়াইতেন না!

সভাসমিতিতে উপস্থিত হইয়া সকলের নীচে সকলের পশ্চাৎভাগে আসন গ্রহণ করিতেন। নিজকে প্রচার করার ইচ্ছা তাঁহার উদার মনে কোনও দিন স্থান পায় নাই। তিনি মসনবির একস্থানে বলিয়াছেন:—

নিজেরে কর দীন, নিজেরে কর হীন,
তাঁহারি মাঝে শুধু হইয়া যাও লীন।
প্রচার করি নিজে বাড়াও মান মিছে
বিজ্ঞাপন-বেড়ি পরিলে রবে পিছে।

রাশিয়ায় নাট্য-বিপ্লব

শ্রীশরৎ ঘোষ এম-এ

মানুষ যখন সুস্থ থাকে সে হাসে, গান গায়—যখন পীড়িত, সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, হা-হুতাশ করে। জাতির সম্বন্ধেও ঠিক ঐ একই কথা। জাতি যত দিন জীবন্ত থাকে, সে সুন্দর সাহিত্য সৃষ্টি করে, নব নব শিল্প রচনা করে—আবিষ্কার, অনুসন্ধান অনুশীলনের মধ্য দিয়ে অভিনবকে অনাগতকে ক্রমাগত অধিকার করার চেষ্টা করে। পক্ষান্তরে মুমূর্ষু যে জাতি, সে তার গান হারিয়ে ফেলে, গতি ভুলে যায়—সে শুধু তখন অতীতের শয্যায় শুয়ে জগৎকে অন্ধকারাচ্ছন্ন মিথ্যা মায়াময় দেখে, সত্য সমাধির জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এ যুগে রাশিয়ার যদি কোনও বিশেষত্ব থাকে ত সে এই যে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘকায় ঐ জাতটি আজ সর্ব্বাপেক্ষা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে একটা জাতির জাগরণ বিশেষ কোনও নূতন ব্যাপার নয়, কিন্তু রাশিয়ার এই অভ্যুত্থান এর তুলনা হয় না। জাতি অধীন থাকে, স্বাধীন হয়—দরিদ্র থাকে সমৃদ্ধ হয়;—কিন্তু অতীতের সমস্ত প্রথাকে, সমস্ত সংস্কারকে সমস্ত বিধানকে এমন করে উপড়ে ফেলে একেবারে অজানা অপরিচিত এক পদ্ধতি দিয়ে একটা বিরাট জাতীয় জীবনকে পরিচালিত করার চেষ্টা এ—যেমন দুঃসাহসের তেমনি নির্ম্মম। আমরা দূর থেকে বিস্মিত হয়ে ভাবি, প্রাণশক্তির কতখানি প্রাচুর্য্য থাকলে, এতবড় অস্ত্রোপচার সহ্য করে জাতি যে শুধু বেঁচে থাকছে তা নয়,—অন্য জাতির সঙ্গে সমান তালে সাম্‌নে এগিয়ে যেতে পারে।

রাজনীতি-ক্ষেত্রে তারা যেমন ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপ করে দিচ্ছে, সমস্ত যন্ত্র-শিল্প গণ-শাসিত করে তুলছে, পারিবারিক জীবনে বিবাহকে যেমন তারা স্বাধীন ও সন্তানপালনের দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে দিচ্ছে এবং আধ্যাত্মিক জীবনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আজ যেমন তারা অনাবশ্যক মনে করছে, তেমনি তাদের নাট্যজগতেও তারা বিপ্লবের আয়োজন বড় কম করে নি। শুধু অভিনয়ের উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে নয়,—অভিনয়ের রূপ, বিষয়-বস্তু, দৃশ্যপট এবং অভিনেতার সঙ্গে দর্শকের সম্বন্ধ-বোধের দিক দিয়েও এরা এমন সব বিপ্লবের আয়োজন করেছে যে এত শীঘ্র ঠিক তার ফলাফল নির্দ্ধারণ করা শুধু কষ্টকর নয় অসম্ভব। সে সব কাহিনী পড়তে পড়তে মনে হয় যে সেই বিরাট নটরাজ আজ এই তুষার-শীর্ষ দেশের রঙ্গবেদীতে এ কোন্ অপরূপ নৃত্য আরম্ভ করেছেন, যার ছন্দের অনুরণনে এমন সব অপূর্ব্ব পরিকল্পনা শিল্পে কলায় নিত্য নব রূপ পরিগ্রহ করতে থাকল।

নাটকে সারা ইয়োরোপ আজ বাস্তবতার (realism) ভক্ত হয়ে উঠেছে। Learএর বিরাট দুঃখ, Faustএর সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা, কিম্বা Phœdraর দুর্জ্জয় লালসা, এদের কাহিনী ত্যাগ করে আজ ইয়োরোপ আঁকতে আরম্ভ করেছে, মানুষের ছোট ছোট অথচ মর্ম্মস্পর্শী সুখ দুঃখের —সূক্ষ্ম অথচ শক্তিশালী প্রবৃত্তি সমূহের চিত্র। এই ভাবের নাটক লেখায় ও অভিনয়েও রাশিয়া শক্তির পরিচয় বড় কম দেয় নি। Gorkyর Lower depths, Turgenevএর A month in the Country, Tchekoff এর Cherry orchard কিম্বা Uncle Vanya প্রভৃতি নাটক এই পর্য্যায় ভুক্ত, এবং Moscow Art Theatre এর প্রযোজক Stanislavsky এর এমন চমৎকার বাস্তব রূপ দিয়েছেন যে সারা ইয়োরোপ মুগ্ধ হয়ে সে অভিনয় দেখেছে, আর রাসিয়ার প্রতিভাকে অকুণ্ঠিত ভাবে শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিয়েছে। Moscow Art Theatreএর জন্ম ও প্রসিদ্ধিলাভ, দুইই ঘটে বিপ্লবের আগে। বিপ্লবের পরেও সে আজ বেঁচে আছে, কিন্তু রাশিয়ায় আর তার সে গৌরব নেই। বলশেভিজমের বিপ্লব জাতির জীবনে, চিন্তায়, লক্ষ্যে যে গভীর পরিবর্ত্তনের সংঘটন করেছে, তারি প্রখর আলোকে Stanislavsky'র এই সাধের ও সাধনার প্রতিষ্ঠানটি হতগৌরব, অতীতের বস্তু, এবং প্রায় অনাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ কথা কেহই অস্বীকার করতে পারেন না যে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সাহিত্য যে সমাজকে চিত্রিত করে—সে বেশীর ভাগ মধ্যবিত্ত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের সমাজ। দেশের শতকরা ৮০ভাগ যারা, সেই কৃষক ও মজুরদের আশা আকাঙ্ক্ষা ক্বচিৎ এই সাহিত্যে ভাষা পায়। অথচ সাহিত্যকে যদি সত্যকার জাতীয়ই হতে হয়, তাহলে এদের নিয়েই বেশীর ভাগ নাটক রচিত হওয়া উচিত। শোভিয়েট, আজ তাই জাতিকে প্রবুদ্ধ করার দিকে চায় না—যে এমন নাটক অভিনীত হো'ক যাতে এই শ্রমজীবীরা আনন্দ পায় না শিক্ষা পায় না, নিজেকে বড় করার উন্নত করার গভীর প্রেরণা পায় না। Art for art's sake—এ মত, রাশিয়া আজ মোটেই মান্‌তে চায় না। যে শিল্প ও যে কলাবিদ্যা জাতির জীবনকে উন্নত করতে পারে না, রাশিয়ার কাছে তার কোনও মূল্য নেই। আজ সেইজন্য সে দেশের নাটক হয়ে উঠেছে অত্যন্ত উদ্দেশ্যমূলক। নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে আজ শোভিয়েট তাই চাইছে যে এই আনন্দোৎসব শ্রমিক ও কৃষককে শুধু আনন্দ দেওয়া বাদে তাদের কাছে মহাবিপ্লবের সেই বাণী পৌঁছে দিক্, যা আজ তাদের জপমন্ত্র,—যা আজ তাদের স্বাভাবিক অথচ সুপ্ত আত্মমর্য্যাদাকে সচেতন করে তুল্‌বে—যে বাণী আজ তাদের এই ভরসা দেবে যে পৃথিবীর ধন, সম্পদ, শিক্ষা, শিল্প—এতে নিধনদের দাবীও কম নয়। আজ তারা যে সব রকম সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত, তার কারণ আজ পর্য্যন্ত মানুষের সুখ-দুঃখ-স্বার্থের চিন্তা অত্যন্ত ব্যক্তিগত ও পরিবার-গত হয়ে রয়েছে, জাতিগত—সমাজগত—দেশগত হয়ে ওঠেনি। শোভিয়েট সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে যে যেদিন মানুষ মনে করবে যে শুধু তার পরিবার সুখী হলেই সুখ পাওয়া

যায় না—তার গ্রাম ও সমাজকে সুখী করা দরকার, শিক্ষার গৌরব, সম্পদের সচ্ছলতা যেদিন সে শুধু নিজের সন্তানকে দেওয়ার জন্য নয়—সকলের সন্তানকে দেওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌বে—সেইদিন মানুষ হবে সত্যকার মানুষ এবং সেইদিন জাতি হবে সত্যকার জাতি। নৈলে আজ আমাদের যে সমাজ—এ ত সেই রোমের পুরোনো ধনী ও ক্রীতদাসের সমাজ। এক দলের লোক জগতের যত কিছু সুখ সম্ভোগ দু'হাতে ভোগ করে যাচ্ছে, আর—আর এক অনেক বড় দল জীবনপাত করে তাদের সেই ভোগের ইন্ধন জুগিয়ে চলেছে।

উপদেশের দিক দিয়ে, লক্ষ্যর দিক্ দিয়ে, বাণীর দিক দিয়ে, এই ভাবে উদ্দেশ্যমূলক হয়ে রাশিয়ায় নাটকে এক মহা পরিবর্ত্তন ঘটেছে। এই গেল প্রথম পরিবর্ত্তন। দ্বিতীয় পরিবর্ত্তন ঘটেছে, অভিনেতার সঙ্গে দর্শকের সম্বন্ধ-বোধে। আজ পর্য্যন্ত সব দেশে দর্শকের সঙ্গে অভিনেতার সম্বন্ধ এই যে অভিনেতারা পাদপ্রদীপ ও যবনিকার ও-পাশে আলো দিয়ে, রঙ্গসজ্জা দিয়ে, অভিনয় দিয়ে এমন একটা জগতের সৃষ্টি করে—মানব জীবনের এমন একটী কাহিনীকে চিত্রিত করেন, যা দর্শকেরা বেশ ভোগবৃত্ত (passive) ভাবে উপভোগ করতে পারে। অভিনীত জগতের সঙ্গে দর্শকদের পৃথক করার জন্য এই কারণে অভিনয়ের সময় রঙ্গমঞ্চ অ্যালোকিত ক'রে প্রেক্ষাগার থেকে আলোক অপসারিত করা হয়। Miejrhold রাসিয়ায় এই সম্বন্ধে একেবারে এক নব মতের প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি বলেন—এই যে দর্শক ও রঙ্গমঞ্চকে পৃথক করে দেওয়া, এতে নাটকের সম্পূর্ণ উপভোগে বাধা পড়ে। নাটকের কাজ শুধু ত যে কোনও একটা গল্পকে রূপ দেওয়া নয়—কিম্বা নায়ক নায়িকার সুখ দুঃখ দিয়ে দর্শকের সহানুভূতি উত্তেজিত ক'রে শুধু তাকে একটু ভোগবৃত্ত (passive) আনন্দ দেওয়া নয় ;—নাটকের কাজ অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের সমস্ত চেতনা আকাঙ্ক্ষা, বুদ্ধিকে জাগ্রত করা ; এমন ভাবে অভিনয়কে অগ্রসর হতে দেওয়া, যাতে কিছুক্ষণ পরে অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে পাদপ্রদীপ ও যবনিকার যে কৃত্রিম ব্যবধান তা যেন যায় ঘুচে, সমস্ত দর্শক যেন নিজদিগকে এক বিরাট অভিনেতৃ-মণ্ডলী মনে করে এবং যে কাহিনী অভিনীত হচ্ছে, হেসে, কেঁদে, গান গেয়ে, জয়ধ্বনি করে তার সঙ্গে যোগ দেওয়া তাদের পক্ষে অপরিহার্য্য হয়ে ওঠে। Mjeirholdএর মতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই একাত্মতার প্রতিষ্ঠা না হয়—ততক্ষণ পর্য্যন্ত অভিনয় সার্থক হয় না এবং যে শিক্ষা সঞ্চারিত করা এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য তা একেবারে ব্যর্থ হয়।

এই জন্য রাশিয়া আজ সেই সব নাটকের বেশী অভিনয় করছে যাতে রাজতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে বলশেভিজমের অভিযানের—ও জয়লাভের কাহিনী আছে। যখন রাশিয়ার সম্রাটের ও তার অনুগ্রহপুষ্ট জীবদের নির্ম্মম বিলাস ভোগ ও নিষ্ঠুর অত্যাচারের সেই জগদ্দল পাষাণ সৌধ এই দুঃখযাত্রী কৃষক ও শ্রমিকদের ক্রুদ্ধ অধ্যবসায়ের ক্রমাগত আঘাতে চুরমার হয়ে ভেঙ্গে পড়ে, এবং সেই ধ্বংস-স্তূপের আঁধার শ্মশানের ও পরে সোভিয়েটের রক্ত-পতাকা দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে তখন দর্শকেরা ভুলে যায় যে শুধু তারা দর্শক ; বিজয়োল্লাসের সে গভীর ধ্বনি শুধু রঙ্গমঞ্চে আর আবদ্ধ থাকে না—সমস্ত প্রেক্ষাগারের আকাশের উল্লাস সে ধ্বনিকে পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত করে তোলে—দর্শকেরা অভিনয়ের সমস্ত উত্তেজনাটুকু মর্ম্মে মর্ম্মে শোষণ করে নিয়ে যায়।

ঠিক এই একই কারণে অর্থাৎ রঙ্গমঞ্চ আজ জাতির শিক্ষায়তনের এক বিশেষ কেন্দ্র হয়ে উঠেছে বলে সেখানকার প্রায় রঙ্গালয়গুলি জাতীয় সম্পত্তি হয়ে গিয়েছে। অর্থলাভের অথবা ব্যবসায়ের জন্য রঙ্গালয় আর সেখানে চল্‌তে চাইছে না। অপরপক্ষে এটাও ঠিক কথা যে এইভাবে Stateএর শাসনাধীনে না এলে রঙ্গালয়গুলিতে এমন ধারা যুগান্তকারী পরীক্ষা সব চালানোর সুযোগ জুটত না। পরীক্ষার সুযোগ যে কোনও কারণেই জুটুক্—নব্য ভাবের এই সব অভিনয় দেখ্‌তে যে জাতির আগ্রহ অবধি নেই এবং প্রশংসাধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত করে দর্শকেরা যে অভিনয় থেকে ফিরে আসে, এই থেকে বোঝা যায়, রাশিয়ার শ্রমিক ও কৃষক নাট্যজগতের এই বিপ্লবের সুরে সাড়া দিয়েছে।

প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়

শ্রীহরিহর শেঠ

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সেকালের খ্যাতনাম হিন্দু অধিবাসী

(১)

চন্দ্রনাথ পাল—অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে বা মধ্যভাগে চাঁও রোডের চাঁদপাল ঘাট যথায় অবস্থিত তথায় চন্দ্রনাথ পাল নামে একজন মুদি দোকান করিতেন। তিনি সে সময়ে তথায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার নাম হইতেই চাঁদপাল ঘাটের নাম হইয়াছে।

* * *

লক্ষীকান্ত মজুমদার—ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বে হইতেই মজুমদার বংশ বিশেষ বিখ্যাত ছিল। জব চার্ণক যে সময় কলিকাতায় আগমন করেন, তখন তিনি একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। বর্ত্তমান লালদীঘির ধারে তাঁহার একটী পাকা কাছারী-বাড়ী ছিল। উহা কোম্পানীর সেরেস্তা রাখিবার জন্য প্রথম ভাড়া লওয়া ও পরে কিনিয়া লওয়া হয়। লালদীঘি পুষ্করিণীটিও তাঁহাদের ছিল। এখানে শ্যাম রায় বিগ্রহের ঠাকুরবাড়ী ছিল। সুপ্রসিদ্ধ কবিওয়ালা এণ্টনি সাহেবের পিতামহ জন্ এণ্টনি তাঁহার কর্ম্মচারী ছিলেন। এই এণ্টনি সাহেবের নামেও এণ্টনী বাগান লেন নামে একটী পথ আছে।

* * *

রাজা উদমন্ত সিংহ—ইনি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজা দেবী সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র, মুরশিদাবাদ নশীপুরের মহারাজা রণজিৎ সিংহের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। ইনি ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা প্রচুর ধন সঞ্চয় করেন। তাঁহার অধীনে অনেক নগদী সেনা ছিল। রেওয়ার রাজার বিরুদ্ধে অভিযানকালে ইনি কোম্পানীকে সেনা দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন। মুরশিদাবাদের নবাব নাজিম আলিজার আমলে ১৮১০ হইতে ১৮২১ পর্য্যন্ত ইনি দেওয়ানের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। বড় বাজারের রাজা উদমন্ত ষ্ট্রীটের ইঁহার নামেই নামকরণ হইয়াছে।

* * *

মহারাজা রাজবল্লভ—ইনি মহারাজা দুর্ল্লভরামের পুত্র। নবাবী আমলে মহারাজা রাজবল্লভ ঢাকার ডেপুটী গভর্ণর ছিলেন। ইনি একজন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। ইহাঁর সহিত সিরাজদ্দৌলার মনোমালিন্য ঘটে। ইহাঁর পুত্র কৃষ্ণদাস ইংরাজ গভর্ণর ড্রেকের আশ্রয় লাভ করিবার জন্য কলিকাতায় আইসেন। এই ব্যাপার লইয়া নবাবের সহিত ইংরাজদের মনোমালিন্য ঘটে ; নবাব কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রান্ত হওয়ার ইহাও কতকটা কারণ। রাজবল্লভ কিছুকাল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাউন্সিলের অবৈতনিক সদস্য ছিলেন। তিনি বাগবাজারে একটি স্নানের ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

* * *

নন্দরাম সেন—১৭০০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার প্রথম কলেক্টর রাল্‌ফ্ শেল্‌ডনের তিনি সহকারী ছিলেন, কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী কলেক্টর তহবিল তছরূপ অপরাধে তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। ১৭০৭ সালে তিনি পুনরায় পূর্ব্বপদে নিয়োজিত হন, কিন্তু তাঁহার অপরাধের জন্য তাঁহাকে দণ্ডভোগ করিতে হইয়াছিল। "রথতলার-ঘাট" ইহাঁরই দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়।

* * *

কালীপ্রসাদ দত্ত—ইনি মহারাজা নবকৃষ্ণের সময়ের পূর্ব্বের বড়মানুষ চূড়ামণি দত্তের পুত্র। নবকৃষ্ণ ও চূড়ামণি উভয়েই স্ব-স্ব দলস্থ ব্যক্তিগণের অধিনায়ক ছিলেন। চূড়ামণি দত্তের শ্রাদ্ধের সময় একটা গোলযোগ ঘটায় নবকৃষ্ণ তাঁহার দলস্থ কায়স্থগণকে সভাক্ষেত্রে যোগদান করিতে নিষেধ করায় কালীপ্রসাদ বড়িশা-বেহালার

সাবর্ণ চৌধুরী জমীদার সন্তোষ রায়ের শরণাপন্ন হন। ইনি স্বদলস্থ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণকে লইয়া কালীপ্রসাদের বাটীতে উপস্থিত হওয়ায় তিনি পিতৃদায় হইতে উদ্ধার পান। এজন্য তিনি ব্রাহ্মণদের পাথেয় ও বিদায় হিসাবে বহু অর্থ দান করেন। কথিত আছে এরূপ দানগ্রহণ সমীচীন নহে বিবেচনা করিয়া সন্তোষ রায় তাহা কালীঘাটের মন্দির নির্ম্মাণার্থ ব্যয় করেন।

* * *

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র—ইনি একজন বিখ্যাত প্রত্ন-তাত্ত্বিক ছিলেন। ইনি ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে সুঁড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম জন্মেজয় মিত্র, প্রপিতামহ রাজা পীতাম্বর মিত্র মোগল বাদসাহের একজন প্রিয়-পাত্র ছিলেন। তিনি বংশানুক্রমে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। রাজেন্দ্রলাল ইংরাজি বিদ্যালয়ে পড়িয়া ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহাকে চিকিৎসা-বিদ্যায় অধিকতর পারদর্শী করিবার জন্য বিলাতে লইয়া যাইবার ইচ্ছা করেন, কিন্তু তাঁহার পিতা সম্মত হইলেন না এবং মেডিক্যাল কলেজ হইতে ছাড়াইয়া লইলেন। তৎপরে তিনি আইন শিক্ষা করেন। ২২ বৎসর বয়সে তিনি এসিয়াটিক্ সোসাইটির সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন এবং দশ বৎসর এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "বিবিধার্থ সংগ্রহ" এবং তৎপরে "রহস্য সন্দর্ভ" নামক সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৫৫-৫৬ সালে তিনি ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউশনের পরিচালক নিযুক্ত হন। কলিকাতা কর্পোরেশন্ প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি সরকার কর্ত্তৃক একজন কমিশনর নিযুক্ত হন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি এসিয়াটিক্ সোসাইটির সভাপতি হন। বৃটিশ্ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের প্রথম হইতে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং সভাপতি হইয়াছিলেন।

তিনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ফার্শি, হিন্দি, উর্দ্দু, উড়িয়া ভিন্ন গ্রীক্, ল্যাটিন্, ফরাসী ও জার্ম্মাণ ভাষাও জানিতেন। তাঁহার সময়ে তাঁহার মত পণ্ডিত এবং বহুভাষাবিৎ বাঙ্গালী আর কেহ ছিলেন না। তিনি প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক বহু মূল্যবান গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ডক্টর অব্ ল, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে রায় বাহাদুর, পর বৎসর সি-আই-ই এবং পরে রাজা উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি মাসিক ৫০০৲ টাকা বিশেষ বৃত্তি পাইয়াছিলেন। ৬নং মাণিকতলা রোডে তাঁহার বাসভবন ছিল।

* * *

রতন সরকার—ইনি প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দ্বিভাষীর কার্য্য করিয়া প্রচুর ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। কথিত আছে ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে "থ্যাকন্" নামক একখানি জাহাজ কলিকাতায় পৌঁছিলে তাহার কাপ্তেন ষ্টাফোর্ড সাহেব একজন দ্বিভাষী অন্বেষণ করায় তাঁহার কথা না বুঝিয়া একজন ধোপার আবশ্যক মনে করিয়া ধোপা রতন সরকারকে আনয়ন করা হয়। তিনি ইংরাজী জানিতেন না, মাত্র দুই দশটা ইংরাজী কথা জানিতেন। যাহা হউক অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হওয়ায় তিনি কাপ্তেনের প্রিয়পাত্র হন। তাঁহার নামে বড়বাজারে একটি পথ আছে।

* * *

জনার্দ্দন শেঠ—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম আমলে ইনি তাঁহাদের দালালি করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ইহাঁর আদিপুরুষ মুকুন্দ রাম ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সপ্তগ্রাম হইতে বাস উঠাইয়া সর্ব্বপ্রথমে গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করেন। তখন এই স্থান গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এজন্য শেঠেদের নাম "কলিকাতার জঙ্গলকাটা-বাসিন্দা"। তাঁহাদের গৃহদেবতা গোবিন্দজীউর নাম হইতে গোবিন্দপুর নাম হইয়াছে এইরূপ জনপ্রবাদ। জনার্দ্দনের পুত্র বৈষ্ণবচরণ ব্যবসা দ্বারা প্রচুর ধন-সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

* * *

দুর্গাচরণ পিতুড়ী—ইনি সেকালের একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোক ছিলেন। তেজারতি ও কণ্ট্রাকটারি কার্য্যে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। পলাশী যুদ্ধের পর ফোর্ট উইলিয়মের কার্য্যে তিনি নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

* * *

রামমোহন মল্লিক—বড়বাজারের মল্লিক বংশের নিমাই চরণ মল্লিক মহাশয়ের ইনি জ্যেষ্ঠ পুত্র, ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। লবণের ব্যবসা দ্বারা তিনি অগাধ অর্থ

...র্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি বিশেষ দাতা ও সদাশয় ...ক্তি ছিলেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পিতৃনামে বড়বাজারে ...কটী স্নানের ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

* * *

কাশীপ্রসাদ মিত্র—ইনি স্বনাম-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। ...দাহের জন্য কাশী মিত্রের ঘাট নামে যে ঘাট আছে ...হা ইহাঁরই নামে প্রতিষ্ঠিত।

* * *

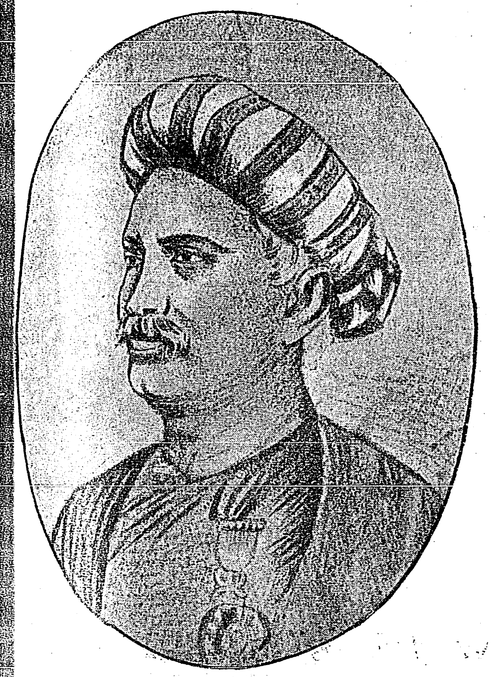

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র

...হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়—দরিদ্র কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরের ...ান। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ভবানীপুরে মাতামহাশ্রমে ইঁহার জন্ম ...। দরিদ্রতা নিবন্ধন ভালরূপ লেখাপড়া শিক্ষা করিবার ...হার সুযোগ হয় নাই। প্রথম টালক্ কোম্পানীর নীলাম-ঘরে ...টাকা বেতনে কার্য্য গ্রহণ করেন, তৎপরে পঁচিশ টাকা ...তনে মিলিটারী অডিটার জেনারেল্ অফিসে প্রবেশ ...রিয়া শেষে চারিশত টাকা পর্য্যন্ত বেতন হয়। হরিশ্চন্দ্রের ...াজি ভাষার উপর দখল যথেষ্ট ছিল। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ...ম হিন্দু পেট্রিয়ট্ নামক পত্রিকা সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে কখন উহার ১৫০ জনের অধিক গ্রাহক হইত না। কিন্তু এই পত্রিকার খ্যাতি যথেষ্ট ছিল। তিনি দরিদ্রদের জন্য সর্ব্বদা লেখনী পরিচালন করিতেন। ভবানীপুরের ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা বিষয় তিনি যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর সাধারণের চাঁদায় ১০৫০০৲ টাকায় বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন্ ভবনে তাঁহার নামে একটি পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠিত হয়।

* * *

অক্রূরচন্দ্র দত্ত—ওয়েলিংটন্ স্কোয়ারের নিকট সুবি-

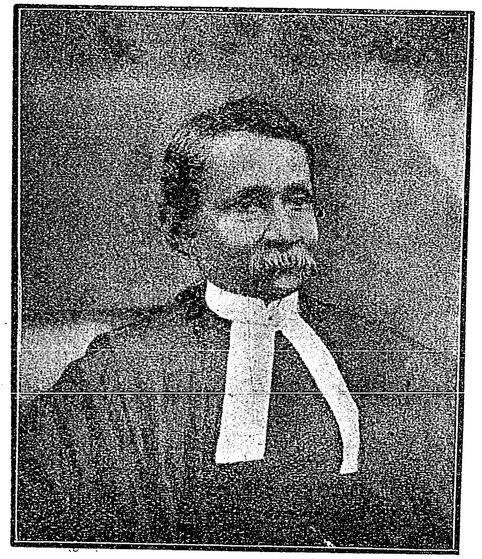

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কেটি

খ্যাত দত্ত পরিবার-সম্ভূত অক্রূর দত্ত মহাশয় কোম্পানীর আমলে কমিশেরিয়েট বিভাগে কার্য্য করিয়া প্রভূত ধনসঞ্চয় করেন। বীরভূমের যুদ্ধ ব্যাপারে তিনি ইংরাজ সেনার সহিত তথায় উপস্থিত ছিলেন। এই দত্ত বংশ নানাবিধ ক্রিয়াকলাপের জন্য কলিকাতা সমাজে বিশেষ পরিচিত। খ্যাতনামা মহিলা-কবি গিরীন্দ্রমোহিনী এই দত্ত পরিবারের বধূ।

* * *

স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়—ব্রাহ্মণ্যের উজ্জ্বল আদর্শ স্যার্ গুরুদাস ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সি

কলেজ হইতে এম্ এ ও বি-এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কিছুদিন বহরমপুর কলেজে আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। হিন্দু আইনের অভিজ্ঞতা জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি-এল্ উপাধি প্রাপ্ত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু আইনের অধ্যাপক পদেও তিনি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ছোটলাটের কাউন্সিলের সদস্য ও ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হন এবং এই বৎসরই "নাইট" উপাধি ভূষিত হন। ১৮৯০ খৃঃ অব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সলার হন এবং ১৮৯২তে গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত

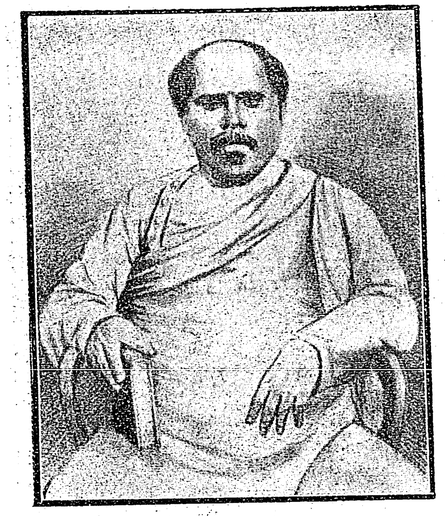

প্যারীচরণ সরকার

ইণ্ডিয়ান্ ইউনিভার্সিটি কমিশনের কার্য্য অতি দক্ষতার সহিত পরিচালন করেন। পাশ্চাত্য বিদ্যায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াও তিনি একজন আদর্শ ব্রাহ্মণ, সংস্কৃতজ্ঞ ও অন্তরে বাহিরে খাঁটি হিন্দু ছিলেন। তিনি ইংরাজি ও বাঙ্গালায় অনেকগুলি গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সরলচিত্ত, বিনয়ী, পণ্ডিত, সর্ব্ববিষয়ে আদর্শ বাঙ্গালী অধুনা দুর্লভ।

* * *

দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসু—১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম দয়ারাম বসু। নবাব কর্ত্তৃক কলিকাতা লুণ্ঠনের পর ক্ষতিপূরণের টাকা অধিবাসীদের মধ্যে বিতরিত করিবার জন্য যে কয়জন কমিশনার নিযুক্ত হন ইনি তাঁহাদের অন্যতম। কৃষ্ণরাম প্রথমে লবণের ব্যবসায়ে যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করেন। তৎপরে মাসিক দুই হাজার টাকা বেতনে হুগলীর দেওয়ান নিযুক্ত হন। ইনি বহু সৎকর্ম্ম করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কাশীতে অনেকগুলি মন্দির নির্ম্মাণ, কটক হইতে পুরী পর্য্যন্ত পথিপার্শ্বে আম্রবৃক্ষ রোপণ এবং ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের সময় এক লক্ষ টাকার চাউল বিতরণ উল্লেখযোগ্য। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক প্রাপ্ত হন।

বিশ্বনাথ মতিলাল

* * *

দর্পনারায়ণ ঠাকুর—ইনি মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বৃদ্ধ-পিতামহ ছিলেন। এই বংশের পঞ্চানন ঠাকুর সপ্তদশ শতাব্দীতে কলিকাতার জঙ্গল কাটাইয়া বসতি স্থাপন করেন। ইঁহার পুত্র জয়রাম প্রথম পাথুরিয়াঘাটায় আইসেন। দর্পনারায়ণ চন্দননগরে ফরাসী গভর্ণমেণ্টের অধীনে দেওয়ানী করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

* * *

গোকুলচন্দ্র মিত্র—ইনি সেকালের একজন নামজাদা ক্রিয়াবান লোক ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম সীতারাম মিত্র—আদি নিবাস ছিল বালি। গোকুলচন্দ্র কোম্পানীর নিমক মহলে কাজ করিয়া ধনবান হন। ইঁহাদের বাটীতেই "মদনমোহন ঠাকুর" আছেন। কথিত আছে এই বিগ্রহ বিষ্ণুপুরের রাজাদের ছিল, লক্ষ টাকায় মিত্র মহাশয়েদের নিকট বন্ধক রাখায় খালাস করিতে না পারায় তাঁহাদের হইয়া যায়। আবার অন্য মতে আসল বিগ্রহ তিনি রাখিয়া তদনুরূপ বিগ্রহ নির্ম্মাণ করাইয়া রাজাদের দিয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

ইঁহাদের প্রাসাদতুল্য বাটী সেকালের কলিকাতার একটী দর্শনীয় বস্তু ছিল। এতবড় নাটমন্দির আর কোন বাটীতে নাই।

* * *

হরচন্দ্র ঘোষ—১৮০৮ খৃষ্টাব্দে বেহালার ঘোষ বংশে ইঁহার জন্ম হয়। হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভের পর লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক তাঁহাকে গভর্ণর জেনারেলের দেওয়ানের পদ দিবার ইচ্ছা করেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন না। তৎপরে তিনি নূতন সৃষ্ট মুনসেফের পদে একশত টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। এক বৎসরের মধ্যে বাঁকুড়ায় সদর আমিনের পদে উন্নীত হন এবং ছয় বৎসর তথায় থাকিয়া হুগলিতে বদলি হন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় প্রীত হইয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে বিবিধ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার জুনিয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট এবং দুই বৎসর পরে ছোট আদালতের বিচারপতি পদে নিযুক্ত করেন। বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই ছোট আদালতের প্রথম বাঙ্গালী জজ। তিনি একজন উচ্চ-নীতির আদর্শ-চরিত্র ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বাঁকুড়া ও বেহালায় দুইটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি বেথুন স্কুল্ কমিটির একজন সভ্য ছিলেন। তিনি রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর

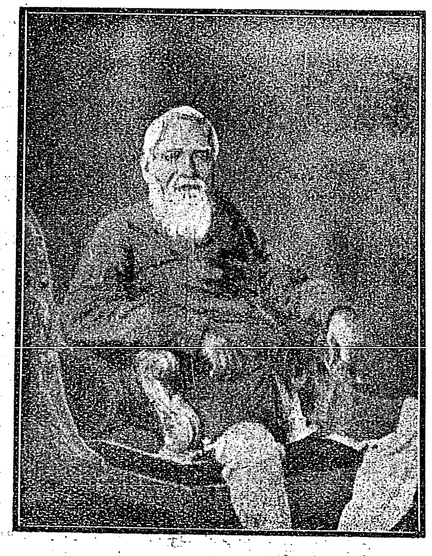

রামতনু লাহিড়ী

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারি টাউনহলে একটি শোকসভা হয়। ছোট আদালতের সম্মুখের বারান্দায় তাঁহার একটি মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

* * *

সীতারাম ঘোষ—ইনি পূর্ব্বোক্ত হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের আদিপুরুষ; বেহালা বড়িষার ঘোষ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার নামে একটী পথ আছে।

* * *

প্যারীচরণ সরকার—১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়।

প্রথমে হেয়ার স্কুল পরে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ইনি শিক্ষালাভ করেন। সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ৪০৲ টাকা বৃত্তি পান। শিক্ষালয় ত্যাগ করিয়া তিনি শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী হন। হুগলী ব্রাঞ্চ ও বারাসত স্কুলে শিক্ষকতা করার পর ইনি হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। পরিশেষে প্যারীচরণ প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরাজী ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইনিই এই কলেজের ইংরাজী ভাষার প্রথম অধ্যাপক। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এডুকেশন গেজেট পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তাহার সম্পাদক হন। স্ত্রী-শিক্ষা প্রচার উদ্দেশ্যে তিনি চোরবাগানে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁহারই চেষ্টায়

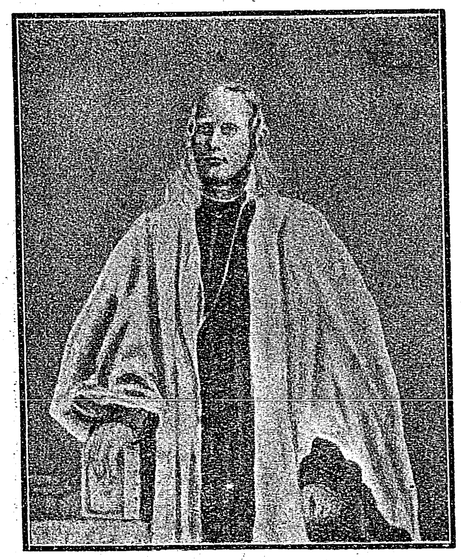

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সুরাপাননিবারিণী সভার প্রতিষ্ঠা হয়। সুরাপানের অপকারিতা বুঝাইবার জন্য ইংরাজিতে Well-wisher এবং বাঙ্গালায় "হিতসাধক" বলিয়া দুইখানি পত্রিকা প্রচার করেন। তিনি তাঁহার সময়ের প্রায় সকল জনহিতকর অনুষ্ঠানের সহিত জড়িত ছিলেন। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় তিনি একটি অন্নছত্র খুলিয়া বহু লোককে অন্নদান করেন। তাঁহার লিখিত ইংরাজি শিক্ষা বিষয়ক বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকগুলি আজিও সর্ব্বত্র সমাদৃত।

* * *

রামচন্দ্র ঘোষ—ইনি কুমারটুলীর মজুমদার বংশের আদিপুরুষ হুগলীর নিকটবর্ত্তী আক্না গ্রাম হইতে আসিয়া সুতানুটীর অন্তর্গত কুমারটুলীতে বাস স্থাপন করেন। নবাবের নিকট হইতে তাঁহার কৃত বহু সৎকর্ম্মের জন্য তিনি মজুমদার উপাধি প্রাপ্ত হন। এই মজুমদার পরিবার কাশীতে শিবস্থাপনা, মাহেশে দ্বাদশ মন্দির নির্ম্মাণ এবং কুমারটুলিতে একটী ঘাট প্রতিষ্ঠা করিয়া খ্যাতিলাভ করেন। এই পরিবারের বলরাম মজুমদার

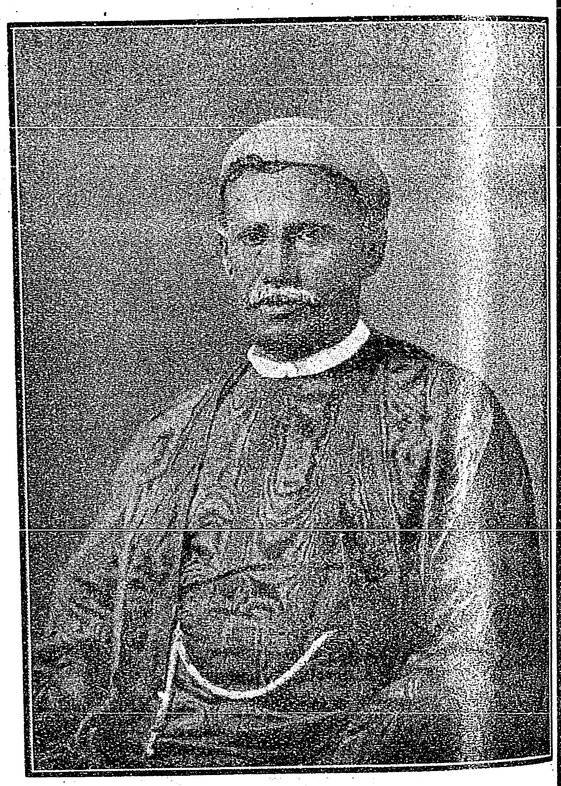

রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ রায়

একজন নামজাদা লোক ছিলেন। তাঁহার নামে এক পথ আছে।

* * *

জয়নারায়ণ চন্দ্র—ইনি ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করে পিতার নাম ছিল বলরাম চন্দ্র। শ (M. D. Shaw) নাম একজন সেকালের ব্যারিষ্টারের সহকারীর কার্য্য করিতে ইংরাজি বাঙ্গলা ভিন্ন ফরাসী, পার্শী ও সংস্কৃত ভাষা

ইঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। বর্দ্ধমানের জাল প্রতাপচাঁদের মোকদ্দমায় সহায়তা করায় তিনি ইঁহাকে একখানি তলোয়ার ও একটী বন্দুক উপহার দিয়াছিলেন। প্রতাপচাঁদ কিছুকাল তাঁহার চাঁপাতলার বাটীতে লুকাইয়া ছিলেন। ইনি একজন দাতা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইনি বৃন্দাবনের বর্ষাণ গ্রামে কতিপয় ইন্দারা এবং কালনায় ভগবানদাস বাবাজির ব্রহ্মদেবতার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

* * * *

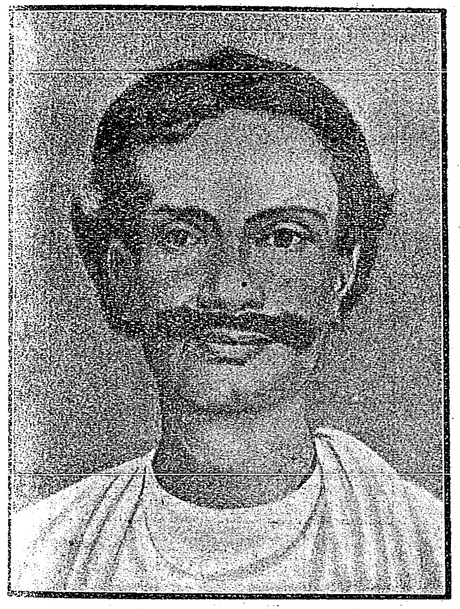

হরকুমার ঠাকুর

বিশ্বনাথ মতিলাল—মতিলাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বনাথ মতিলাল কলিকাতার প্রাচীন অধিবাসীদের অন্যতম ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে তিনি বঙ্গীয় সমাজে একজন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লবণের গোলায় মাসিক আট টাকা বেতনে চাকুরীতে ঢুকিয়া শেষে তথাকার দেওয়ান হন। বৌবাজার নামক বাজারটী তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার এক পুত্রবধূ তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্যের এক অংশ প্রাপ্ত হন এবং তাহা হইতেই বৌবাজার নাম হয়। সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জি এই বংশে বিবাহ করেন। ভাওয়াল ও নদীয়ার রাজবংশের সহিত এই বংশ বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ।

* * * *

গিরীশচন্দ্র ঘোষ—১৮২৯ সালের ২৭শে জুন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ কাশীনাথ ঘোষ মহাশয় একজন দাতা বলিয়া খ্যাত ছিলেন। গিরীশচন্দ্র প্রথম ১৫৲ টাকা বেতনে একটী সামান্য কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মিলিটারি অডিটার জেনারেল

মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা

অফিসে বদলি হন এবং বেতন বৃদ্ধি হইয়া ৫০৲ টাকা হয়। এই স্থানে তিনি সুপ্রসিদ্ধ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত পরিচিত হন এবং ইহা ক্রমে প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। গিরীশচন্দ্র তাঁহার কার্য্যকুশলতার জন্য শেষে ৩৫০৲ টাকা বেতন পাইতেন। তখন তিনি রেজিষ্ট্রারের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন, যাহা তাঁহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালীকে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু তাঁহার প্রসিদ্ধির কারণ ইহা নহে। সংবাদপত্রসেবক ও বক্তা রূপেই তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রথম তিনি কৈলাসচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত Literary Chronicleএ লিখিতে আরম্ভ

করেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীনাথ চন্দ্রের সহিত একত্র The Bengal Recorder নামক সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদন করেন। ইহা মাত্র দুই বৎসর প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে The Hindoo Patriot প্রকাশ করিয়া ১৮৫৫ পর্য্যন্ত—হরিশ্চন্দ্র উহার ভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উহা সম্পাদন করেন। পুনরায় তাঁহার মৃত্যুর পর বন্ধুর মাতা ও পত্নীর জন্য কিছুদিন পেট্রীয়টের ভার লইয়াছিলেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গলী পত্রিকা প্রকাশ করিয়া ১৮৬৯এ তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে পর্য্যন্ত অতি দক্ষতা ও স্বাধীনতার সহিত উহা সম্পাদন করিয়াছিলেন। ডালহাউসি ইনষ্টিটিউট্, বেথুন সোসাইটী, বৃটিশ্ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন্ প্রভৃতি

তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী

যে সকল সমিতির তিনি সভ্য ছিলেন, তথায় অনেক ভাল ভাল বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে হুগলী কলেজ হলে রামদুলাল দে সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহাই পরে বর্দ্ধিত ও সংশোধিত হইয়া রামদুলাল দের জীবনী রূপে প্রকাশ করেন। জীবনের শেষ পাঁচ বৎসর তিনি বেলুড়ে বাস করিয়াছিলেন। তথায় একটী সামান্য বাঙ্গলা পাঠশালাকে তিনি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত করেন। তিনি হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনর রূপেও যথেষ্ট কার্য্য করিয়াছিলেন।

* * * *

রামসুন্দর মিত্র—কোম্পানীর পাটনার আফিংএর কুঠীর দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার পুত্র মোহনলাল ও শ্যামলালের নামে বাগবাজারে দুইটী পথ আছে।

* * * *

যাদবিন্দু শেঠ—ইনি চৈতন্যচরণ ও নন্দলাল শেঠের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। তিনি বৃন্দাবন বসাকের সহিত কোন ইংরাজ সওদাগরের মুচ্ছুদ্দি ছিলেন। শেঠেরা কলিকাতার অতি পুরাতন অধিবাসী। তাঁহারা দূরদেশে গঙ্গাজল পাঠাইয়া বহু ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সেকালে তাঁহাদের মোহরাঙ্কিত বোতলে গঙ্গাজল দূরদেশ সকলে বিশুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইত।

* * * *

ডাক্তার জগদ্বন্ধু বসু

রামতনু লাহিড়ী—সমাজ সংস্কারক রূপে যে সকল মহাত্মা এ দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ইনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে জন্ম গ্রহণ করেন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে হেয়ার সাহেব প্রতিষ্ঠিত সোসাইটির স্কুল, যাহা পরে হেয়ার স্কুল নামে অভিহিত হয় তথায় অবৈতনিক ছাত্ররূপে প্রবিষ্ট হন। পরে হিন্দু স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি খ্যাতনামা অধ্যাপক ডিরোজিওর ছাত্র ছিলেন এবং তাঁহার প্রভাব ইঁহার চরিত্রে যথেষ্টরূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল। এবং তাহারই ফলে তিনি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রসিক কৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, রাজা দিগম্বর মিত্র, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন

বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি হিন্দু কলেজে শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করেন এবং বর্দ্ধমান, বারাসত, উত্তরপাড়া, বরিশাল, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে সম্মানের সহিত কার্য্য করিয়া ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। তৎপরে কতিপয় বৎসর কৃষ্ণনগরে বাস করিয়া ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আগমন করেন। এই স্থানে বাসকালীন বহু জনহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রমানাথ ঘোষ

* * * *

দ্বারকানাথ মিত্র—হুগলী জেলার একটী সামান্য পল্লীতে এক সামান্য গৃহস্থের ঘরে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। হুগলী কলেজে তাঁহার প্রথম শিক্ষা লাভ হয় এবং তিনি জুনিয়ার ও সিনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। তৎপরে প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা সমাপনান্তে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি করিতে প্রবেশ করেন। তিনি শীঘ্রই তদানীন্তন আদালতের দুইজন নেতৃস্থানীয় উকিল রমাপ্রসাদ রায় এবং শম্ভুনাথ পণ্ডিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই প্রথমোক্ত ব্যক্তিই প্রথম বাঙ্গালী হাইকোর্টের বিচারপতি মনোনীত হন। দ্বারকানাথ প্রথমে ইঁহার জুনিয়ররূপে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতির পদ প্রাপ্ত হন। তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যার বার্ণেস্ পিকক্ (Sir Barnes Peacock) তাঁহার দক্ষতার পরিচয় পাইয়া বিশেষ প্রশংসা করেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারি তিনি ৪১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

* * * *

রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ

মহারাজা রমানাথ ঠাকুর—শেরবোর্ণ স্কুলে ইংরাজি শিক্ষা করিয়া তিনি বাটীতে সংস্কৃত, ফার্সি ও বাঙ্গালা শিক্ষা করেন। বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া প্রথম তিনি এলেকজাণ্ডার কোম্পানীর অফিসে কার্য্য গ্রহণ করেন। তৎপরে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বারকানাথ ঠাকুরের চেষ্টায় তথায় কোষাধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন। পরে এই ব্যাঙ্ক উঠিয়া যাইলে তিনি একজন লিকুইডেটারের কার্য্য করেন।

তিনি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সহিত মিলিত হইয়া The Reformer নামক ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ

করেন। তিনি জমিদার সভার সভ্যরূপে অনেক কাজ করিয়াছিলেন এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন্ প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রথম তাহার সহকারী সভাপতি এবং পরে প্রায় দশ বৎসর সভাপতির কার্য্য করেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ্ কাউন্সিলের এবং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলে সদস্যের পদ প্রাপ্ত হন এবং রাজা উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের সংশ্রবে কার্য্য করায় C, S. I. উপাধি প্রাপ্ত হন। বেলগেছিয়ায় দেশীয় সম্প্রদায় রাজপুত্রকে যে অভ্যর্থনা করেন সেই অভ্যর্থনা সমিতির তিনি সভাপতি হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষ্যে যুবরাজ তাঁহাকে একটী সুন্দর

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে

অঙ্গুরীয়ক উপহার দিয়াছিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, হিন্দু কলেজের একজন গভর্ণর, কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনর ও দেশীয় হাঁসপাতালের একজন্ গভর্ণর ছিলেন। দেশের সকল সৎকার্য্যে তাঁহার সাধ্যমত দান ছিল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ৭৭ বৎসর বয়সে পরলোক প্রাপ্ত হন।

*   *   *   *

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ডিরোজিওর শিক্ষার প্রভাবে ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার সহপাঠী রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও প্যারীচাঁদ মিত্রের ন্যায় ভাবান্তর উপস্থিত হয় এবং ডাক্তার ডফের সহিত পরিচয়ের ফলে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। The Inquirer নামে তিনি একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সরকারের সহায়তায় তিনি Encydopædia Bengalensis নামে ইংরাজি ও বাঙ্গলায় লিখিত একখানি গ্রন্থ ত্রয়োদশ খণ্ডে প্রকাশ করেন। তিনি প্রথম ধর্ম্ম-প্রচারকের কার্য্য গ্রহণ করেন, তৎপরে ১৮৫২ হইতে ৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিশপ্ কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত

জয়গোবিন্দ লাহা

থাকেন। ১৮৬১ অব্দে ষড়দর্শন সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া যশস্বী হন। তিনি সর্ব্বশুদ্ধ এগারটী ভাষা জানিতেন। তিনি কলিকাতা ইউনিভার্সিটির ফেলো, বেথুন্ সোসাইটির সহ-সভাপতি, কলিকাতা কর্পোরেশনের, এসিয়াটিক্ সোসাইটির, বৃটিশ্ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের এবং বোর্ড অব্ একজামিনারের সদস্য ছিলেন। তিনি ডক্টর অব ল-র অবৈতনিক ডিগ্রী এবং সি-আই-ই উপাধির দ্বারা সম্মানিত হইয়াছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ৭২ বৎসর বয়ক্রমে তাঁহার মৃত্যু হয়।

*   *   *   *

কান্তবাবু—কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কান্তবাবুর পূর্ণ নাম হইতেছে কৃষ্ণকান্ত নন্দী। তাঁহার প্রপিতামহ ভাগ্যান্বেষণের জন্য বর্দ্ধমান জেলার সিজনা গ্রাম হইতে কাশিমবাজারের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেসমের কুঠির সন্নিকটে শ্রীপুর নামক গ্রামে আসিয়া বাস করেন। উৎসাহ ও অধ্যাবসায় বলে তিনি ব্যবসায়ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেন। কান্তবাবু বৃটিশদের অভ্যুদয় সম্ভাবনা দেখিয়া প্রথম হইতেই তাঁহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট হন এবং হেষ্টিংসের বিশেষ উপকার করেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতার পরিচয় পাইয়া ওয়ারেন হেষ্টিংস্ তাঁহাকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একটি কেরাণীর পদে নিযুক্ত করেন। তৎপরে তিনি তাঁহার মুচ্ছুদ্দির পদে নিযুক্ত হন এবং হেষ্টিংসের দ্বিতীয়বার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসার পর তিনি যতদিন এ দেশে ছিলেন তাঁহাকে দেওয়ানের (Confidential Seretary) পদে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই সময় তিনি গবর্ণরের সহিত কলিকাতায় বাস করিতেন। তিনি তখন বিশেষ নামজাদা লোক হইয়াছিলেন, সরকারের নিকট তাঁহার ন্যায় খাতির আর কাহারও ছিল না। কলিকাতায় জাতিঘটিত মোকদ্দমার বিচারের ভার তখন তাঁহার উপরই ন্যস্ত ছিল। হেষ্টিংসের অবসর গ্রহণের পর ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কাশিমবাজারে ফিরিয়া যান এবং তাঁহার একমাত্র পুত্র লোকনাথকে রাখিয়া লোকান্তরিত হন।

*   *   *   *

লক্ষীকান্ত ধড়—পোস্তার রাজবংশের আদি পুরুষ লক্ষীকান্ত ধড় সাধারণতঃ নকু ধড় নামে পরিচিত ছিলেন। ইনি জব চার্ণকের সহিত হুগলী হইতে সুতানুটীতে আইসেন। তাঁহাদের আদি নিবাস ছিল সপ্তগ্রাম। তিনি তৎকালে একজন বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তি ছিলে। পলাশি যুদ্ধের পূর্ব্বে তিনি ক্লাইব্‌কে যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য করিয়াছিলেন এবং প্রথম মহারাষ্ট্র যুদ্ধের সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নয় লক্ষ টাকা কর্জ্জ দিয়া সহায়তা করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন যখনই কোম্পানীর অর্থের প্রয়োজন হইত তিনি সাহায্য করিতেন। অন্যান্য বিষয়েও তিনি কোম্পানীর বন্ধু ছিলেন। লক্ষ্মীকান্তই শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণকে প্রথম ক্লাইবের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন এবং ইহা হইতেই তাঁহার সৌভাগ্যের সূত্রপাত হয়। কথিত আছে নবকৃষ্ণ পোস্তার রাজবাটীতে কখন জুতা পায়ে দিয়া যাইতেন না। লক্ষীকান্তের কোন পুত্র সন্তান ছিল না, একমাত্র কন্যা পার্ব্বতী দাসীকে রাখিয়া তিনি মারা যান।

*   *   *   *

মহারাজা সুখময় রায়—ইনি উল্লিখিত লক্ষীকান্ত ধড়ের দৌহিত্র পার্ব্বতী দাসীর পুত্র ছিলেন। তিনি লক্ষীকান্তের বিপুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হন। তিনি বহু জনহিতকর কার্য্যে বিস্তর অর্থব্যয় করেন। এই সকলের মধ্যে

মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর

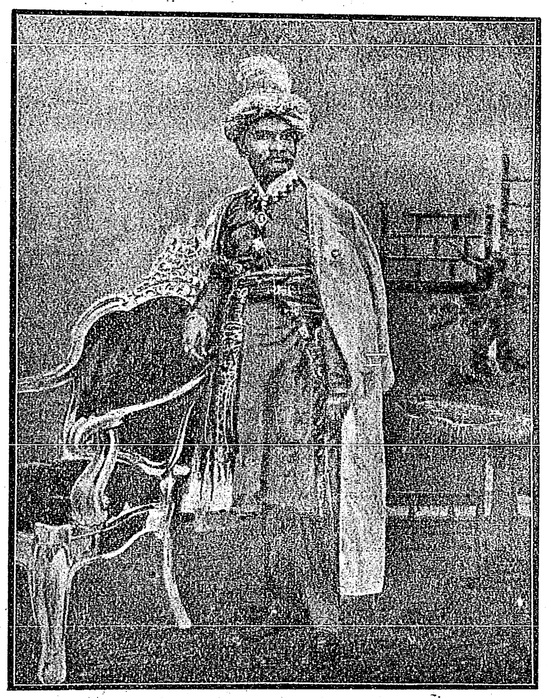

উলুবেড়িয়া হইতে পুরীর সিংহদ্বার পর্য্যন্ত দুই শত আশী মাইল পথ ও তৎপার্শ্বে বহু সংখ্যক ইষ্টক নির্ম্মিত সুপ্রশস্ত ধর্ম্মশালা ও কূপ ১৫০০০০৲ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মাণ করেন; এবং বৃন্দাবনস্থিত তাঁহার কুঞ্জে অতিথি অভ্যাগতদের সেবার্থ ১৫০০০৲ এবং সুতোবাদীতে গোপালজীউর পূজার জন্য ১৫০০০৲ টাকা দান উল্লেখযোগ্য। দিল্লীর বাদশাহ কর্ত্তৃক তিনি মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হন এবং পাল্কি ব্যবহারের

অধিকার প্রাপ্ত হন। যখন বেঙ্গল ব্যাঙ্ক প্রথম স্থাপিত হয়, তখন তিনিই প্রথম তথাকার বাঙ্গালী ডিরেক্টর হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র, বৈদ্যনাথ, শিবচন্দ্র ও নর্সিংচন্দ্র নামে পাঁচ পুত্র রাখিয়া ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লোকান্তরিত হন। রামচন্দ্রও মহারাজা উপাধি পাইয়াছিলেন। খ্যাতনামা রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ ইহাঁরই প্রপৌত্র ছিলেন। রাজা বৈদ্যনাথও তাঁহার দাতব্যের দ্বারা বংশ-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

* * * *

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর—সুপ্রসিদ্ধ গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র হরকুমারের পুত্র যতীন্দ্রমোহন ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে

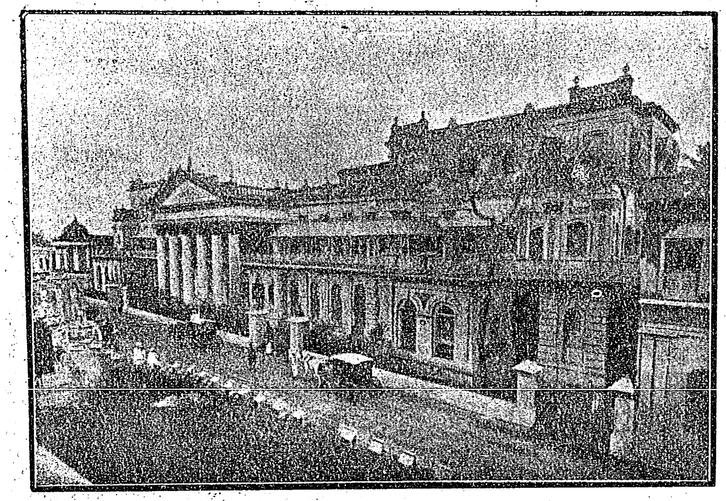

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাসাদ

জন্ম গ্রহণ করেন। গোপীমোহন বাঙ্গলা, সংস্কৃত, উর্দ্দু, ফরাসী, পোর্ত্তুগীজ্ এবং ইংরাজি ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। হরকুমার সংস্কৃত ভাষায় একজন সুপণ্ডিত ছিলেন এবং সংস্কৃত ভাষায় তিনখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। যতীন্দ্রমোহন হিন্দু কলেজে পড়ার পর বাটীতে জোফ্রে (Herman Geoffery) ন্যাস্ (Dr. Nash) এবং পরে ক্যাপ্টেন্ রিচার্ডশনের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ইংরাজি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁহার পিতার ন্যায় সংস্কৃত শিক্ষাতেও তাহার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল এবং বাটীতে পণ্ডিতের নিকট উহা শিক্ষা করেন। বাঙ্গলা রচনাতেও তাঁহার পারদর্শিতা ছিল। তিনি কতিপয় নাটক ও প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন। তিনি সঙ্গীতচর্চ্চা বিষয়েও যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। এদেশে থিয়েটার সৃষ্টির প্রথম যুগে তিনি অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। এবং ইংরাজী রীতির অনুকরণে একতানবাদন এ দেশে তিনিই প্রথমে প্রবর্ত্তন করেন।

যতীন্দ্রমোহন তাঁহার পিতার বিপুল সম্পত্তি এবং খুল্লতাত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সমস্ত সম্পত্তির উপস্বত্ব নিজ চেষ্টায় অনেক বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, অনেক নূতন জমিদারী খরিদ করিয়াছিলেন। তাঁহার দানেরও সীমা ছিল না; তিনি হিন্দু বিধবাদের সুবিধার জন্য মাতৃনামে এক লক্ষ টাকা দান করেন; এবং মূলাজোড় মন্দিরের সেবাদির জন্য ৮০০০০৲ টাকা মূল্যের সম্পত্তি দান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল্ সোসাইটি, মেয়ো হাঁসপাতালে দান, প্রাসাদে দরিদ্রদের ভোজনের ব্যবস্থা, পিতা ও পিতৃব্যের নামে ছাত্রদিগের বৃত্তির ব্যবস্থা, সেণ্ট বারব্বার প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থাপন প্রভৃতিতে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। তিনি এই সকল সৎকার্য্যের জন্য এবং সরকারের কার্য্যে সহযোগিতার জন্য মহারাজা, সি-এস-আই; কেসি-এস-আই; ও মহারাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। পরিশেষে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে 'মহারাজা' তাঁহার বংশানুক্রমিক উপাধি হয়। তিনি জাষ্টিস্ অব্ দি পিস্, প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, সিণ্ডিকেটের মেম্বর, যাদুঘরের ট্রাষ্টি ও সভাপতি, মেয়ো হাঁসপাতালের গভর্ণর, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভাপতি এবং এসিয়াটিক্ সোসাইটির সদস্য ছিলেন। তিনি বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ্ কাউন্সিল ও বড়লাটের কাউন্সিলেরও সদস্য ছিলেন। তাঁহার 'প্রাসাদ' নামক সুন্দর অট্টালিকা ভিন্ন 'টেগোর কাস্‌ল্' ও দমদমাস্থিত 'এমারেল্ড্ বাওয়ার' নামক উদ্যান-ভবনটীও দেখিবার জিনিষ। এক কথায় যতীন্দ্রমোহন তাঁহার সময় কলিকাতার মধ্যে ধনে মানে ও বিবিধ গুণে একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মভাবও অত্যন্ত প্রবল

ছিল। এবং অন্তরে বাহিরে একজন হিন্দু ছিলেন। তিনি কাশীতে একটি সুন্দর মন্দিরে শিব স্থাপনা করেন।

* * * *

তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী—ইনি হিন্দু কলেজের প্রথম যুগের একজন প্রসিদ্ধ ছাত্র। ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। তিনি একখানি বাঙ্গলা-ইংরাজী অভিধান প্রকাশ করেন এবং ইংরাজী ও বাঙ্গলা অনুবাদ ও টীকা সহ মনুসংহিতার কিয়দংশ প্রকাশ করেন, অর্থাভাবে সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি হিন্দু কলেজের প্রসিদ্ধ ছাত্রগণ প্রতিষ্ঠিত "সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা"র তিনি সভাপতি ছিলেন। তিনি কিছুকাল কুইল্ নামক একখানি ইংরাজী পত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিনি বর্দ্ধমান-রাজের প্রধান সচিব হইয়াছিলেন।

* * * *

প্রসন্নকুমার ঠাকুর—১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গোপীমোহন ঠাকুরের পুত্র ছিলেন। বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রথম তাঁহাকে সেরবোর্ণের স্কুলে পাঠান হয়, তৎপরে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তথায় প্রবিষ্ট হন। তাঁহার অংশের জমিদারীর আয় এক লক্ষ টাকার অধিক হইলেও তিনি সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। এবং ইহাদ্বারা অনেক টাকা উপার্জ্জন করেন। ব্যবসায়ের দিকেও তাঁহার ঝোঁক ছিল এবং নীলের চাষে ও তেলের কলে তিনি বহু টাকা ডোকশান করেন। হিন্দু কলেজ ও মেয়ো হাঁসপাতালের গভর্ণর, কাউন্সিল অব্ এডুকেশনের সদস্য এবং নব প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো রূপে কার্য্য করিয়া তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। গ্রন্থ সংগ্রহেও তাঁহার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল এবং তাঁহার পুস্তকাগার বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থপূর্ণ ও তৎকালের পক্ষে উৎকৃষ্ট গ্রন্থশালা ছিল। তিনি লেজিস্লিটিভ্ কাউন্সিলের

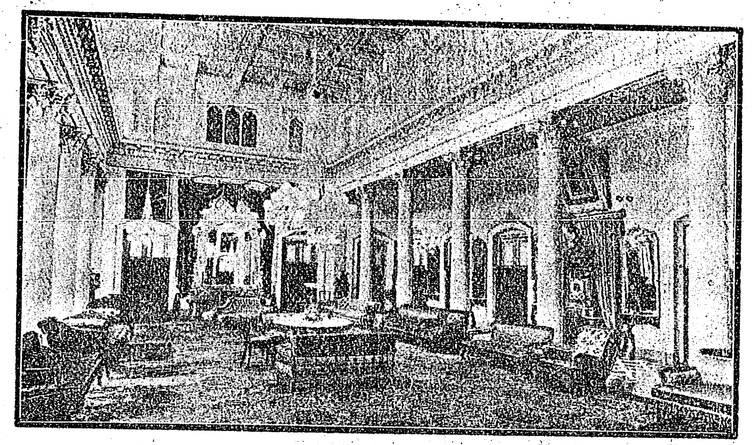

দরবার কক্ষ—প্রাসাদ

সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার অন্যান্য সৎকার্য্যের মধ্যে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠাকুর ল-প্রোফেসরশিপ সৃষ্টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

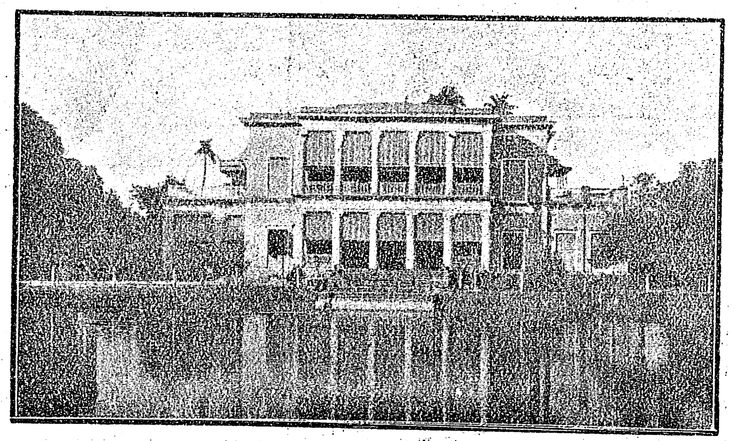

এমারেল্ড বাওয়ার

তাঁহাকে C. S. I. উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। সেনেট

হাউসের প্রবেশ-পথে তাঁহার একটী মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

* * *

খেলাতচন্দ্র ঘোষ—ওয়ারেণ হেষ্টিংসের দেওয়ান পাথুরিয়াঘাটার রামলোচন ঘোষের পৌত্র খেলাতচন্দ্র একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। কেহ কেহ বলেন রামলোচন লেডি হেষ্টিংসের সরকার ছিলেন। রামলোচনের শিবনারায়ণ, দেবনারায়ণ এবং আনন্দনারায়ণ নামে তিন পুত্র ছিলেন। খেলাতচন্দ্র দেবনারায়ণের পুত্র। ইনি দাতা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ও জাষ্টিস্ অব দি পিস্ ছিলেন।

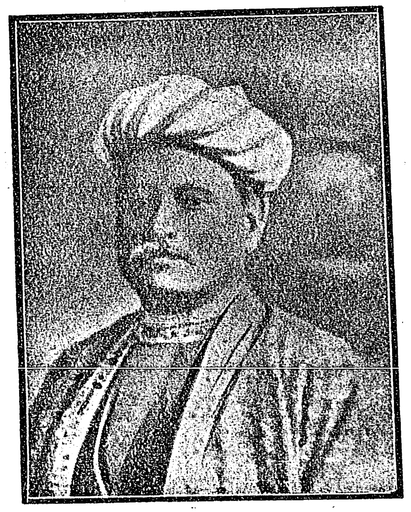

শ্যামাচরণ লাহা

ধর্ম্মতলায় "আনন্দ বাজার" নামে যে বাজার ছিল, উহা পূর্ব্বোক্ত আনন্দনারায়ণের সম্পত্তি ছিল। খেলাৎচন্দ্র সনাতন ধর্ম্ম-রক্ষিণী সভার একজন বিশিষ্ট সভ্য এবং গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। তাঁহার পুত্র রমানাথ ঘোষ মহাশয়ও একজন যশস্বী ব্যক্তি ছিলেন।

* * * *

জয়নারায়ণ মিত্র—সাধারণতঃ ইঁহাকে লোকে জয় মিত্র বলিত। ইঁহার পিতা রামচন্দ্র মিত্র জাহাজের কাপ্তেনদিগের মুচ্ছুদ্দির কাজ করিয়া বহু অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। জয়নারায়ণ ক্রিয়াকলাপ ও পূজাপার্ব্বণে অনেক অর্থ ব্যয় করিতেন এবং সেজন্য তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন। বরাহনগরে গঙ্গাতীরে যে কালী মন্দির ও দ্বাদশ শিব মন্দির দেখিতে পাওয়া যায় উহা তাঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

* * * *

বনমালী সরকার—আত্মারাম সরকার হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বর হইতে কুমারটুলিতে আসিয়া বাস করেন। বনমালী, রাধাকৃষ্ণ ও হরেকৃষ্ণ নামে তাঁহার তিন পুত্র ছিলেন। বনমালী পাটনার কমার্শিয়াল রেসিডেণ্টের দেওয়ান্ এবং কিছুকাল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলিকাতায় ডেপুটি

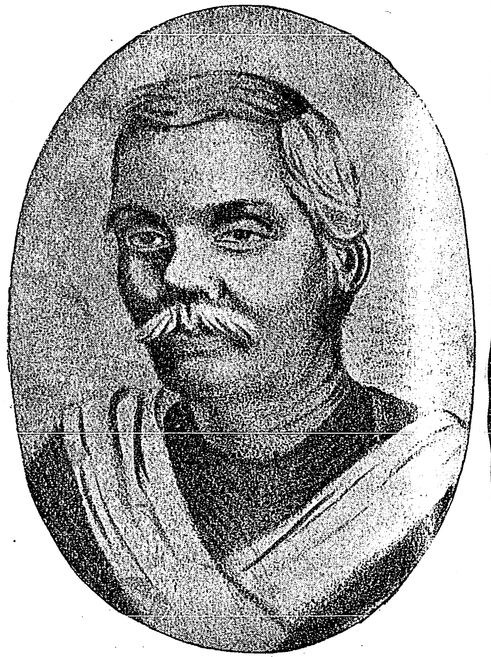

প্যারীচাঁদ মিত্র

ট্রেডার ছিলেন। তিনি ব্যবসায়াদি কার্য্যে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার কুমারটুলির বাড়ী সেকালের কলিকাতার মধ্যে একটী দ্রষ্টব্য বস্তু ছিল। উহা ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা আক্রমণের অনেক পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছিল।

* * * *

দেওয়ান দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়—ইনি সরকারের অধীনে কার্য্য করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

তিনি প্রত্যহ বহু লোককে অন্ন দিতেন। বাগবাজারে গঙ্গাতীরে তিনি একটী স্নানের ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

* * *

দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়—ইনি জাষ্টিশ্ অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ। তাঁহার পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ হিন্দু কলেজের সেক্রেটারি ছিলেন। পাথুরিয়াঘাটায় তাহার নামে একটী পথ আছে। ইঁহাদের আদি নিবাস ছিল হুগলী জেলার ভাঙ্গামোড়া গোপীনাথপুর।

* * * *

মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা—মহারাজা ও তাঁহার ভ্রাতা শ্যামাচরণ ও জয়গোবিন্দ লাহা মহাশয়েদের নাম সমধিক খ্যাত হইলেও রাজীবলোচনের পুত্র প্রাণকৃষ্ণ লাহা মহাশয় হইতেই তাঁহাদের বংশ-গৌরবের আরম্ভ। ইঁহাদের পূর্ব্ববাস ছিল চুঁচুড়ায়। ১৮২২ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে চুঁচুড়াতেই দুর্গাচরণ জন্ম গ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজে শিক্ষা লাভের পর তিনি পিতার সহিত ব্যবসায়-কার্য্যে প্রবিষ্ট হন এবং ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর প্রাণকৃষ্ণ লাহা কোম্পানী নামক ফার্ম্মের সম্পূর্ণ ভার তিনি গ্রহণ করেন। তিনি একজন অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ও জাষ্টিস্ অব্ দি পিস্ হন। তৎপরে তিনি পোর্ট কমিশনের, বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিলের এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য হন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে মেয়ো হাঁসপাতালের গভর্ণর, ১৮৮২ ও ৮৮ খৃষ্টাব্দে দুইবার ইম্পিরিয়েল্ লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের সদস্য এবং কলিকাতার সেরিফ হন। তিনি সি-আই-ই, রাজা এবং পরিশেষে মহারাজা উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁহার বহু দানের মধ্যে প্রেসিডেন্সী কলেজ, হিন্দু স্কুল ও হুগলী কলেজে কতিপয় অবৈতনিক ছাত্রের বৃত্তির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০০০০৲, ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি ও সুবর্ণবণিক দাতব্য সমিতিতে ২৪০০০৲ এবং মেয়ো হাঁসপাতালে ৫০০০৲ টাকা দান উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজ কুমার কৃষ্ণদাস ও হৃষীকেশ লাহা মহাশয়দিগকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

* * * *

শ্যামাচরণ লাহা—১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। হিন্দু কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হন এবং তথায় বৃত্তি পাইয়াছিলেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্যবসায় কার্য্যে উন্নতির জন্য তিনি বিলাত গিয়াছিলেন। তিনি দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলের একজন ডিরেক্টর এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে কোম্পানীর পরামর্শ সভার একজন সভ্য ছিলেন। তিনি অনারারি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্ এবং ২৪ পরগণার অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। তিনি কতিপয় বৎসর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সদস্য ছিলেন। তাঁহার অন্যান্য দানের মধ্যে চক্ষু-চিকিৎসা ভবনের জন্য ৬০০০০৲ টাকা দান

কিশোরীচাঁদ মিত্র

উল্লেখযোগ্য। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার একমাত্র পুত্র বাবু চণ্ডীচরণ লাহা মহাশয়কে রাখিয়া পরলোকপ্রাপ্ত হন।

* * * *

জয়গোবিন্দ লাহা—১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ব্যবসায়-কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। এই কার্য্যে তাঁহার যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখা যাইলেও, তিনি সাধারণের কার্য্যেও বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর তিনি কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল্

কমিশনর ছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার সেরিফ হন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য নির্ব্বাচিত হন, ১৯০১ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল্ লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে সি-আই-ই উপাধি ভূষিত হন। তিনি অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, পোর্ট কমিশনার, জেল পরিদর্শক, মেয়ো হাঁসপাতালের গভর্ণর, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ের পরামর্শ সভার সভ্য, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের সহকারী সভাপতি, বেঙ্গল্ চেম্বার অব কমার্শের সভ্য, বেঙ্গল্ ন্যাশানেল্ চেম্বার অব কমার্শের সভাপতি, সুবর্ণ-

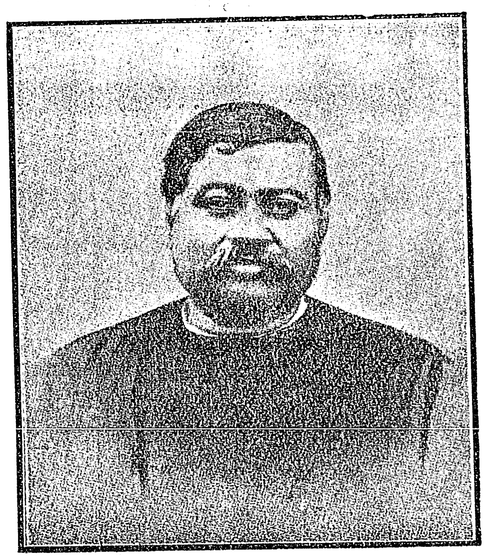

স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র

বণিক দাতব্য সমিতির সভাপতি প্রভৃতির কার্য্য করিয়াছিলেন। বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ ও বন্যাপ্রপীড়িতদের সাহায্যার্থ এক লক্ষ টাকার মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার দান করেন। জুলজিক্যাল গার্ডেনের একটী রসায়নাগার নির্ম্মাণার্থ ১৫০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ লাহা মহাশয়কে রাখিয়া তাঁহার পরলোক-প্রাপ্ত ঘটে।

* * * *

ডাক্তার জগদ্বন্ধু বসু—১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার আদি বাসস্থান ২৪ পরগণার দত্তিরহাট গ্রাম। তিনি তাঁহার সময়ের একজন উচ্চশ্রেণীর চিকিৎসক ছিলেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি এম-ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মেডিক্যাল্ কলেজের সকল পরীক্ষাই তিনি সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন এবং বহু পদক ও পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তিনি প্রথম আকায়াব হাঁসপাতালের ভার গ্রহণ করেন। তৎপরে তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রথম ডিমনষ্ট্রেটার পরে য়্যানাটমির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিনের সভাপতি হন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল্ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাহার সভাপতির কার্য্য করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের মেডিক্যাল কংগ্রেসের তিনি সহঃ সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তিনি চিকিৎসা বিষয়ক বহু উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ সকল লিখিয়াছিলেন। প্রায় দশ বৎসর তিনি মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ছিলেন। তিনি তাঁহার জন্মস্থানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার একমাত্র পুত্র বাবু নগেন্দ্রকুমার বসুকে রাখিয়া মারা যান।

* * * *

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে—বর্দ্ধমানের নিকট পাতাসি গ্রামে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহাঁর জন্ম হয়। জেনারেল্ এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউশনে ডাক্তার ডফের অধীনে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের অধিকার প্রাপ্ত হন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার একটি গির্জ্জার ভার পাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কালনায় ছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের নবধর্ম্ম প্রচারের বিরুদ্ধে Antidote to Brahmoism নামে এবং ইহার পূর্ব্বে বেদান্ত সম্বন্ধে অন্য একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লেখেন। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশ্যে "অরুণোদয়" নামে একখানি পত্র তিনি দুই বৎসরের জন্য প্রকাশ করেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে Indian Reformer এবং পরে Fr.day Review নামে দুইখানি কাগজ দক্ষতার সহিত তিনি পরিচালন করেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রচারকের কার্য্য ত্যাগ করিয়া তিনি শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করেন এবং ৬৩ বৎসর বয়সে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার মাসিক বেতন ছিল এক সহস্র টাকা। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে "গোবিন্দ সামন্ত" নামক ইংরাজি গ্রন্থখানি সর্ব্বজনপ্রশংসিত।

* * * *

রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ—ইনি এবং ইঁহার ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বংশধর শ্রীনারায়ণ সিংহের পোষ্যপুত্র ছিলেন। প্রতাপচন্দ্র প্রথম হইতেই বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের একজন সদস্য ও সহকারী সভাপতি ছিলেন। মেডিক্যাল্ কলেজে ও অন্যান্য স্থানে দানের জন্য তাঁহারা উভয়েই রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। হিন্দু বিধবা বিবাহ ভাণ্ডারে তাঁহারা ২৫০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের বাসস্থান কান্দিতে একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহযোগিতায় তাঁহারা বেলগেছিয়াতে একটী নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তদানীন্তন সকল জনহিতকর কার্য্যের সহিত তাঁহারা সংযুক্ত ছিলেন। প্রতাপচন্দ্র পরে C. S. I: উপাধিভূষিত হইয়াছিলেন। তিনি ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এবং তাঁহার সহোদর ছয় বৎসর পরে কালগ্রাসে পতিত হন। প্রতাপচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র সিরীশচন্দ্র ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি মৃত্যুকালে উইল দ্বারা কান্দিতে একটি হাঁসপাতাল স্থাপন জন্য ১১৫০০০৲ টাকা দান করিয়া যান।

* * * *

প্যারীচাঁদ মিত্র—১৮১৪ খৃষ্টাব্দে প্যারীচাঁদের জন্ম হয়। তাঁহার সময়ে তিনি ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন বিশেষ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হিন্দু কলেজের একজন ছাত্র ছিলেন এবং খ্যাতনামা অধ্যাপক ডিরোজিওর প্রভাব তাঁহার চরিত্রে বিশেষ ভাবে ফুটিয়াছিল। তিনি ব্রিটিশ্ ইণ্ডিয়া সোসাইটি এবং বেথুন্ সোসাইটির প্রথম সম্পাদক ছিলেন। স্কুল বুক্ সোসাইটি, এগ্রিহর্টিকালচার সোসাইটি, ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটেবল্ সোসাইটি প্রভৃতি বহু সভা সমিতির সভ্য ছিলেন, এবং সে সকলের উন্নতিকল্পে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সদস্য, কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য এবং বেঙ্গল লেজিসলেটিভ্ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। কলিকাতায় থিয়জফিক্যাল্ সোসাইটির তিনি প্রতিষ্ঠাতা। বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষায় তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনিই বাঙ্গলার প্রথম উপন্যাস "আলালের ঘরের দুলাল" লিখিয়াছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক প্রাপ্ত হন।

* * * *

কিশোরীচাঁদ মিত্র—ইনি প্যারীচাঁদ মিত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন; ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। হেয়ার

জাল প্রতাপচাঁদ

ও হিন্দু স্কুলে শিক্ষা প্রাপ্ত হন, ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। তিনি কিছু দিন ডাফ্ স্কুলে অবৈতনিক শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছিলেন। তৎপরে লিগ্যাল রিমেমব্রান্সারে অফিসে কার্য্য করেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে এসিয়াটিক্ সোসাইটির সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। বেঙ্গল স্পেক্টেটর, বেঙ্গল হরকারু এবং কলিকাতা রিভিউ পত্রিকায় তিনি বহু উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ সকল লিখিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য ভাষায় তাঁহার জ্ঞান যথেষ্ট ছিল। তিনি কয়েক বৎসর

ইণ্ডিয়ান্ ফিল্ড্ নামক সংবাদপত্রখানি দক্ষতার সহিত পরিচালনা করেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের সহিত সংযুক্ত হন এবং শীঘ্র তথাকার সদস্য হন। হ্যালিডে সাহেব তাঁহাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন, তাঁহারই চেষ্টায় তিনি প্রথম ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পরে জুনিয়ার ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতার ন্যায় একজন সমাজ সংস্কারক ছিলেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

* * * *

স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র—১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে, ২৪ পরগণায় জন্ম গ্রহণ করেন, পিতার নাম রামচন্দ্র মিত্র। হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তিনি সদর দেওয়ানী আদালতে উকিল রূপে প্রবেশ করিয়া মাননীয় দ্বারকানাথ মিত্রের মৃত্যুর পর হাইকোর্টের জজ হন এবং পরে স্যার রিচার্ড গার্থের অনুপস্থিতি কালে প্রধান বিচারপতি হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও লাটসাহেবের কাউন্সিলের সদস্য হইয়াছিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তৎপরে নাইট্ উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

প্রাণের অর্ঘ্য

শ্রীকেশবনাথ রায় চৌধুরী

বন্ধুর সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে। ওর ভাগ্যে একটা ঘূর্ণি আছে, যা ওকে কখনো স্থির থাকতে দেয় না। বিয়ে হবামাত্র ছুটল মোটর করে ঘুরতে; বললে শেষে সিমলে কি দারজিলিং কি কাশ্মীর গিয়ে উঠব। এ আমি গত এপ্রিলের কথা বলছি—তখনো সেখানকার হাওয়া এ-রকম গরম হয় নি,—মানুষ ও প্রকৃতি দুই-ই ছিল সুস্থ ও সুন্দর।

ঠিক হলো কাশ্মীরই যাওয়া যাক্। বন্ধু আমার চেয়ে বড়, আর তিন-চার বছরের সিনিয়ার ছিলেন কলেজে। তাই তাঁর নামের সঙ্গে একটা 'দা' জুড়ে দিয়েছি—অমিয়দা। প্রাণে তার দেদার স্ফূর্ত্তি; সে যেন হাওয়ায় উড়ছে। আমার সঙ্গে তাই ভারী মিল হ'য়ে গেছে বয়সের বাধা ভেঙ্গে!

একটা মোটরে রইল অমিয়দা আর একটায় আমরা। অবশ্য অমিয়দার সঙ্গে যে তার নবীনা সুন্দরী বধূ রইল, সেটা না বললেও চলে।

আপনারা ভুলবেন না যে অমিয়দা বিংশ-শতাব্দীর টাটকা সভ্য। এ যাওয়াটা 'হনিমুন' উদ্দেশ্যে যাওয়া। অতএব এটা যথাসম্ভব সুমধুর করবার জন্যে আমাদের সঙ্গে নিলে—রাম-সীতা যেমন লক্ষ্মণকে নিয়েছিলেন! আমরা চার পাঁচজন ছিলুম। হাসি ঠাট্টায় পথ সরগরম করতে করতে এগিয়ে চলি। বললুম 'অমিয়দা একটা example রেখেছ; বাঙ্গালীর কি বিয়ে হয়···'হনিমুন'ই নেই ত বিয়ে। অমিয়দা একটা কাজ করেছে বটে।' আপনারা নিশ্চয় চমকে উঠে বলবেন—বাঙ্গালী যে এতটা সভ্য হ'য়ে উঠেছে যে 'হনিমুন' করতে কাশ্মীরে ছুটল মোটর করে, তা' ত শুনি নি। শুনবেন কি করে মশাই, মেয়ের বাপের পয়সায় যেখানে বিবাহ-উৎসব কুলিয়ে নিতে আপনারা ব্যস্ত সেখানে এ-রকম কি করে ভাববেন। যাক্, জানুন যে বিংশ-শতাব্দী তার সাত-রঙা ইন্দ্রধনু নিয়ে আমাদের মনে অহরহ বেড়িয়ে বেড়ায়। আমরা বাধা-বিঘ্ন আচার-ব্যবহার কিছুই মানি না। মেয়েরা শুনে বলবেন যে 'ওমা কি লজ্জা! কি লজ্জা! ছোঁড়াটা কি গো; নতুন বিয়ের বৌকে নিয়ে ছুটল কিনা বিদেশে···ছিঃ···!' আমি তাঁদের বলব, আপনারা আরো সুন্দরী হোন, আরো সভ্যা হোন!

আমি এখানে 'মোটরে কাশ্মীর যাত্রার' বিবরণ দিতে বসি নি। সে কাজ বহুৎ দিন আগে 'সৌরিনবাবু' শেষ করে দিয়েছেন। আমি শুধু একটী অনিন্দ্যসুন্দর কাহিনী বলব। তার কারণ আমার ভাগ্যে কাশ্মীর দেখা হোল না। ওরা সবাই চলে গেল, আমি মাঝ পথে আলাদা হ'য়ে গেলুম। কিন্তু আমার কাশ্মীর দেখার চেয়ে বড় লাভ হ'য়েছে। কাশ্মীর দেখার সুযোগ অনেক পাব, না হয় আমার 'হনিমুন' করতে ঐখানেই যাব; কিন্তু এ যা মিলল, এ' ত সর্ব্বদা মেলে না। তাই আমার ভাগ্যকে ধন্যবাদ দি, আমার খাম-খেয়ালী প্রকৃতিকে দিই ধন্যবাদ সমস্ত প্রাণ ঢেলে।

সে সময়টা ছিল অসহ্য গরম। আমরা আবার রাজপুতানা ঘুরে যাচ্ছিলুম; সেইজন্যে গরমটা একান্তই অসহ্য হ'য়ে উঠেছিলো।

উদয়পুরে এক বন্ধুর বাড়ী সেই দিনটা সবাই থামলুম। রাত্রিতে মোলায়েম জ্যোৎস্নায় সমস্ত সহর উপচে পড়েছিলো—মনে জেগে উঠল কত অতীত কালের কথা···সেই প্রতাপ-সিংহ···সেই পদ্মিনী কত···কি! আজ এ সহর দেখে··· এর নিঝুম নিস্তব্ধ শান্তি দেখে মনে হোল যে হঠাৎ এই জায়গার তলায় একদিন বিসুভিয়স এসেছিল ভুল করে··· মহা হুঙ্কারে জায়গাটা কেঁপে উঠেছিল তেজে বীর্য্যে শৌর্য্যে। তার পর কোথায় কি! যেন উদয়পুর একদিন স্বপ্ন দেখেছিল যে, সেও স্বাধীন ছিল। যেন সে দুর্ভাগ্যের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে সে সুস্বপ্নকেও বিশ্বাস করতে পারছে না। মনে করছে 'ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা' এরও তাই হ'য়েছে···ভুল—ভুল ও-সব কথা শুধুই কবির কল্পনা। আজকের অবস্থা দেখে মনেও হয় না এর অতীত ছিল গৌরবময়!

ছাদে শুয়ে এই রকমই ভাবছি আর দেখছি, এমন সময় পাশের বাড়ীতে নারী-কণ্ঠে সুমধুর স্তব একটী ভেসে এল। চমকে উঠলুম—ও কে গায়? ও যে আমাদের প্রাণের ভাষা বাঙ্গালা···ও গান যে আমাদের বুকের রক্ত!

"নমোনমো নমঃ, সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি!
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগন-ললাট, চুমে তব পদধূলি,
ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি।
পল্লবঘন আম্রকানন রাখালের খেলাগেহ
স্তব্ধ অতল দীঘি-কালোজল, নিশীথ-শীতল স্নেহ
বুক-ভরা মধু বঙ্গের বধূ জল ল'য়ে যায় ঘরে,
মা বলিতে প্রাণ করে আন্‌চান্, চোখে আসে জল ভ'রে।"

সমস্ত হৃদয় আমার আনন্দে থৈ থৈ করে উঠল। মনে হোল সমস্ত রাজপুতানায় যেন মরুভূমিই আছে; আর তার মধ্যে এইটা যেন শীতল কালো দীঘি! প্রাণ ছুটে গেল বাঙ্গলার সেই সবুজ লতা-পাতার মাঝখানে···গঙ্গার তীরে তীরে ঘন লতা-পাতার কুঞ্জে-কুঞ্জে। মনে হোল, কে এই নিশীথে স্মরণ করলে তার দূরে-ফেলে-আসা মাকে!

থাকতে পারলুম না; উঠে শুনতে লাগলুম সেই মধুর গানখানি! ভোরের আলোয় চোখ যখন বিশ্বের সৌন্দর্য্যের পরিচয় নিচ্ছিল, তখনও মনে কেঁপে কেঁপে উঠছিল সেই সুর।

কিছু পরে সেই বাড়ীতে গিয়ে দাসীকে দিয়ে আমার কার্ডটী পাঠিয়ে দিতেই এক সুন্দরী তরুণী তাড়াতাড়ি এসে হাসতে হাসতে বললেন "আসুন, আসুন!"

যাক্, খুনী হলুম। ভয় হচ্ছিল ইনি যদি পর্দ্দানশীন হন ত ভারী আমায় অপ্রতিভ হ'তে হ'বে। কিন্তু তা নয়—ইনি বেশ সপ্রতিভ।

এখানকার কোন্ স্কুলে শিক্ষয়িত্রী তিনি; রঙটী, মুখখানি শিশির-ধোওয়া গোলাপের মতন!

দু'হাতে নমস্কার করে বললেন "আপনি যে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন এতে কি যে সুখী হয়েছি বলবার নয়!"

আমি বললুম "থাকতে পারলুম না; আমাদের বাংলা মায়ের সাড়া আপনার অন্তর থেকে এমন সুরে পেলুম যে, মনে হোল এঁকে আমার শ্রদ্ধা জানানো নিতান্তই দরকার!"

মধুর হেসে তিনি বললেন "বাঙ্গালী উদয়পুরে অনেকেই আসে; দূর থেকে তাদের দেখি আর মনে মনে বলি ওরা আমার ভাই। আপনার মতন তারা ত মানুষকে আপন করতে জানে না। আপনাকে আমার ভাই বলতে বড়ই ইচ্ছে করছে; ছোট ভাইটীর মতন আপনি সরল সুন্দর!"

তাঁকে প্রণাম করে বললুম "দিদি, এ দান যদি আপনি দেন সে ত মাথায় পেতে নোব!"

তিনি বললেন "আমার ভাই নেই; আপনি হোন ভাই আমার। কিছুদিন থেকে আমি এইখানেই রয়েছি—বাঙ্গলার আলো, গান, হাসি মনের মধ্যে গুপ্ত রত্নর মতন জ'মে গেছে। অবসর সময়ে তাই নিয়ে নাড়াচাড়া করি, কত যে আনন্দ পাই কি বলব। মনে হয় যেন সেখানে আবার ফিরে গেছি; তাদের প্রতি উৎসবে

মেয়েরা যেন আমায় আমন্ত্রণ-লিপি পাঠায়; আমি যাই আবার ফিরে আসি। এমনি সব স্বপ্ন গাঁথি!"

আমি বললুম "আপনি একলা এখানে থাকেন কেন দিদি? বাংলায় যানই বা না কেন ছুটীতে ছুটীতে?"

তিনি হেসে বললেন "থাকতে হয় চাকরী করি বলে, আরো একটা কারণে—হ্যাঁ—আপনি কদিন থাকবেন এখানে?"

আমি বললুম "কালই বোধ হয় যাব।"

"কালই?—" বলেই তিনি তাড়াতাড়ি উঠে বললেন "কাল আসবেন একবার সকালবেলা—আসবেন?"

রাজী হ'য়ে চলে এলুম। তাঁর ব্যবহার যেমনি ভাল লেগেছিল, তেমনি লেগেছিল আশ্চর্য্য! এত সুন্দর স্বাধীন চালচলন খুব কম দেখেছি! মনে মনে শ্রদ্ধা এল তাঁর প্রতি!

পরের দিন আসতেই তিনি হাসিয়া অভ্যর্থনা করলেন। বললেন "ভাইটী আমার এসেছে তবে; ভাবলুম বুঝি আসবে না!"

আমি কৃত্রিম রাগে বললুম "বেশ দিদি, আমার সম্বন্ধে এ রকম ভাবলেন—তবে আর আসব না।"

তিনি আমার হাত ধরে বললেন "না আসবে এসো না; কিন্তু যখন এসেছ তখন চল।"

আমি বললুম "না যাব না, যাই; ধরুন আমি আসি নি!"

তিনি হেসে বললেন, "ওমা, সে কি, আজ যে Special ভাই-দ্বিতীয়া আমার; নতুন-পাওয়া সবেমাত্র ভাইটীকে কি ছেড়ে দোব আজ বোনের অক্ষয় আশীর্ব্বাদ না দিয়ে!"

যেতে হোল! এই দূর প্রবাসে এক বোন তাঁর আশীর্ব্বাদ, ভালবাসা ঢেলে দিলেন আমার উপর। কি সুন্দর এই প্রথাটী! যে ভাই-বোন ছেলেবেলা থেকে এক সঙ্গে বড় হ'য়ে বড়বেলায় ছাড়াছাড়ি হ'য়ে দূরে চলে যায়, বৎসরে এই একবার তাদের ভেতর স্নেহের স্নিগ্ধ রূপ জাগাবার কেমন চমৎকার প্রথা! এ আমার বরাবরই ভাল লাগে। বোন যেন তার ভাইকে অক্ষয় করে বাঁচিয়ে রাখে তার এই দিনটীর আশীর্ব্বাদে!

আমি বললুম "কিন্তু দিদি, বলতে হ'বে তোমায়, কেন তুমি এখানে থাক!"

তিনি বললেন "সবটা বলা যাবে না; একটুখানি শোন। কলেজে যখন পড়ি তখন একটী ছেলের সঙ্গে আমার ভালবাসা হয়। সে পড়ত এম-এ—থাকত আমাদের বাড়ীর পাশেই। আমরা মা ও মেয়ে তাদের বাড়ীর কাছেই ভাড়া থাকতুম! প্রথম প্রথম দেখাশোনা হোত রোজ। তার পর পরিচয় হয়। তার পর তার সঙ্গে কলকাতায় কত জায়গা বেড়াতুম! কারণ আমি হোষ্টেলে থাকতুম। ছুটীতে বাড়ী গেলে তারে যেন চিনি না এমনি ভাব দেখাতুম। সেও তাই দেখাত! কারণ ওর বাড়ীর লোকেরা বড় শক্ত লোক ছিলেন। আমার সঙ্গে বিয়ে কখনোই দিতেন না, কারণ আমরা ব্রাহ্ম। তাই মতলব করলুম যে আমরা কোথাও চলে যাব। দু'জনে রোজগার করব, আমাদের বেশ চলে যাবে। আমার এক আত্মীয় উদয়পুরে ছিলেন। তাঁর দ্বারা ঐ চাকরীটা ঠিক করে চলে এলুম। তার পর তার আসবার আশায় আশায় বসে আছি···ঠিকানা দিয়েছি···আজ দুই বছর হ'য়ে গেল। কোন ছুটীতেই এখান ছেড়ে যাই না, যদি সে এসে আমায় দেখতে না পেয়ে চলে যায়। এমনি করেই দিন কেটে যায়···সবুজ বাংলা থেকে ক্রমশঃই দূরে স'রে যাচ্ছি! বোধ হয় তার বাড়ীতে জানতে পেরেছে তাই·····" তিনি ধীরে ধীরে থেমে গেলেন।

মনে হোল তাঁর অন্তর প্রিয়তমের সন্ধানে ভুবনে ভুবনে ছোটাছুটী করছে···মনে করছে বুঝি এই আসে···ঐ আসে? এ কি! এ কত বড় প্রেমের তপস্যা! কি মহিয়সী এই নারী?

বললুম "কোথা বাড়ী তার বলবেন কি? নাম কি? যদি আমার জানাশোনা থাকে!"

সুন্দর চোখ দুটীর কাণায় কাণায় যে জল জমিয়াছিল আঁচলে তা' মুছে তিনি বললেন "কি করবে ভাই সে সব শুনে? আমি আর চাই না···এখন তাকে চাওয়ার চেয়ে পাওয়ার চেয়ে বেশী করে পেয়েছি। তার অশরীরী সবটুকু এত বেশী করে ক্ষণে ক্ষণে আমার অন্তরের সঙ্গে মিশে গেছে যে তাকে পেলে এখন আর সইতে পারবো না। পাওয়া-হারানোর বাইরে যে পাওয়া সেইটেই পেয়ে গেছি যেমন সাধকরা অদেখা ভগবানকে অন্তরাত্মা ভ'রে পায় তাঁর দেহকে না পেয়েও!"

আমার মন আরো সম্ভ্রমে ভরে গেল! প্রেম কাকে বলে তা বাইরে পড়েছি···মিরাণ্ডা ফার্দিনান্দের ভালবাসা মনে জ্বলজ্বল করছে, শকুন্তলার প্রেমও পড়েছি···আরো কত কি প্রেম দেখেছি। কিন্তু জীবনে তারা সত্য কি না সে ত টের পাই নি; কিম্বা প্রিয়া-হীন বলে ল্যাম্বের মতন 'ব্যাচিলারের কমপ্লেণ্ট' লিখতেও সুরু করি নি। কারণ ল্যাম্বের আশা ছিল না—আমার যে অফুরন্ত জীবন পড়ে···মায়াবী প্রিয়া তার আঁচল উড়িয়ে হাতছানি কখনো না কখনো দেবেই। সেই জন্যে তত মাথা ঘামাই না।

কিন্তু আজ মনে হোল সব সত্য, সত্য! সেকস্‌পিয়ার, কালিদাস মিথ্যে রাতের তারায় তারায় দীপ জ্বালে নি··· জাগিয়ে রেখেছে মানব-মনের নিরুপম চিরন্তন সত্য! এ কথা মনে হয়ে হৃদয় ভরে উঠল!

বললুম "দিদি, তার নাম জানতে বড্ড ইচ্ছে করছে!"

তিনি বললেন। নাম শুনে চমকে গেলুম। কোন্ জায়গায় সে থাকে জানতে চাইলুম। বললেন।

নাঃ—আর ভুল ত নেই। ছিঃ ছিঃ! মানুষের অন্তরের মধ্যে কি দানবের রাজত্ব!

উঠে পড়লুম। বলুম "যাই দিদি, ভুলবেন না আমায়, চললুম!"

তিনি বললেন "আমি ভুলব? বরঞ্চ তুমি না ভুলে যাও ভাই।"

বাড়ীতে এসেই আমাদের দলবলকে বললুম "আজই তোমরা চলে যাও; আমি যাব না—বাড়ী ফিরছি!"

তারা অবাক্ হোল! বন্ধু বগলে "যা—যা, আর ইয়ারকি করিস নি।"

আমি বললুম 'না—সত্যি যাব না, তোমরা যাও।'

তারা চলে গেল। আমি ফিরে এলুম। উদয়পুরে কখনো আর যাই নি।

কেমন করে তাঁকে বলব যে আজ তাঁর অন্তরের প্রিয়তম 'হনিমুন ট্রিপ' করতে সপ্রিয়া মোটরে বেরিয়েছেন। কেমন করে বলব তিনি তাঁর পাশের বাড়ীতেই রয়েছেন। কি করেই বা জানাই তাঁর এত বড় সাধনা সব ব্যর্থ···প্রিয় তাঁর কোনদিন আসবে না। নারী যখন তাঁর অন্তরের অর্ঘ্য দিয়ে তাঁর পূজা সমাপন করছেন, পুরুষ তখন আনন্দে উৎসবে ব্যাকুল!

তিনি বারবার চিঠি লেখেন, যেতে বলেন, যাই না, কখনো যাব না তাঁর কাছে!

কিন্তু চিঠি ঠিক আসে; বৎসরে কতবার কত উপহার আসে, অনুযোগ আসে, স্নেহ আসে, নিমন্ত্রণ আসে, তবু যাই না।

ডাক্তার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

একজন আই-সি-এস সিবিলিয়ান, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী কৃতজ্ঞতার নিদর্শন * স্বরূপ ইংরেজী ভাষায় যাঁহার প্রায় পাঁচ শত পৃষ্ঠার একখানি সুবৃহৎ জীবন-চরিত রচনা করিয়াছিলেন, তিনি যে একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন আদর্শ পুরুষ ছিলেন তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। যে বঙ্গদেশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার মতন সন্তানকে বক্ষে ধারণ করিয়া সেই বঙ্গদেশ নিশ্চয়ই গৌরবান্বিতা হইয়াছেন, এবং আজ তাঁহার স্মৃতি-তর্পণের সুযোগ পাইয়া আমরাও ধন্য বোধ করিতেছি।

রাজা আদিশূরের আমন্ত্রণে যে পঞ্চ বেদজ্ঞ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করেন, ডাক্তার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহাদিগের অন্যতম শ্রীহর্ষ হইতে ৩৪শ পুরুষ পরবর্ত্তী সন্তান। এই শ্রীহর্ষ "নৈষধ-চরিতে"র রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। বংশানুক্রমের

* 'Gratitude was amongst the motives which led me to undertake the biography of my distinguished Bengali friend; for he gave me sympathy and kindness at a time when I stood in need of both."—Dedication to "AN INDIAN JOURNALIST." *by F. H. Skrine.*

প্রভাব যে কত, শম্ভুচন্দ্রে তাহা উজ্জ্বল ভাবে প্রকট হইয়াছিল।

শম্ভুচন্দ্রের পিতার নাম মথুরমোহন মুখোপাধ্যায়। তিনি কলিকাতায় ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিলেন। শম্ভুচন্দ্রের মাতামহ রাজচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিৎপুরে একখানি জ্বালানি কাঠ ও খোল-ভুষির দোকান ছিল। মথুরমোহন বরাহনগরে বাস করিতেন, এবং প্রত্যহ কলিকাতায় আসিয়া দোকান করিতেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে বরাহনগরে শম্ভুচন্দ্রের জন্ম হয়।

বহু প্রতিভাবান ব্যক্তির ন্যায় শম্ভুচন্দ্রও বাল্যকালে অত্যন্ত দুরন্ত এবং পাঠে অমনোযোগী ছিলেন। প্রথমে তাঁহাকে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পড়িতে পাঠানো হয়, কিন্তু সেখানে কোন সুবিধা হয় নাই। সে সময়ে বরাহনগরে একটি মিশনারী স্কুল ছিল। সেই স্কুলের ছাত্রদের ক্রিকেট খেলিতে দেখিয়া শম্ভুচন্দ্র তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি সেই স্কুলে পড়িতে চাহিলে তাঁহার নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পিতা তাঁহার ম্লেচ্ছ বিদ্যা শিক্ষায় ঘোর আপত্তি করেন; কিন্তু তাঁহার জননী তাঁহার পক্ষ সমর্থন করেন। ফলে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বহু বাদানুবাদের পর শম্ভুচন্দ্র সেই মিশনারী স্কুলে পড়িবার অনুমতি পাইলেন (১৮৪৮)। কিন্তু মথুরমোহন শীঘ্রই সংবাদ পাইলেন যে, সেই স্কুলের চারিটি ব্রাহ্মণ ছাত্র খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। অত্যন্ত আতঙ্কিত হইয়া মথুরমোহন অবিলম্বে পুত্রকে সেই স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইয়া কলিকাতা গরাণহাটার ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে আনিয়া ভর্ত্তি করিয়া দিয়া গেলেন। ইহাতে শম্ভুচন্দ্রের পড়াশুনার খুব সুবিধা হইল বটে, কিন্তু অন্য দিকে বিশেষ অসুবিধা ঘটিতে লাগিল। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ মথুরমোহন তাঁহার নিত্যনৈমিত্তিক পূজা-আহ্নিক সারিয়া একমাত্র সন্তান শিশু পুত্রকে নিজে সঙ্গে করিয়া আনিয়া প্রত্যহ স্কুলে পৌঁছাইয়া দিয়া দোকানে চলিয়া যাইতেন; এবং স্কুলের ছুটি হইবার বহুক্ষণ পরে গৃহে ফিরিবার সময় তাঁহাকে লইতে আসিতেন। এই সময়টা শম্ভুচন্দ্র বাগবাজারের ঘোষ-পরিবারের বাড়ীতে পিতার জন্য অপেক্ষা করিতেন। এই বাড়ীর ছেলেরা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতেন, এবং উচ্চাঙ্গের ইংরেজী সাহিত্য লইয়া আলোচনা করিতেন। শম্ভুচন্দ্র প্রথমে ভয়ে ভয়ে কুণ্ঠিত ভাবে তাঁহাদের কাছে থাকিতেন, কিন্তু আলোচনায় যোগ দিতেন না। ক্রমে তাঁহার সাহস যেমন বাড়িতে লাগিল, জ্ঞানার্জ্জনের স্পৃহাও তদ্রূপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বয়স্ক বালকদিগের উচ্চাঙ্গের সাহিত্যালোচনায় যোগ দিবার জন্য তিনি মহা উৎসাহে ইংরেজী পড়িতে লাগিলেন। ইংরেজী শিক্ষার প্রতি তাঁহার পিতার পূর্ব্বের বিতৃষ্ণা এখন আর ছিল না। তাঁহার অনুমতি লইয়া শম্ভুচন্দ্র Calcutta Public Libraryতে যোগদান করিলেন। কিন্তু তখনও তিনি দুগ্ধপোষ্য বালক মাত্র—এই পাঠাগারের পরিণত-বয়স্ক পাঠকদিগের নিকটে বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতে তাঁহার লজ্জাবোধ হইত। এই সময়ে তাঁহার স্কুলে যাতায়াতের জন্য তাঁহার পিতা টাট্টু ঘোড়ায় বাহিত একখানি ছোট্ট গাড়ী কিনিয়া দিয়াছিলেন, শম্ভুচন্দ্র লজ্জাবশতঃ বই লইয়া গিয়া গাড়ীতে বসিয়া বসিয়া পড়িতেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে শম্ভুচন্দ্র পূর্ব্বের স্কুল ত্যাগ করিয়া এই বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এই সময়ে কৃষ্ণদাস পাল এবং ওয়েলিংটন স্কোয়ার দত্ত-পরিবারের রমেশচন্দ্র ও সুরেশচন্দ্রের সহিত শম্ভুচন্দ্রের বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়।

হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে পড়িবার কালে শম্ভুচন্দ্র সংবাদপত্রের সেবায় নিযুক্ত হন এবং কৃষ্ণদাস পালের সহযোগে Calcutta Monthly Magazine প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু পত্রখানি শীঘ্রই বন্ধ হইয়া যায়। ইহার পর তিনি Morning Chronicle নামক একখানি দৈনিক পত্রের সম্পাদক হন। কিন্তু পত্রখানির ইংরেজ অধিকারী মিঃ লাভের রাজনীতিক মতের সহিত সম্পাদকের রাজনীতিক মতের সামঞ্জস্য না হওয়ায় শম্ভুচন্দ্র ইহার সম্পাদকতা পরিত্যাগ করেন, এবং Hindu Intelligencer পত্রে প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। এই সময়ে শম্ভুচন্দ্র উদ্বাহ-সূত্রে আবদ্ধ হন। বিবাহের অব্যবহিত পরে শম্ভুচন্দ্রের বন্ধু সুরেশচন্দ্র দত্ত Hindu Patriot সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। শম্ভুচন্দ্রের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় হরিশ্চন্দ্র মুগ্ধ হন, এবং উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। এই বন্ধুত্ব তাঁহাদের আজীবনকাল অটুট ছিল। হরিশ্চন্দ্রের প্রভাব শম্ভুচন্দ্রের উপর এমন কার্য্যকর হইয়াছিল যে, শম্ভুচন্দ্র

রাজনীতির চর্চ্চায় সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিলেন, এবং সিপাহী-বিদ্রোহের গুপ্ত ইতিহাস অবলম্বন করিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহ উপলক্ষে লর্ড ক্যানিংএর আমলে মুদ্রাযন্ত্র-বিধান প্রণীত হইয়া সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করিয়াছিল; তাহাতে রাজনীতির আলোচনা করিবার উপায় ছিল না। এই কারণে শম্ভুচন্দ্রের পুস্তিকাখানি এ দেশে প্রকাশিত হইতে পারিল না—"হোমে" (বিলাতে) প্রকাশিত হইল। প্রকাশক হইলেন মিঃ ম্যালকম লিউইন (১৮৫৭)। ইনি ছিলেন মান্দ্রাজ সদর কোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ। খৃষ্টানদিগের সহিত হিন্দুদিগের মামলায় হিন্দুদিগের প্রতি অবিচার হয়, এইরূপ আন্দোলন উত্থিত হওয়ায় মিঃ ম্যালকম লিউইন তথাকথিত অবিচারের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার জজিয়তি খসিয়া গিয়াছিল। তৎকর্ত্তৃক বিলাতে শম্ভুচন্দ্রের পুস্তিকা প্রকাশিত হইলে সেখানে একটা সাড়া পড়িয়া যায়। বইখানির রচনা এমন যুক্তিপূর্ণ, ভাষা এমন সুন্দর হইয়াছিল যে অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে ইহা কোন ইংরেজের রচনা। ইহার পর শম্ভুচন্দ্র হরিশ্চন্দ্রের অনুরোধে হিন্দু পেট্রিয়টের লেখকের পদ গ্রহণ করেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে শম্ভুচন্দ্র তাঁহার বন্ধু রাজেন্দ্র ও রমেশচন্দ্র দত্তের সহিত নব-প্রবর্ত্তিত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-পদ্ধতির চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বসিবার ঘরটি পরীক্ষাগারে পরিণত করিয়া তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-শাস্ত্র ও ঔষধ লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং পরীক্ষার ফল আমেরিকার চিকাগো ও ফিলাডেলফিয়া নগরের বড় বড় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণকে লিখিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। তাঁহার গবেষণার পুরস্কার-স্বরূপ আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে এম-ডি উপাধি প্রদান করিলেন। এই উপাধিলাভের প্রসঙ্গে শম্ভুচন্দ্রের জীবনী-কার লিখিয়াছেন—"He (শম্ভুচন্দ্র) never sought a degree from his own *Alma Mater*; and it is not to the credit of that body that one of her greatest sons should never have been vouchsafed an honorary one." অর্থাৎ, শম্ভুচন্দ্র নিজ মাতৃভূমির বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কখনও কোন উপাধির প্রার্থী হন নাই। তাই বলিয়া, দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্তানগণের অন্যতমকে একটা অনারারী উপাধিও না দেওয়া দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে গৌরবের কথা নহে।

দুই বৎসর হিন্দু পেটরিয়টের সেবা করিবার পর শম্ভুচন্দ্রের খেয়াল হইল তিনি এটর্ণী হইবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি মেসার্স এলান, জজ এণ্ড লিজ্যাম নামক এটর্ণী কোম্পানীর অ্যাপিসে আর্টিকেল ক্লার্ক হইলেন। কিন্তু এটর্ণি গিরি পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার মাতৃ-বিয়োগ হওয়ায় তিনি পরীক্ষা দিলেন না। তখন হরিশ্চন্দ্র তাঁহাকে দ্বিতীয়বার আহ্বান করিয়া হিন্দু-পেটরিয়টের সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করিলেন। পরবর্ত্তী তিন বৎসর শম্ভুচন্দ্রই হিন্দু পেটরিয়ট সম্পাদন করিয়াছিলেন বলা চলে; কারণ, হরিশ্চন্দ্র এই সময়ে অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই রোগেই ৩৯ বৎসর বয়সে হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু হয়। উপকারী বন্ধুর মৃত্যুর পর শম্ভুচন্দ্র তাঁহার জীবনচরিত রচনা করেন। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় হিন্দু পেটরিয়ট ক্রয় করিয়া লন, এবং শম্ভুচন্দ্র হিন্দু পেটরিয়টের সংস্রব ত্যাগ করিয়া স্বর্গীয় দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে অযোধ্যার তালুকদার-সভার সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিয়া লক্ষ্ণৌ চলিয়া যান। এই সভা হইতে "সমাচার হিন্দুস্থানী" নামে একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইত। শম্ভুচন্দ্রের হস্তে এই "সমাচার" সম্পাদনের ভার অর্পিত হয়। হিন্দু পেটরিয়টের নূতন সম্পাদক হইয়াছিলেন রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর। শম্ভুচন্দ্র লক্ষ্ণৌ নগরে অবস্থিতি কালে হিন্দু পেটরিয়টে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতেন। লক্ষ্ণৌ বরাবরই গীত-বাদ্যের চর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। তৎকালে সেখানে সোরি মিয়ার পৌত্র মিয়া আমীর আলি সর্ব্বপ্রধান ওস্তাদ ছিলেন। শম্ভুচন্দ্র তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া হিন্দুস্থানী সঙ্গীত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে শম্ভুচন্দ্রের পরম বন্ধু নবাব আবদুল লতিফ বাহাদুর মুর্শিদাবাদে বাঙ্গলার নবাব নাজিমের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। নবাব নাজিম শম্ভুচন্দ্রকে প্রথমে রাজনীতিক পরামর্শদাতা, পরে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু এখানে তিনি নিরুপদ্রবে বাস করিতে পারেন নাই। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী পদচ্যুত দেওয়ান

এবং আমলাবর্গের ষড়যন্ত্রে তাঁহাকে বিব্রত হইতে হয়। এমন কি, এক সময়ে তাঁহার বিরুদ্ধে গুণ্ডা নিযুক্ত করা হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদে থাকিতে থাকিতে তাঁহার পিতার লোকান্তর হওয়ায় শম্ভুচন্দ্র পিতৃকৃত্য সমাপনের জন্য কলিকাতায় আসেন। তাহার পর আর তিনি মুর্শিদাবাদের কর্ম্মে ফিরিয়া যান নাই। ইহাতেও কিন্তু তিনি নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। ভূতপূর্ব্ব নায়েব-দেওয়ান কতকগুলি দলিলের দাবী দিয়া তাঁহার নামে ক্ষতিপূরণের অভিযোগ আনয়ন করেন। আদালতের বিচারে শম্ভুচন্দ্র এই অভিযোগে সসম্মানে মুক্তিলাভ করেন; অধিকন্তু, কতকগুলি জিনিস ক্রয়ের কমিশন এবং বেতন বাবদ অনেক টাকার দাবী দিয়া পাল্টা নালিশ করিয়া নায়েব দেওয়ানের নিকট হইতে সমস্ত টাকা আদায় করিয়া লন।

মুর্শিদাবাদ হইতে ফিরিয়া তিনি হিন্দু পেটরিয়টে কিছু দিন সমালোচনা লিখিয়াছিলেন। পরে কলিকাতা ট্রেনিং এ্যাকাডেমীর হেড্‌মাষ্টারের পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু এই কাজ তাঁহার বেশী দিন ভাল লাগে নাই।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে নবাব আবদুল লতিফ বাহাদুরের চেষ্টায় শম্ভুচন্দ্র কাশীপুরের রাজা শিউরাজ সিংহের সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন। রাজা তাঁহার সেক্রেটারীকে লইয়া কাশীপুরে যাত্রা করেন। রাজার অভ্যর্থনার্থ তাঁহার ভৃত্যবর্গ একটা প্রকাণ্ড বন্য বরাহ শিকার করিয়া আনিয়াছিল। প্রাসাদে প্রবেশ করিবার সময় এই সুলক্ষণ দেখিয়া রাজা পরমাহ্লাদিত হইয়া বরাহের মাংস সকলকে বণ্টন করিয়া দেন এবং নব-নিযুক্ত সেক্রেটারীকেও বড় একখণ্ড মাংস পাঠাইয়া দেন। শম্ভুচন্দ্র নিরামিষাশী ছিলেন বলিয়া মাংস ফিরাইয়া দেন। রাজা সেক্রেটারীর মত পরিবর্ত্তনের অনেক চেষ্টা করেন এবং পণ্ডিত মণ্ডলীর সমাবেশ করিয়া শিকার করা বন্য বরাহের মাংস ভক্ষণের সপক্ষে পাঁতি সংগ্রহ করেন। পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা দেন যে বন্য বরাহ-মাংস ভক্ষণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে। শম্ভুচন্দ্র তাহা স্বীকার করিয়াও মাংস ভক্ষণে অসম্মত হন। রাজা ইহা লইয়া আর পীড়াপীড়ি করেন নাই, রাগও করেন নাই। তবে রামপুরের নবাবের একজন Personal Assistantএর প্রয়োজন জানিয়া শম্ভুচন্দ্রকে প্রশংসাপত্র দিয়া রামপুরে পাঠাইয়া দেন। রামপুরে আসিয়া শম্ভুচন্দ্র অচিরে নবাবের প্রিয় পাত্র হইয়া উঠেন। কিন্তু এখানেও নবাবের অন্য কর্ম্মচারীদের ষড়যন্ত্রে তাঁহাকে বিব্রত হইতে হয়। অগত্যা তিনি রামপুর হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এখানে আসিয়া তিনি নিজ সম্পাদকতায় একখানি সাময়িক পত্র বাহির করেন, এবং হিন্দু পেটরিয়ট প্রভৃতি পত্রেও লিখিতে থাকেন। এই পত্রে তিনি ভূপালের বেগম সেকন্দ্রার একটি জীবনী লিখিয়াছিলেন। তাঁহার মাসিক-পত্রখানির পাঁচ সংখ্যা বাহির হইবার পর উহা বন্ধ হইয়া যায়।

১৮৭৬ সালে কিম্বা তাহার পর বৎসর শম্ভুচন্দ্র মাসিক পাঁচ শত টাকা বেতনে পার্ব্বত্য ত্রিপুরার মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন। ১৮৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে আগড়তলায় গিয়া তিনি কার্য্যভার গ্রহণ করেন। কিন্তু এখানেও সেই ষড়যন্ত্র। রাজ্যের উন্নতি বিধানের জন্য যে-কোন কার্য্যে তিনি হস্তক্ষেপ করিতেন, কোন্ অদৃশ্য হস্ত তাঁহাকে সেই কার্য্যে বাধা দিত। কাজেই তিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। মহারাজ তাঁহার গুণে একান্ত প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন—সহজে তাঁহাকে ছাড়িতে চাহেন নাই। তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন, শম্ভুচন্দ্রকে আগড়তলায় যাইতে হইবে না—কলিকাতায় থাকিয়াই তিনি মহারাজার পরামর্শদাতা রূপে কার্য্য করুন। কিন্তু আর তিনি ত্রিপুরার কর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই।

কলিকাতায় ফিরিবার পর, রাণী রাসমণির সম্পত্তি বিভাগের জন্য যে কমিশন গঠিত হইয়াছিল, বাঙ্গালার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মহোদয় শম্ভুচন্দ্রকে এই কমিশনের অন্যতম সদস্য নির্ব্বাচিত করেন।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে শম্ভুচন্দ্র Reis and Rayyet নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাই তাঁহার গৌরব-স্তম্ভ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহাই তাঁহার উপযুক্ত ও মনের মতন কর্ম্মক্ষেত্র হইয়াছিল। এই সংবাদপত্রের সম্পাদকের আসনে বসিয়া তিনি মনের সাধে নিজের বিশিষ্ট মত প্রকাশ করিতে পারিতেন—কাহারও মুখাপেক্ষা করিতে হইত না। এই পত্র উপলক্ষে বহু উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়; এবং তদানীন্তন

বড়লাট লর্ড ডাফরিন ও তাঁহার সমশ্রেণীস্থ লোকদিগের সহিত তাঁহার নিয়ত পত্র ব্যবহার চলিত।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার Travels in E. Bengal নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বইখানি অতি চমৎকার শব্দচিত্র। ইহাতে তিনি পূর্ব্ববঙ্গের যে প্রাকৃতিক চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, বইখানি পড়িলে পাঠকের হৃদয়ে তাহা স্থায়ীভাবে মুদ্রিত হইয়া যায়।

শম্ভুচন্দ্র যৌবনকালেই হাঁপানি রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। রোগ যখন প্রবল হইত, তখন তিনি অহিফেন সেবন করিতেন। তাহাতে রোগ-যন্ত্রণা হ্রাস পাইত। রোগ কমিলে তিনি অহিফেন সেবন বন্ধ করিতেন—কখনও উহাকে অভ্যাসে পরিণত হইতে দেন নাই। কিন্তু এই রোগ হইতে তিনি কখনও আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই, ক্রমে তাঁহার শরীর ভগ্ন হইতে থাকে। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে একবার নিউমোনিয়া রোগ হয়, তাহাতে তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। তিনি বুঝিতে পারেন, তাঁহার দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে। ১৮৯৪ সালের ২৬এ জানুয়ারী হঠাৎ তাঁহার অত্যন্ত শ্বাস-কষ্ট উপস্থিত হয়। ২রা ফেব্রুয়ারী তাঁহার জ্বর হয়। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখিতে পান। ৭ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যার সময় তাঁহার আত্মা মরলোক হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করে।

শম্ভুচন্দ্র চির-অস্থির, চির-অব্যবস্থিত চিত্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যে অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, উপযুক্ত ক্ষেত্রের অভাবে তাহার সম্যক বিকাশে বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। তাই তাঁহার গুণের সম্যক আদর হয় নাই, তাঁহার মাতৃ-ভাষায় তাঁহার কোন জীবনীগ্রন্থও রচিত হয় নাই। তাই গুণজ্ঞ ও গুণগ্রাহী বিদেশী বন্ধু তাঁহার জীবন-রচিত রচনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমাদের স্বদেশবাসী গুণবান ব্যক্তির গুণের আদর করিবার পক্ষে আমাদের অনাস্থা অমার্জ্জনীয় অপরাধ। এই অপরাধ স্খালনে বাঙ্গালীর অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য। *

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সৌজন্যে, Mr. F. H, Skrine I. C. S. প্রণীত AN INDIAN JOURNALIST অবলম্বনে।

সনেট

শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

তোমারে পেয়েছি আমি আজ নহে, আরো কত বর্ষ আগে আমারি অজ্ঞাতে
জ্যোতির্ম্ময়ী নিশিথিনী এক শুধু সাক্ষী তার—এইটুকু মনে পড়ে আজ;
সেদিন আমার লুব্ধ আঁখি-তূণে কোন্ বাণ পূর্ণ ছিল,—ধ্যান ধারণাতে
তুমি জানো চুম্বন-শায়কবিদ্ধা সোহাগী কপোতী মম মমতার তাজ।
কামনার কারাগারে যে দেহ পচিতেছিল একখানি রক্ত-ওষ্ঠ তরে,
তব রূপ-স্বর্গলোকে কবে সে ইন্দ্রত্ব পেল' সুকোমল কর-স্পর্শ পেয়ে—
কবে শিষ্ট দৃষ্টি-পাখী লজ্জার পিঞ্জর ভেঙ্গে উড়ে গেল প্রেম-পক্ষ ভরে
তোমার নয়নাকাশে, তুমি জানো, তুমি জানো ধ্যানাতীতা ধরিত্রীর মেয়ে।

সুন্দরের সূচীপত্রে খুঁজিয়া পেয়েছি যারে,—স্মিতমুখী সন্ধ্যা-তারা মম
প্রাণ-প্রিয়া সেই তুমি—কাব্যে-বলা চৈত্র-জ্যোৎস্না অনন্তের অব্যক্ত কাহিনী—
আজিও বিচিত্ররূপে উপেক্ষার পঞ্চ-সরে জ্যোৎস্নাস্নাত অরবিন্দ সম
ফুটিয়া র'য়েছ সুখে দেহের লাঞ্ছনা সহি' হে আমার উন্মাদ রাগিণী।
আজ নহে আমাদের প্রথম উৎসব এই, আজ নহ' নব পরিণীতা,
কল্প-প্রেম-রাখী যবে বেঁধে দিছি সেই হ'তে তুমি মোর স্মরণ-চুম্বিতা।

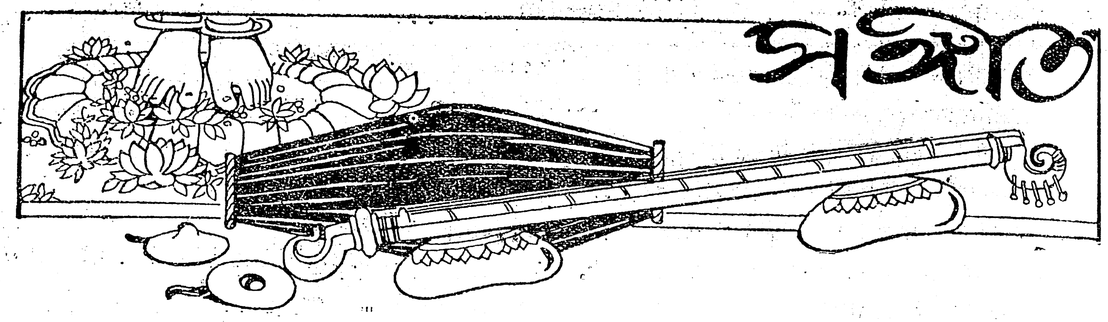

গান ও সুর ঃ—শ্রী অসিতকুমার হালদার

স্বরলিপি ঃ—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও
শ্রীরবীন্দ্র রায়

আজি জাগো আনন্দে
সুখ-স্বপন অবসানে,
চাহ প্রভাত-কিরণ পানে!
আজি, বন-পল্লবে
কি মধুর মূর্চ্ছণা আনে!—
নব জাগরণ চেতন গানে।

চঞ্চল কিশলয়-বীথি,
কলরব-মুখরিত গীতি,

আজি শোন আনন্দে,
দুখ-বেদনা-ভোলা প্রাণে—

- জ্ঞমা পা ণ | ণদ -া প ম | জ্ঞা ম প ম | জ্ঞা জ্ঞা ঋ সা			
০ জা গো আ	ন ন্ দে সু	খ স্ব প ন	অ ব সা ০
৩	+	২	০
সা মা পা ণ | ণদ -া প প | -া -া ম জ্ঞা | ম প ম জ্ঞা			
নে জা গো আ	ন ন্ দে ০	০ ০ সু খ	স্ব প ন অ
৩	+	২	০
জ্ঞ ঋ সা -া | -া মা মা মা | পা পা ণ ণদ | দা -া -া প			
ব সা ০ নে	০ চা হ প্র	ভা ত কি র	ণ পা ০ নে
৩	+	০	
-া জ্ঞমা প ণ | ণদ -া -া -া			
০ জা গো আ	ন ন দে ০		
৩	+		

ণদ দ ণ সা | র্সা র্সা র্জ্ঞা ঋ -র্সা | নঁর্সা -া -া -া | র্সা জ্ঞা ঋ সা			
হে র ব ন	প ল্ ল ০	বে ০ ০ ০	কি ম ধু র
০	৩	+	২
সা ণ ণ ণ | দ -া পা -া | গা ঋ সা ণ | দ প ম প			
মু র ছ না	আ ০ নে ০	ন ব জা গ	র ণ চে ০
মা জ্ঞা ঋ ঃ | সা মা প ণ | দ -া -া -া			
ত ন গা ০	নে জা গো আ	ন ন্দে ০ ০	
০	৩	+	
সা সা ম ম | প প ণ দ | দ -া প -া | প র্জ্ঞা ঋ -া			
চ ন চ ল	কি শ ল য়	বী ০ থি ০	ক ল র ব
২	০	৩	+
সা সা ণ -া | দ -া প -া | প ম প ণ | ণদ দ প ম			
মু খ রি ত	গী ০ তি ০	শো নো আ ০	ন ন দে ভু
২	০	৩	+
জ্ঞা ম প ম | জ্ঞা জ্ঞা ঋ -া | সা ম প ণ | দ -া -া -া			
খ বে দ না	ভো লা প্রা ০	ণে জা গো আ	ন ০ ০ ০

লক্ষ্ণৌ
খৃষ্ট জন্মদিন, ১৯৩১

ছায়ার মায়া

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(চলচ্চিত্রের দৃশ্যরচন-রীতি)

ছবি দেখতে সুন্দর হয়, তার composition বা দৃশ্যরচন-কৌশলের গুণে ; অর্থাৎ, একখানি ছবিতে যা কিছু দ্রষ্টব্য থাকে সেগুলিকে এমন ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা দরকার, যাতে সমস্ত ছবিখানি দেখতে বেশ শোভন বা সুদৃশ্য হ'য়ে ওঠে। ছবিকে সুদৃশ্য ক'রে তোলা চলচ্চিত্র শিল্পের একটা প্রধান প্রয়োজনীয় অঙ্গ। কারণ ছবির সাফল্য অনেকখানি নির্ভর ক'রে এই সাজানোর কৌশলেরই উপর। পূর্ব্বেই বলেছি যে আলোকচিত্র কেবলমাত্র বাস্তবের অবিকল প্রতিকৃতি হ'লে চল্‌বেনা। নটনটীর অভিনয়াংশ ওঠে এবং সজীবও হয়। যেখানে এই ত্রিবিধ সম্মিলন ঘটেনা, সেখানে ছবিখানি আর যাই হোক সুন্দর ও সুদৃশ্য যে হয়না এ একেবারে সুনিশ্চিত। আমাদের বাংলা ছবিগুলি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ! সুতরাং composition বা চিত্রের দৃশ্যরচন রীতিটা প্রত্যেক আলোক-চিত্র-শিল্পীর সর্ব্বাগ্রে জেনে রাখা দরকার। জগতের একাধিক শ্রেষ্ঠ শিল্পীর তুলি দিয়ে আঁকা অসংখ্য জড়-ছবিরও (Still Pictures) জন-প্রিয়তার একটা বিশেষ কারণ হ'চ্ছে তাঁদের চিত্রের এই composition বা দৃশ্যরচন-কৌশলে তাঁরা অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাতে পেরেছেন। মনে রাখা দরকার যে চলচ্চিত্রও ছবি, অতএব এর সাফল্যও নির্ভর করে ঐ compcsition বা দৃশ্যরচন-কৌশলের উপর।

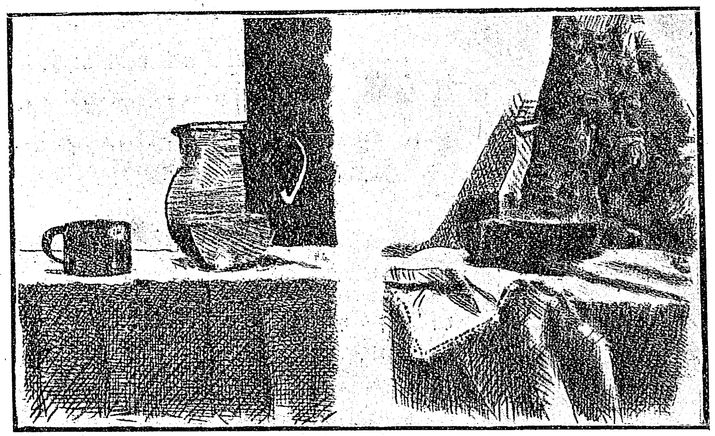

মানানসই সজ্জা (Harmony) বে-মানান সজ্জা (Discord)

চলচ্চিত্রের সুদক্ষ শিল্পী হ'তে হ'লে এই composition বা দৃশ্যরচন-পদ্ধতি ছাড়া তাঁকে আলোক ও ছায়ার তারতম্যের উপযোগিতা ও বিভাগ-কৌশল এবং তাঁর ক্যামেরা বা ছায়াধর যন্ত্রটির সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার-নৈপুণ্যও শিখতে হবে। দৃশ্য-রচন-পদ্ধতির আবার নানা রকম প্রকার-ভেদ আছে, কারণ, পূর্ব্বেই বলেছি এ জিনিসটা আজকের কোনো নূতন আবিষ্কার নয়, ছবি যেদিন থেকে উচ্চ অঙ্গের একটা শিল্প বলে স্বীকৃত হয়েছে সেদিন থেকেই চিত্রে এই দৃশ্যরচন-রীতির প্রচলন হয়েছে। বহু প্রাচীন চিত্রের মধ্যেও এই দৃশ্যরচন-দক্ষতা পরিলক্ষিত হয়। কে যে প্রথম এ তত্ত্ব আবিষ্কার ক'রেছিলেন, তার সঠিক খবর জানা যায় না; তবে, তিনি যিনিই হোন্, তাঁর শিল্প-প্রতিভার অনন্য-সাধারণত্ব স্বীকার না ক'রে উপায় নেই।

লেখক, পরিচালক ও নটনটীর কাজের সুসমন্বয় ঘটিয়ে তোলাই হ'চ্ছে আলোক-চিত্রকরের কৃতকার্য্য হবার সুনির্দ্দিষ্ট পথ। কারণ, এই তিনটির সহযোগেই চিত্রের গল্পটি গ'ড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে আলোকচিত্রে গল্প-লেখকের বক্তব্য এবং প্রয়োগ-শিল্পীর ও পরিচালকের স্বপ্ন ও কল্পনাকেও ফুটিয়ে তুলতে হবে। এ কাজ সুসম্পন্ন করবার সহজ উপায় হ'চ্ছে composition বা দৃশ্যরচন পদ্ধতির প্রতি অবহিত হওয়া এবং সেদিকে আগাগোড়া সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

বর্ত্তমান শিল্প-বিজ্ঞান সপ্রমাণ করেছে যে, কি পটে আঁকা ছবি, কি চলচ্চিত্র বা অন্য চিত্র, সব কিছুই দেখবার সময় সাধারণতঃ আমাদের দৃষ্টি সর্ব্বপ্রথম গিয়ে পড়ে ছবির নীচেকার বাঁ-দিকের কোণে, তারপর সেখান থেকে আমাদের দৃষ্টি ক্রমে সরে সরে উপর দিকে উঠ্‌তে থাকে, যে পর্য্যন্ত না একটা কিছু দ্রষ্টব্য বস্তুর উপর গিয়ে আবদ্ধ হয় বা অন্য কোনো কিছুতে আকৃষ্ট হয়। এই সব বস্তু বা দ্রষ্টব্য বিষয় গুলিকে ঠিক যথাযথ স্থানে সাজিয়ে রাখার কৌশলের মধ্যেই দৃশ্যরচন-নীতির গুহ্যতত্ত্ব নিহিত রয়েছে।

চলচ্চিত্রে এমন ভাবে একখানি ছবির দৃশ্য সাজানো যেতে পারে যাতে দর্শকের দৃষ্টিকে শিল্পী তাঁর ইচ্ছামত ছবির যে কোনোও একটি দিকের কোনো বিশেষ স্থানে আকৃষ্ট করতে পারেন এবং সেখানে আবদ্ধ রাখতেও পারে, অথচ সে সময় সেই ছবিরই অন্যদিকে হয়ত অনেক কিছু ব্যাপার ঘট্‌ছে, কিন্তু, দর্শক সেদিকে বেশী মনোযোগ দিতে চাইবেনা! এই যে দর্শকের দৃষ্টিকে নিজের ইচ্ছামত ছবির যে কোনো অংশে টেনে নিয়ে যাওয়া এবং কেবলমাত্র নিজের অভীষ্ট যে কোনোও বস্তু বা বিষয়ের উপর তাদের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখতে পারার কৌশল ও নৈপুণ্য—এইটুকুই হ'চ্ছে নিপুণ আলোক-চিত্রকরের প্রধান বিশেষত্ব। এইখানেই যিনি দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন, তিনিই হ'য়ে ওঠেন 'পাকা-খেলোয়াড়'! আর, যিনি এসব বোঝেনও না, পারেনও না, তিনি বরাবরই এ লাইনে আনাড়ী ও কাঁচা লোক ব'লেই বিবেচিত হবেন। ছবির ঘটনাবলী অনেক সময় এই দৃশ্যরচন-রীতির দোষেই জটিল ও দুর্ব্বোধ হ'য়ে ওঠে, কিন্তু, দৃশ্যরচন-কৌশল যে জানে, তার হাতে পড়লে যে কোনো ছবি যেন আপনি কথা কয়! খুবই সরল ও সহজবোধ্য হ'য়ে ওঠে।

পূর্ব্বেই বলেছি এই দৃশ্যরচন-কৌশল প্রয়োগ করবার অসংখ্য উপায় শক্তিশালী শিল্পীর হাতের মুঠোর মধ্যেই থাকে। যে যত বেশী সেগুলিকে নিপুণভাবে কাজে লাগাতে পারে সেই তত বেশী দক্ষতার পরিচয় দেয়! একটা কোনো

"জ্ঞানদেবী" (দর্শকের দৃষ্টি দেবীর মুখের দিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে)

আভ্যন্তরীণ দৃশ্যে (Interior scene) যে Set বা পৃষ্ঠপট ব্যবহার হয় তা'তে—সেই পট-ভূমিকার পরিকল্পনা থেকে আরম্ভ করে সব কিছু সাজসরঞ্জাম ও আস্‌বাবপত্র ব্যবহারের

"জ্ঞানদেবী" (দর্শকের দৃষ্টি দেবীর জ্ঞানের ভাণ্ডার গ্রন্থখানির দিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে)

ভিতর দিয়ে সে ছবিতে শুধু সুরুচি ও সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তোলাই শিল্পীর একমাত্র কাজ নয়—গল্পের প্রতিপাদ্য

ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পাত্র-পাত্রীর চরিত্র ও প্রকৃতিগত বিশেষত্বের দিকটাও যাতে পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে সেদিকেও তাঁর সতর্ক ও সযত্ন দৃষ্টি রাখা দরকার।

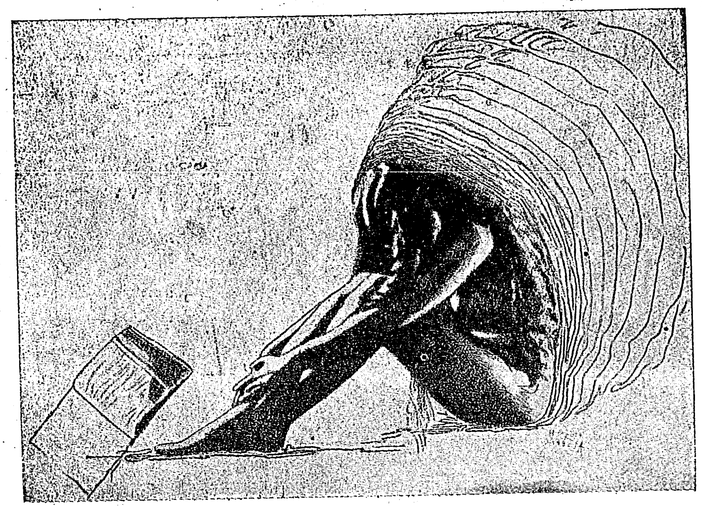

'কাল ও দীপশিখা'. (দর্শকের দৃষ্টি মূর্ত্তির দিকে আকৃষ্ট করা)

একজন রাসায়নিকের পরীক্ষাগার, একজন নৃ-তত্ত্ববিদের অনুসন্ধান-কক্ষ, বা একজন প্রত্ন-তাত্ত্বিকের গবেষণা-গৃহ সাজানো হয়ত খুব সহজ; কিন্তু, একজন দার্শনিকের ঘর কিম্বা উন্মাদের কক্ষ কী ভাবে সাজানো উচিত, এ সম্বন্ধে আলোক-চিত্রকরকে অনেক ভাবতে হয়। রসায়ন-তত্ত্ববিদ্ বা প্রত্ন-তাত্ত্বিকের সাজ-পোষাকের মধ্যে তেমন কোন বিশেষত্ব নেই—বিশেষত্ব শুধু তাদের পরস্পরের কার্য্যালয়ের। একজনের শিশি-বোতল ও 'টেষ্ট্-টিউব' নিয়ে কারবার, একজন কঙ্কালের পূজারী, আর একজন প্রাচীন প্রস্তর-মূর্ত্তি ও স্থাপত্যের মধ্যে নিমগ্ন; কিন্তু একজন দার্শনিক অথবা কোনো উন্মাদের বাসগৃহ দেখাতে গেলে আস্‌বাবপত্রের সাহায্য অতি সামান্যই পাওয়া যাবে; এখানে চিত্রের সাফল্য নির্ভর করবে অভিনেতার রূপসজ্জা ও নাট-নৈপুণ্যের উপরই সব চেয়ে বেশী। তাদের সেই রূপসজ্জা ও অভিনয়-কৌশলকে সুসম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ক'রে তোলাই—হওয়া উচিত তখন আলোক-চিত্রকরের সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য। এটা নিপুণতার সঙ্গে নিষ্পন্ন হতে পারে প্রধানতঃ ছবিখানিতে প্রয়োজনমত আলো-ছায়ার পরিবেষণ পটুতায়। আসবাব-পত্রের সাহায্যও কিছু কিছু নেওয়া যেতে পারে, যদি সে আলোক-চিত্র-শিল্পী তার ব্যবহার সম্বন্ধে সুদক্ষ হ'ন। একখানি ইজিচেয়ার, একটা নস্যদান কিম্বা গড়গড়া, অত্যন্ত সাদাসিধা একটি শয্যা একধারে, খানকয়েক মোটা মোটা দর্শন-শাস্ত্রের বই, একটি উজ্জ্বল আলোকাধার, একটি এলার্ম ঘড়ী, একটি ছোট্ট ষ্ট্যাণ্ড, চায়ের পেয়ালা পিরিচ, খাতা কলম, কাগজ ও একটি 'লাল-নীল' পেন্সিল—এই আস্‌বাব-পত্রগুলি দার্শনিকের ঘরে হয়ত' রাখা যেতে পারে; কিন্তু শুধু ওগুলো রাখলেই তো হবে না, ওগুলিকে এমনভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে হবে যাতে দার্শনিকের ঘরখানি কেবল মানিয়ে যাওয়াই নয়, লোকটিকে দেখলেই বোঝা যাবে যে আমরা একজন দার্শনিকের সাক্ষাৎ পেলুম! ওই সব আসবাবপত্রের যথাযোগ্য সমাবেশে এমন একটা পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন গড়ে উঠবে সেই ঘরের মধ্যে, যে, সে ছবি দেখ্‌বামাত্র

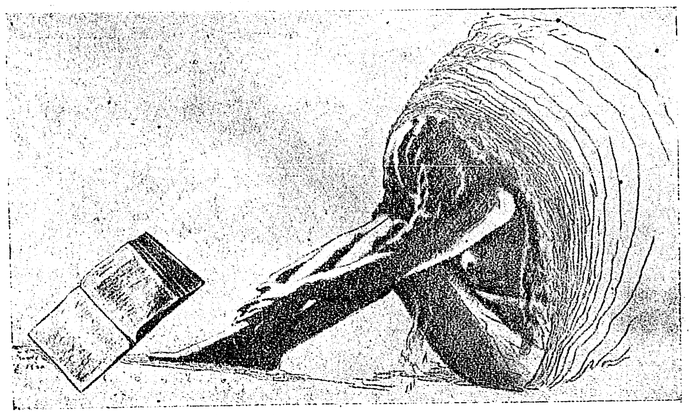

'কাল ও দীপশিখা' (দর্শকের দৃষ্টি কালের পুঁথির দিকে আকৃষ্ট করা)

দর্শকদের মনে একটা দার্শনিকতার আবহ এসে ছোঁয়া দেবে! সেইখানেই দৃশ্য-রচন-কৌশলের সার্থকতা এবং আলোক-চিত্রকরের কৃতিত্ব।

বহির্দৃশ্যের (Exterior Scene) সংরচনে প্রাকৃতিক সম্পদ শিল্পীর প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করে। তরু, লতা, নদী, গিরি, মরু, প্রান্তর, ঘনবন, জীর্ণগৃহ, প্রাসাদ, তোরণ, কুটীর-প্রাঙ্গণ এসব ত' আছেই, তা' ছাড়া কৃত্রিম ফল-ফুলের গাছ, শিক্ষিত জীবজন্তু ও পশুপক্ষী, কৃত্রিম পাহাড় ও হ্রদ প্রভৃতি অনেক কিছুর সাহায্য নিতে পারা যায়। এর উপর আবার ক্যামেরার নানারকম কারচুপিও তিনি কাজে লাগাতে পারেন। কৃত্রিম আলোক-পাতের সুযোগও তাঁর থাকে।

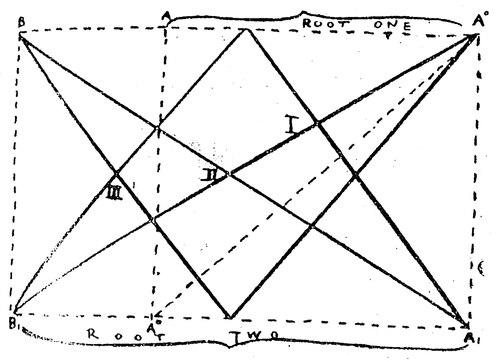

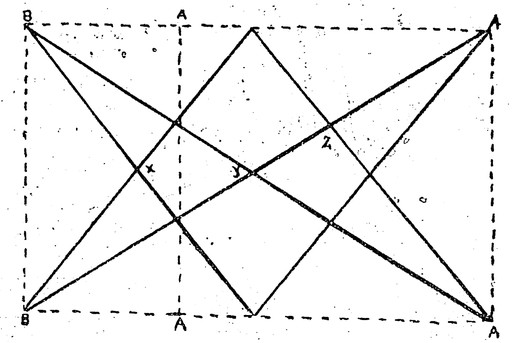

গতির অনুকুল রেখা ও সামঞ্জস্য ক্ষেত্রের নক্সা—গতির অনুকূল রেখা I or X. প্রথম ও প্রধান আকর্ষণ স্থল II or Y. দ্বিতীয় আকর্ষণ স্থল III or Z. তৃতীয় আকর্ষণ স্থল

পরিচালক নটনটীকে কোন্ দৃশ্যে কী করতে হবে এবং কী বলতে হবে যখন ব'লে দেন, তখন আলোক-চিত্রকর সেটি ভালো ক'রে শুনে নিয়ে সেই দৃশ্যটি সংরচনের ভার নেন, কারণ, এ কাজটি সম্পূর্ণরূপে আলোক-চিত্রকরের উপরই নির্ভর করে। অভিনেতৃরা অভিনয় ক'রছেন, পরিচালক মহাশয় তাঁদের গতিবিধি ও ভাবাভিব্যক্তি দূর থেকে নির্দ্দেশ ক'রে দিচ্ছেন, কিন্তু, তাঁদের সে গতিবিধির ও ভাবভঙ্গীর ছবি এঁকে নিচ্ছে কে? চলচ্চিত্রের প্রকৃত শিল্পী কে?—তুলি ও রংয়ের পরিবর্ত্তে ছায়াধর যন্ত্রের সাহায্যে আলোক-চিত্রকরই সে ছবি তুলে নেয়! সেই এ-কাজের একমাত্র 'সুপটু পটুয়া!' সুতরাং, শ্রেষ্ঠ বা উচ্চ অঙ্গের চলচ্ছবি তোলবার দূরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন যে প্রতিভাবান্ পরিচালক, তাঁকে সর্ব্বাগ্রে সংগ্রহ করতে হবে এমন একজন আলোক-চিত্রকর যার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ শিল্প-জ্ঞান ও কলারস-বোধ আছে।

প্রথমে লেখক তার সাধ্যমত একটি উৎকৃষ্ট গল্প রচনা করে আনেন, প্রযোজক সেই গল্পটি প'ড়ে দেখে যদি বোঝেন যে—হ্যাঁ, ছবিতে এ গল্পটি খুব ভালোই ফুট্‌বে এবং এর মধ্যে দর্শক আকর্ষণের মালমশ্‌লাও যথেষ্ট পরিমাণে

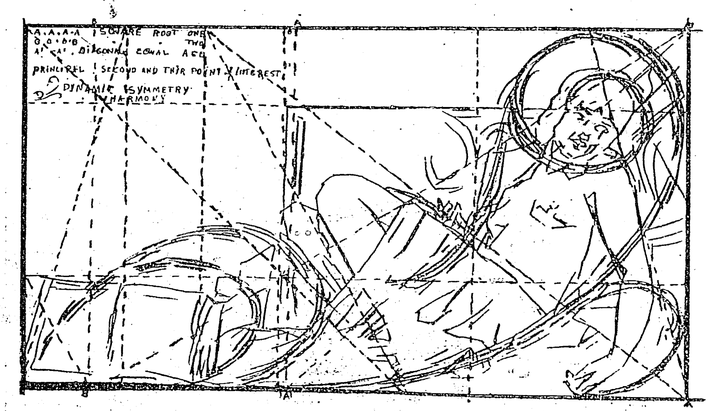

নক্সায় তোলা 'জ্ঞানদেবীর' চিত্র

আছে, সুতরাং লাভবান হবার সম্ভাবনাও বর্ত্তমান, তখন তিনি সে গল্পটির সর্ব্বস্বত্ব কিনে নেন। তারপর, তিনি আবার সে গল্পটিকে নাট্যরূপ দেবার জন্য বেতনভোগী

চিত্রনাট্য-রচয়িতার কাছে উপস্থিত করেন এবং সেই সঙ্গে ছবিখানির সম্বন্ধে তিনি যা' যা' ভেবেছেন এবং তাঁর মাথায় যে সব কল্পনা এসেছে তাও সেই চিত্র-নাট্য-রচয়িতার গোচর করেন।

আপেল খাওয়া (দর্শকের দৃষ্টি 'দন্তরুচি কৌমুদীর' প্রতি আকৃষ্ট)

চিত্র-নাট্য-রচয়িতা তখন সেই গল্পটিকে ছবির ছাঁচে ঢালাই ক'রে তাতে প্রযোজকের কল্পনার ঐশ্বর্য্য-টুকু এবং আপন মনের রূপ-রসের সমস্ত মাধুরী মিশিয়ে দেন। তার পর সেটি গিয়ে পৌঁছয় পরিচালকের হাতে। পরিচালক আবার তার মধ্যে নিজের প্রতিভা-স্ফূরিত ও অভিজ্ঞতা-লব্ধ বহু বৈচিত্র্য সন্নিবিষ্ট ক'রে সেখানিকে একটি সুসম্পূর্ণ চিত্র ক'রে তোলেন। অর্থাৎ, প্রকৃত পক্ষে সে গল্পটি হ'য়ে ওঠে তখন শুধু অসংখ্য ধারা-বাহিক চিত্রের নক্সা—যা' সর্ব্বশেষে আলোক-চিত্রকর তাঁর ক্যামেরায় গেঁথে তোলেন। কিন্তু, তার আগে পরিচালক সেই চিত্র-নাট্যের ভূমিকা নির্ব্বাচন ক'রে তাঁর অধীনস্থ নটনটীদের মধ্যে যথাযোগ্য লোককে তা' বিতরণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে গল্প-লেখক, প্রযোজক, চিত্র-নাট্যকার ও তাঁর নিজের ঐক্যমতের উপযোগী দৃশ্যপটের পরিকল্পনা আঁকবার ভার দেন শিল্পীর উপর। নির্দ্দিষ্ট ভূমিকা অভিনয়ের জন্য নির্ব্বাচিত নটনটীরা ইতিমধ্যে তাদের অভিনেয় চরিত্রগুলির ধ্যান-ধারণা এবং প্রত্যেক চরিত্রটি পরিস্ফুট করে তোলবার জন্য অভিনয় ও রূপসজ্জার কি ঔৎকর্ষ সাধন করা যেতে পারে সে বিষয়ে চিন্তা ক'রতে থাকেন। তারপর ডাক পড়ে আলোক-চিত্রকরের!

অতএব দেখা যাচ্ছে যিনি ক্যামেরার পিছনে আছেন শেষরক্ষার ভার ও দায়িত্ব সবটাই তাঁর! তিনি গল্প পেলেন—গল্পের ভিতর গল্প-লেখকের কল্পিত ছবি পেলেন, প্রযোজকের নিকট দর্শক আকর্ষণোপযোগী 'প্যাঁচের' সন্ধান পেলেন, চিত্র-নাট্যকারের রচিত ছায়ালিপিতে তিনি চিত্র-বিবৃতি বা চিত্র-পরিচয় পেলেন, পরিচালকের পরিকল্পনায় সে ছবি যে "রূপ" নেবে তারও প্রতিচ্ছবি ও দৃশ্যপট প্রভৃতি পেলেন এবং অভিনেতৃবর্গের মানসপটে আঁকা চরিত্র-চিত্রগুলিও পেলেন। এখন, এই এতগুলি মনের কল্পিত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরিত করা; তাদের ধ্যানের ছবিকে সজীব ও প্রত্যক্ষ ক'রে তোলার কঠিন কার্য্যভার গিয়ে পড়ে চলচ্চিত্রের আলোক-চিত্রকরের উপর! তিনি যদি যোগ্যতার সঙ্গে তাঁর এই

বন-ভোজন (দৃশ্যরচন-কৌশলের গুণে তৈজস্ পত্রগুলি রাখার মধ্যে একটি শোভন সামঞ্জস্য সাধিত হয়েছে)

কঠিন কার্য্যভার সুসম্পন্ন ক'রতে না পারেন তাহ'লে সেই গল্প-লেখক থেকে সুরু ক'রে প্রযোজক, চিত্রনাট্যকার, পরিচালক, কারুশিল্পী (Art Director) ও নট-নটীগণ সকলেরই সমবেত চেষ্টা উদ্যম ও পরিশ্রম একেবারে পণ্ড হ'য়ে যাবে। সুতরাং চলচ্ছবিতে আলোক-চিত্রকরের দায়িত্ব সবচেয়ে গুরুতর। বিশেষ, আবার যে আধারে বা প্রচ্ছদের উপর তাঁর পটের ভিত্তি নির্ভর করে তার পরিমাপ মাত্র ৳″×১″ ইঞ্চি। এই ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যেই তাঁকে শিশির বিন্দুতে আকাশ ধরার মতো চলচ্ছবির প্রত্যেক দৃশ্যটি তুলে নিতে হবে। কাজেই, তাঁর অসুবিধাও খুব; এবং সবচেয়ে মুস্কিল সেই ছবি যখন পৃথিবীর নানাদেশের ছবি-ঘরে অসংখ্য দর্শকদের চোখের সামনে ধরা হবে তখন সেই ক্ষুদ্র ছবিকে "প্রদর্শক-যন্ত্রের" সাহায্যে প্রায় ষোলো হাজার গুণ বড়ো ক'রে দেখানো হবে! এই বিস্তৃতির সঙ্গে ছবির প্রত্যেক খুঁটিনাটির তাল মানের (Proportion) যে বিপুল পরিবর্ত্তন ঘটে, চলচ্চিত্র-শিল্পীকে প্রতি-পদে সে কথা স্মরণ রেখে সেই হিসাবের সঙ্গে অনুপাতে ছবি তুলতে হয়।

পূর্ব্বেই বলেছি দৃশ্যরচন-কৌশলের একাধিক রকম পদ্ধতি আছে। তার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বজনপ্রিয় পদ্ধতি হ'চ্ছে 'ডাইন্যামিক্ সিমেট্রী' অর্থাৎ গতির অনুকূল সামঞ্জস্য-বিধান। (Dynamic Symmetry) জ্যে হাম্বিজ্ (Jay Hambidge) এই বিষয় নিয়ে একখানি বেশ সুচিন্তিত গ্রন্থ রচনা ক'রেছেন। চিত্র নিয়ে যাঁদের কারবার তাঁরা এ বইখানি পড়লে ছবিকে এই দৃশ্য-রচন-কৌশল বা composition যে কতখানি সুন্দর ও সুদৃশ্য অর্থাৎ চিত্তাকর্ষক ও নয়নাভিরাম করে তোলে—এক কথায় সুসম্পূর্ণ করে তোলে—তা' জেনে বিস্মিত এবং প্রভূত উপকৃত হবেন।

'ডাইন্যামিক সিমেট্রী' ব্যাপারটা আর কিছুই নয়—একটা কোনো নির্দ্দিষ্ট পরিমিত ক্ষেত্রের উপর প্রথমত কয়েকটি গতির অনুকূল রেখা (ডাইন্যামিক্ লাইন) টেনে দৃশ্য রচনের একটা নক্সা ছ'কে নেওয়া এবং সেই ছকের মধ্যে চিত্রের বিষয়-বস্তুকে ঠিক মানিয়ে সাজানো! তুলি ও রং নিয়ে যাঁরা ছবি আঁকেন তাঁরা এই নক্সা আগে ছ'কে নিয়ে তবে সে কাগজে বা ক্যানভাসে হাত দেন, চলচ্চিত্র-শিল্পীর সে সুযোগ নেই; তাঁকে নিজের মানস-পটে এই

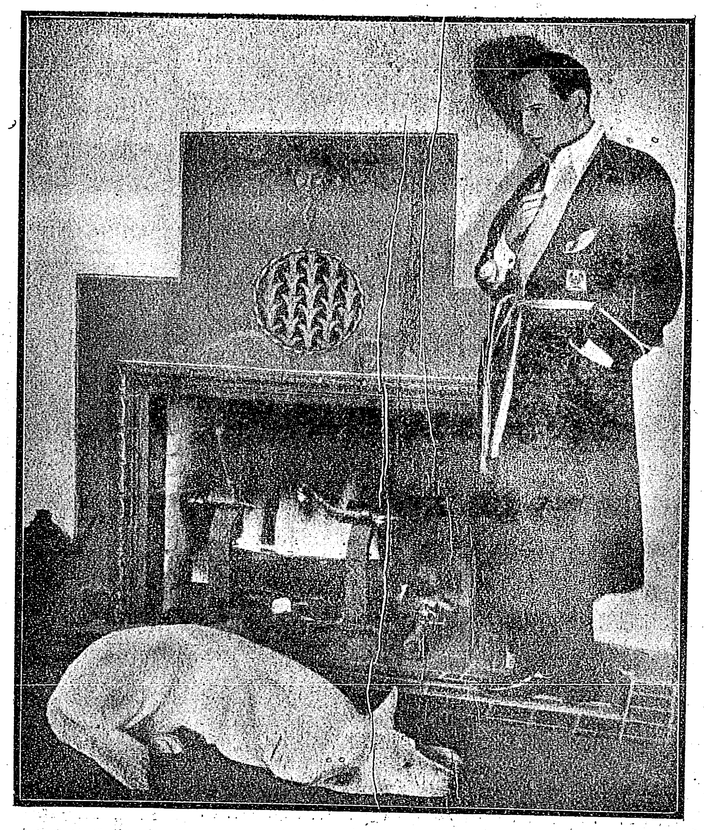

আরাম ও উদ্বেগ! (সরল ও ঋজু রেখার অনুসরণে দৃশ্য-রচন-কৌশলের গুণে কুকুরটির মধ্যে আরাম মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে, এবং উদ্ধত মানুষটি তা' থেকে বঞ্চিত!)

নক্সা ছ'কে রাখতে হয়। কেউ কেউ অবশ্য ক্যামেরার পিছনে যে ঘসা কাঁচের পর্দ্দাখানি থাকে ছবির লক্ষ্য স্থির করবার জন্য, তারই উপর পেন্সিল দিয়ে ডাইন্যামিক্ লাইনের বা গতির অনুকূল রেখার ঘর দেগে রেখে দেন। তাতে

ছবির দৃশ্য-রচন কাজে আলোক-চিত্রকরের অনেকটা সুবিধা হয়।

'গতির অনুকূল রেখা' ব'ললে কী বোঝায় হয় ত' অনেকে তা ঠিক অনুধাবন ক'রতে পারবেন না। কিন্তু, শিল্পীরা এর রহস্য জানেন। যেমন,—ঋজু-রেখা (Vertical line) ঔদ্ধত্য, অহঙ্কার এবং উচ্চ পদমর্য্যাদার গাম্ভীর্য্য দ্যোতক! শায়িত-রেখা (Horjzontal line) ঔদাস্য, বিনয় এবং অবসাদ ও আরাম-ব্যঞ্জক! কোণা-কোণি রেখা (Diagonal line) বিরক্তি, ক্রোধ, উৎসাহ ও কার্য্য-তৎপরতা প্রভৃতির পরিচায়ক!

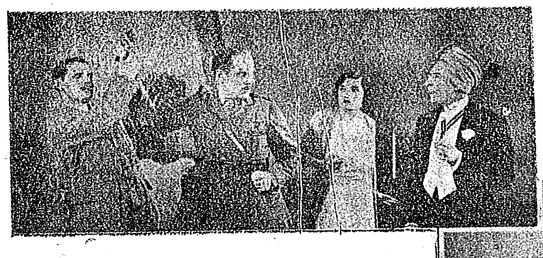

কোণা-কোণি রেখায় চিত্রের ঘটনা সমাবেশ (বাম দিক থেকে দক্ষিণে উপর কোণ থেকে নিচের কোণ)

কোণা-কোণি রেখায় চিত্রের ঘটনা সমাবেশ (দক্ষিণ দিক থেকে বামে—উপর কোণ থেকে নীচের কোণ)

একই ছবি কেবলমাত্র দৃশ্য-রচন-কৌশলের গুণে কিরূপ বিভিন্ন অর্থ সূচিত ক'রে তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে এই প্রবন্ধ-সংলগ্ন চিত্র-গুলি থেকে। হোলি উডের যশস্বী শিল্পী শ্রীযুক্ত হেনরী গুড (Henry Goode) এই ছবিগুলি "আমেরিক্যান সোসাইটী অফ্ সিনামেটে গ্রাফার্স্' সমিতিকে উপহার দিয়েছেন। এই ছবিগুলিতে তিনি 'গতির অনুকূল সামঞ্জস্য সাধন পদ্ধতি' (System of Dynamic Symmetry) অনুসারে চলচ্চিত্রের দৃশ্য-রচন-কৌশল প্রদর্শন করেছেন। প্রথম চিত্রে সজ্জিত তৈজসপত্রগুলির মধ্যে একটা বেশ সুরের ঐক্য লক্ষ্যগোচর হয় কিন্তু দ্বিতীয় ছবিতে সেই জিনিসগুলিই সাজাবার দোষে নেহাৎ, যেন বেসুরো বেতালা লাগে! দৃশ্য-রচন কৌশলের গুণে একইছবিতে কেমন সুন্দর ভাবে 'Harmony' এবং কিরূপ সুস্পষ্ট 'discord' ফুটিয়ে তোলা যায়; এর চেয়ে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কিছু হ'তে পারে না। এই দৃশ্য-রচন-কৌশলের গুণেই আবার একই ছবিতে দর্শকের দৃষ্টি শিল্পীর ইচ্ছা মতো বিশেষ কোনো একটি অংশের উপর কী ভাবে আকৃষ্ট ও নিবদ্ধ করা যায়, সে উপায়ের সন্ধান দিয়েছেন তিনি 'জ্ঞানদেবীর দু'খানি পরের পর ছবিতে। তার পরের দুইখানি ছবিতে 'কাল ও দীপশিখার পরিকল্পনায় সেই 'গতির অনুকূল সামঞ্জস্য সাধন পদ্ধতি' অনুসারেই আঁকা একই চিত্রে তিনি দৃশ্য-রচন-কৌশলের গুণে দর্শকের দৃষ্টিতে একবার মানুষটীর উপর টেনে নিয়ে গেছেন, একবার তার 'বই'খানির উপর টেনে নিয়ে গেছেন। অথচ এই দুখানি ছবির মধ্যে আঁকার দিক দিয়ে পার্থক্য এত যৎসামান্য যে, অভিজ্ঞের প্রখর দৃষ্টি ভিন্ন তা' ধরা পড়ে না। কেবলমাত্র আলো ছায়ার ঈষৎ তারতম্য ঘটিয়ে একই ছবির মধ্যে মানুষটির বাম-হস্তের তর্জ্জনীটির অবস্থান একটু বদলে এই যে বিভেদ সৃষ্টি করা হ'য়েছে—দৃশ্য-রচন কৌশলের এও একটা প্রধান দিক। একটিমাত্র আঙুলের একটু এদিক-ওদিক হ'য়ে গেলেই দর্শকের দৃষ্টির গতি যখন ফিরে যায়, তখন এ কথা আর বেশী ক'রে বলাই বাহুল্য যে, দৃশ্য-রচন-কৌশলের উপর ছবির সাফল্য নির্ভর করে কতখানি। মোটের উপর চলচ্চিত্র-শিল্পীরও এ-কথা ভুলে গেলে চলবেনা যে শিল্প-সাধনায় composition বা দৃশ্য-রচন-কৌশল আয়ত্ত রাখ কলাজ্ঞানের সম্যক্ পরিচায়ক।

সাময়িকী

অবরোধ ও কারাদণ্ড—

মহাত্মা গান্ধী, প্যাটেল ভ্রাতৃদ্বয়, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অনেক ভদ্রলোককে নূতন অর্ডিনান্স অনুসারে অবরুদ্ধ করা হইয়াছে। এলাহাবাদের এলাকা হইতে বাহিরে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার জন্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর দুই বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড এবং ঐ অপরাধে মিঃ শেরওয়ানীর ছয়মাস কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের যথাক্রমে পাঁচশত ও দেড়শত টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে, অর্থ অনাদায়ে তাঁহাদের যথাক্রমে আরও ছয়মাস ও তিনমাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

আরও চারিটী অর্ডিনান্স—

আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে দেশে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার প্রতীকারকল্পে বিগত ৪ঠা জানুয়ারী বড়লাট চারিটি অর্ডিন্যান্স প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। অর্ডিন্যান্স চারিটির নাম :—(১) জরুরী ক্ষমতা বিষয়ক (এমারজেন্সি পাওয়ার) অর্ডিন্যান্স, (২) বে-আইনী প্ররোচনা বিষয়ক (আন-ল-ফুল ইনষ্টিগেসন) অর্ডিন্যান্স, (৩) বে-আইনী সমিতি বিষয়ক (আন-ল-ফুল এসোসিয়েসন) অর্ডিন্যান্স এবং (৪) উৎপীড়ন ও বয়কট নিবারণ বিষয়ক (প্রিভেনসন অব মোলেষ্টেশন এণ্ড বয়কটিং) অর্ডিন্যান্স।

জরুরি ক্ষমতা বিষয়ক অর্ডিন্যান্স—

এই অর্ডিন্যান্সের উদ্দেশ্য শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট এবং তাহার কর্ম্মচারীদিগকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া। তদনুসারে জনসাধারণের নিরাপত্তা ও শান্তি ক্ষুণ্ণকারী সকল রকম কার্য্য এই অর্ডিন্যান্সের মধ্যে পড়িয়াছে। তার পর এই অর্ডিন্যান্স-বলে সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য পুরাতন প্রেস অর্ডিন্যান্সটি পুনরায় বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই অর্ডিন্যান্স বিজ্ঞপ্তি দ্বারা অবিলম্বে বোম্বাই ও বাঙ্গালাতে প্রবর্ত্তিত করা হইবে। এই অর্ডিন্যান্সে সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদিগকে ...ন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এই সন্ধিগ্ধ ব্যক্তি বলিতে শুধু যে যাহারা জনসাধারণের নিরাপত্তা কিম্বা শান্তি নষ্ট করার কার্য্য করে তাহাদিগকেই বুঝায় তাহা নহে; পরন্তু যাহারা জনসাধারণের নিরাপত্তা ও শান্তি নষ্টকারী কোন আন্দোলনের প্রসারকল্পে কাজ করে তাহারাও ইহার মধ্যে পড়ে।

বে-আইনী প্ররোচনা বিষয়ক অর্ডিন্যান্স—

যুক্তপ্রদেশ এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যে অর্ডিন্যান্স জারী করা হইয়াছে—এই অর্ডিন্যান্সও সেইরূপ। ইহা অবিলম্বে মাদ্রাজ, বোম্বাই, পাঞ্জাব, বিহার ও উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশে প্রবর্ত্তিত করা হইবে।

বে-আইনী সমিতি বিষয়ক অর্ডিন্যান্স—

উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে যে অর্ডিন্যান্সটি জারী করা হইয়াছে এই অর্ডিন্যান্সটিও সেইরূপ। ইহা অবিলম্বে মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ এবং বিহার ও উড়িষ্যায় প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। এই অর্ডিন্যান্স বলে ভারত গবর্ণমেণ্ট যে-কোন সমিতিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন।

উৎপীড়ন ও বয়কট বিষয়ক অর্ডিন্যান্স—

এই অর্ডিন্যান্স সমগ্র বৃটিশ ভারতে প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে; তবে ইহা কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে স্থানীয় গবর্ণেণ্টকে তাহা সাধারণ্যে বিজ্ঞাপিত করিতে হইবে। এই অর্ডিন্যান্সটি পুরাতন অর্ডিন্যান্সেরই অনুরূপ। তবে ইহাতে উৎপীড়নের যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে শান্তিপূর্ণ পিকেটিংও অপরাধ বলিয়া গণ্য।

প্রতিষ্ঠান বে-আইনী—

সপারিষদ গবর্ণর ১৯৩২ সালের ৪নং অর্ডিন্যান্স অর্থাৎ বে-আইনী সমিতি অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী কলিকাতার ৪৪টী প্রতিষ্ঠান বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। নিম্নে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলির নাম দেওয়া হইল।

রাজপুত নবযুবক দল, ১-১ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট

হিন্দুস্থান তরুণ মণ্ডল „ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট
যতীন্দ্র স্মৃতি মন্দির ৪৮ চক্ররোড্ড সাউথ
হিন্দুস্থানী সেবাদল ১২০ হ্যারিসন রোড
জমাদার্স ইউনিয়ন ৬ ওল্ড চায়না বাজার ষ্ট্রীট
লেণ্ডর পিকেটিং বোর্ড পিং ২৬৪ প্রতাপাদিত্য রোড
পিকেটিং বোর্ড ৮৩ লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা
বড়বাজার কংগ্রেস কমিটী ১নং
৮৩ লোয়ার চিৎপুর রোড
ঐ ২নং ১২৬ ১৬৪ হ্যারিসন রোড
পাঞ্জাব ইউথলীগ ৫।১ বেণ্ডারডাইন লেন
উত্তর কলিকাতা রাষ্ট্রীয় সমিতি ৯৬ রাজা নবকিষণ ষ্ট্রীট
মধ্য কলিকাতা কংগ্রেস কমিটী ১নং
১৮নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট
ঐ ২ ১৬ং শাখারীটোলা লেন
দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটী
৭২এ আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড
নারী সত্যাগ্রহ সমিতি ১নং এণ্টনিবাগান লেন
নিখিল বঙ্গ জাতীয় নারী সঙ্ঘ ২৪ বিডন ষ্ট্রীট
গুজরাটী মহিলা সঙ্ঘ ১৫০ লোয়ার চিৎপুর রোড
মহিলা উত্থান সঙ্ঘ ওরফে রাষ্ট্রীয় মহিলা সমিতি
২০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
সিমলা ব্যায়াম সমিতি, কালিসিংহ পার্ক
বালিয়া ধাত্রী মণ্ডল ১০৮ কটন ষ্ট্রীট
২নং ঐ ১ জগন্নাথ ঘাট রোড
বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন সঙ্ঘ ১০ আপার চিৎপুর রোড
বিদেশী বস্ত্র বহিস্কার সমিতি, ১৫৬ হ্যারিসন রোড
বেঙ্গল ইয়ুথ লীগ ১৪ শাখারীটোলা লেন
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী ৪৯নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

জোড়াবাগান	„	৬৭।২৪ ষ্ট্রাণ্ড রোড
১নং ওয়ার্ড	„	৪৪ বাগবাজার ষ্ট্রীট
৩নং	„ „	৯৬ রাজা নবকিষণ ষ্ট্রীট
৫নং	„ „	১৭২ হ্যারিসন রোড
৬নং	„ „	২৬।১বি বারানসী ঘোষ ষ্ট্রীট
৭নং	„ „	১৬০ হ্যারিসন রোড
৮নং	„ „	১২ গোপালচন্দ্র লেন,
৯নং	„ „	২০ পটুয়াটোলা লেন
১০নং	„ „	২৭ মলোঙ্গা লেন
১১নং	„ „	১২ শাখারীটোলা লেন
১৯নং	„ „	৩৮৩ পাটারী রোড
২২নং	„ „	৩১ হালদারপাড়া রোড
২৩নং	„ „	৬৫ চেতলা রোড
২৪নং	„ „	৯২ ডায়মণ্ডহার্ব্বার রোড
২৫নং	„ „	মাইকেল দত্ত ষ্ট্রীট
২৭নং	„ „	১০৯২ লেক রোড
২৯নং	„ „	১০বি মাণিকতলা মেন রোড
৩০নং	„ „	২৫নং পাইকপাড়া রোড
৩১নং	„ „	১৯ উমাকান্ত সেন লেন

উত্তর কলিকাতা ইয়ুথ লীগ ১৫ রাজাবাগান জংসন রো
দক্ষিণ কলিকাতা ইয়ুথ লীগ পিং ২৬৪ প্রতাপাদিত্য রো

কলিকাতায় রবীন্দ্র-জয়ন্তী—

শুক্রবার (৯ই পৌষ)

৯ই পৌষ শুক্রবার টাউনহলে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব আ
হয়। কলিকাতার মেয়র ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের প্রস্তা
ত্রিপুরার মহারাজা প্রদর্শনী ও মেলা উদ্বোধন করে
ত্রিপুরার মহারাজা শ্রীযুক্ত বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহা
অভিভাষণে ত্রিপুরা ও ত্রিপুরা রাজ-পরিবারের কলা-সৌন্দ
প্রিয়তার প্রশংসা করিয়া বলেন—"আমি রবীন্দ্রনাথ
ত্রিপুরার কবি বলিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি।"

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে একটি বক্তৃতা করি
বলেন—

"জয়ন্তী উৎসব হইতে আমি আজ পর্য্যন্ত নিজে
ইচ্ছা করিয়াই দূরে রাখিয়া আসিয়াছি। কিন্তু আ
যখন শুনিলাম যে, উৎসবের উদ্যোক্তারা বর্ত্তমান ত্রি
ধিপতিকে দিয়া এই শিল্প-মেলার দ্বারোদ্ঘাটনের ব্য
করিয়াছেন, তখন না আসিয়া থাকিতে পারিলাম না
তাঁহারা এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া যথাযোগ্য কাজই করিয়াছে
আজিকার দিনে আমি আশীর্ব্বাদ ও কামনা করি যে আ
কল্যাণীয় বর্ত্তমান মহারাজার রাজ্য সাহিত্যে শিল্পে শক্তি
সুন্দর ও মহান হইয়া উঠুক।"

বেলা ১টায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতি
এক সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন হয়। বিশিষ্ট সাহিত্যি
গণ অনেক প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করেন।

আমরা নিম্নে প্রথম দিনের সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র
টোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিভাষণের শেষ অংশ উদ্ধৃত
রিয়া দিলাম।

"তার পরে এলো বঙ্গদর্শনের নবপর্য্যায়ের যুগ,
রীন্দ্রনাথের "চোখের বালি" তখন ধারাবাহিক প্রকাশিত
চ্ছে। ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গীর একটা নূতন আলো
সে যেন চোখে প'ড়লো। সেদিনের সেই গভীর ও সুতীক্ষ্ণ
নন্দের স্মৃতি আমি কোনোদিন ভুল্‌বো না। কোনো
ছু যে এমন ক'রে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে
নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে পায়
র পূর্ব্বে কখন স্বপ্নেও ভাবিনি। এতদিনে শুধু কেবল
াহিত্যের নয়, নিজেরও যেন এফটা পরিচয় পেলাম।
নেক প'ড়লেই যে তবে অনেক পাওয়া যায়, এ কথা সত্য
য়। ওই তো খানকয়েক পাতা, তার মধ্যে দিয়ে যিনি
তবড় সম্পদ সেদিন আমাদের হাতে পৌঁছে দিলেন তাঁকে
তজ্ঞতা জানাবার ভাষা পাওয়া যাবে কোথায়?

"এর পরেই সাহিত্যের সঙ্গে হলো আমার ছাড়াছাড়ি।
লেই গেলাম যে জীবনে একটা ছত্রও কোনো দিন
খেচি। দীর্ঘকাল কাটলো প্রবাসে,—ইতিমধ্যে কবিকে
ন্দ্র ক'রে যে নবীন বাঙ্‌লা সাহিত্য দ্রুতবেগে সমৃদ্ধিতে
রে উঠলো, আমি তার কোনো খবরই জানিনে। কবির
ঙ্গে কোনোদিন ঘনিষ্ঠ হ'বারও সৌভাগ্য ঘটেনি, তাঁর
ছে ব'সে সাহিত্যের শিক্ষা গ্রহণেরও সুযোগ পাইনি,
মি ছিলাম একেবারেই বিচ্ছিন্ন; এইটা হলো বাইরের
ত্য, কিন্তু অন্তরের সত্য সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই বিদেশে
মার সঙ্গে ছিল কবির খানকয়েক বই।—কাব্য ও
হিত্য; এবং মনের মধ্যে ছিল পরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস।
ন ঘুরে ঘুরে ওই ক'খানা বই-ই বারবার ক'রে প'ড়েছি,
কি তার ছন্দ, ক"টা তার অক্ষর, কা'কে বলে Art,
তার সংজ্ঞা, ওজন মিলিয়ে কোথাও কোনো ত্রুটী
ছে কিনা,—এসব বড় কথা কখনো চিন্তাও করিনি—
র ছিল আমার কাছে বাহুল্য। শুধু সুদৃঢ় প্রত্যয়ের
কারে মনের মধ্যে এইটুকু ছিল যে, এর চেয়ে পূর্ণতর
আর কিছু হ'তেই পারেনা। কি কাব্যে, কি কথা
হিত্যে, আমার ছিল এই পুঁজি।

"একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ যখন সাহিত্য-সেবার ডাক এলো, তখন যৌবনের দাবী শেষ ক'রে প্রৌঢ়ত্বের এলাকায় পা দিয়েছি। দেহ শ্রান্ত, উদ্যম সীমাবদ্ধ—শেখবার বয়স পার হ'য়ে গেছে। থাকি প্রবাসে, সব থেকে বিচ্ছিন্ন, সকলের কাছে অপরিচিত, কিন্তু অকালে সাড়া দিলাম,—ভয়ের কথা মনেই হোলো না। আর কোথাও না হোক্, সাহিত্যে গুরুবাদ আমি মানি।"

শনিবার (১০ই পৌষ)

বেলা ১১টায় টাউনহলে স্যর রাধাকৃষ্ণের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্মেলনের অধিবেশন হয়। এদিন ইংরাজীতেই সভার কার্য্য হয়। অভিভাষণে স্যর রাধাকৃষ্ণ বলেন—

"অন্তর্জ্জীবনের তপস্যার আবশ্যকতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্য ও সাহিত্যে বিশেষরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি সত্যিকারের শিল্পীর ন্যায় গভীর আত্মোপলব্ধির ভিতর হইতে এই সত্য প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার কাব্য ও সাহিত্যের মধ্যে সেই অমৃতের স্পর্শ এবং তাঁহার সেই বিরাট মনের পরিচয় পাওয়া যায় যাহা পৃথিবীর গণ্ডী ছাড়াইয়া গিয়াছে—যাহার মধ্য দিয়া গভীরতর সত্যের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছে। এই পৃথিবী একটা গোলকধাঁধা কিম্বা মায়ালোক নয় যে আমাদিগকে ইহা পরিহার করিয়া চলিতে হইবে; ইহা পূর্ণতা লাভের যাত্রাপথ মাত্র। তাঁহার 'রাজর্ষি' নাটকে তিনি দেখাইয়াছেন, একটি ক্ষুদ্র বালিকা রাজর্ষিকে বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছে যে, জাগতিক প্রেম ও ভালবাসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেই পূর্ণতা লাভ করা যায় না—'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়, সহস্র বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ।'

"রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত ভাবপ্রবণ, তাই সামাজিক বিধি-নিয়মের নামে মানুষের উপর মানুষ যে সব অন্যায় ও অবিচার করে তিনি তাহার ঘোর বিরোধী। তিনি মনে করেন, বিধি-নিয়ম অপেক্ষা জীবন উন্নততর; সঙ্গতি অপেক্ষা সৌন্দর্য্য বৃহত্তর এবং সামঞ্জস্য অপেক্ষা সত্য শ্রেষ্ঠতর।

"আধ্যাত্মিক জীবনের অন্তরতা, শুধু শুধু ত্যাগের ব্যর্থতা এবং প্রেম ও সহমর্ম্মিতার বাস্তব উৎকর্ষ সাধন—এই তিনটি মূল কথা কবি তাঁহার সকল গ্রন্থের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সমগ্রতাই তাঁহার আদর্শ—জীবনকে তিনি খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করিয়া দেখেন নাই; জীবন ও

মনের সহজ স্বচ্ছন্দ গতিকে তিনি বিসর্জ্জন দেন নাই, উহা তাঁহার নিকট পূর্ণ সত্যলাভের সোপান স্বরূপ।”

স্যর সি, ভি, রমণ মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ডাঃ হাসান সারওয়ার্দ্দি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে অধ্যাপক শাহীদুল্লা ও অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে রায় বাহাদুর এন, কে, সেন, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ডাঃ রাধামুকুদ মুখোপাধ্যায়, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে অধ্যাপক ফণীভূষণ অধিকারী, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে অধ্যাপক হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে অধ্যাপক অমরনাথ ঝাঁ কবিবরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

ইহার পর রবীন্দ্র সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ডাঃ আকুহার্ট, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা প্রভৃতির প্রবন্ধ পঠিত হয়।

রবিবার (১১ই পৌষ)—

এই দিন অপরাহ্ণ সাড়ে চারিটায় টাউন হলের সম্মুখস্থ রাজপথের উপর প্রায় পাঁচ হাজার নরনারীর সম্মুখে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিশ্বকবিকে অভিনন্দন ও অর্ঘ্য প্রদান করেন। সেদিনের দৃশ্য অনির্ব্বচনীয়। সর্ব্বপ্রথমে—

কলিকাতা পৌর-সভার অভিনন্দন

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের করকমলে—

বিশ্ববরেণ্য মহাভাগ,

তোমার জীবনের সপ্ততিবর্ষ পরিসমাপ্তি উপলক্ষে কলিকাতা নগরীর পৌরবৃন্দের পক্ষ হইতে আমরা তোমাকে অভিবাদন করিতেছি।

এই মহানগরী তোমার জন্মস্থান এবং তোমার যে কবি-প্রতিভা সমগ্র সভ্যজগৎকে মুগ্ধ করিয়াছে এই স্থানেই তাহার প্রথম স্ফূরণ। এই মহানগরীই তোমার ঋষিতুল্য জনকের ধর্ম্মজীবনের সাধনক্ষেত্র, এই মহানগরীই তোমার নরেন্দ্রকল্প পিতামহের আজীবন কর্ম্মক্ষেত্র এবং এই মহানগরীর যে বংশ ভাবে, ভাষায়, শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, অভিনয়ে, শিষ্টাচার ও সদালাপে সমগ্র সজ্জনসমাজের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছে, তুমি সেই বংশেরই অত্যুজ্জ্বল রত্ন—তাই তুমি সমগ্র বিশ্বের হইলেও আমাদের একান্ত আপনার জন। বিশ্বের বিদ্বজ্জনসমাজের সমাদর লাভ করিয়া তুমি কলিকাতা-বাসীরই মুখ উজ্জ্বল করিয়াছ। তোমার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা বঙ্গ-ভাষাকে অপূর্ব্ব বৈভবে মণ্ডিত করিয়া জগতের সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তোমার অভিনব কল্পনাপ্রসূত শিক্ষার আদর্শ বাঙ্গলার এক নিভৃত পল্লীকে বিশ্বমানবের শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করিয়াছে, এবং তোমার লেখনীনিঃসৃত অমৃতধারা বাঙ্গালী জাতির প্রাণে লুপ্তপ্রায় দেশাত্মবোধ সঞ্জীবিত করিয়াছে। হে মাতৃপূজার প্রধান পুরোহিত, হে বঙ্গভারতীর দিগ্বিজয়ী সন্তান, হে জাতীয় জীবনের জ্ঞান-গুরু, আমরা তোমারে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। বন্দে মাতরম্।

তোমার গুণগর্ব্বিত

কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্যবৃন্দের পক্ষে

শ্রীবিধানচন্দ্র রায়—মেয়র

কবির উত্তর

একদা কবির অভিনন্দন রাজার কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হইত। তাঁহারা আপন রাজমহিমা উজ্জ্বল করিবার জন্য কবিকে সমাদর করিতেন—জানিতেন সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী নয়, কবি-কীর্ত্তি তাহাকে অতিক্রম করিয়া ভাবীকালে প্রসারিত।

আজ ভারতের রাজসভায় দেশের গুণিজন অখ্যাত-রাজার ভাষায় কবির ভাষায় গৌরবের মিল ঘটে নাই। আজ পুরসভা স্বদেশের নামে কবিসংবর্দ্ধনার ভার লইয়াছেন। এই সম্মান কেবল বাহিরে আমাকে অলঙ্কৃত করিল না, অন্তরে আমার হৃদয়কে আনন্দে অভিষিক্ত করিল।

এই পুরসভা আমার জন্মনগরীকে আরামে আরোগ্যে আত্মসম্মানে চরিতার্থ করুক, ইহার প্রবর্ত্তনীয় চিত্রে স্থাপত্যে, গীতকলায়, শিল্পে এখানকার লোকালয় নন্দিত হউক, সর্ব্বপ্রকার মলিনতার সঙ্গে সঙ্গে অশিক্ষার কদর্য্য এই নগরী স্খালন করিয়া দিক,—পুরবাসীদের দেহে শক্তি আসুক, গৃহে অন্ন, মনে উদ্যম, পৌরকল্যাণসাধনে আনন্দিত উৎসাহ। ভ্রাতৃবিরোধের বিষাক্ত আত্মহিংসার পাপ ইহাকে কলুষিত না করুক—শুভ-বুদ্ধি দ্বারা এখানকার সকল জাতি সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় সম্মিলিত হইয়া এই নগরীর চরিত্রকে অমলিন ও শান্তিকে অবিচলিত করিয়া রাখুক এই আমি কামনা করি।

তাহার পর বিশ্ব-ভারতীর পক্ষ হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় অর্ঘ্য দান করেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অভিনন্দন

রবীন্দ্র-প্রশস্তি

হে কবীন্দ্র, বঙ্গদেশের সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী-দিগের প্রতিনিধিরূপে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ভবদীয় সপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে, সাদরে ও সগৌরবে আপনাকে বরণ করিতেছে।

কিশোর বয়সেই আপনি বঙ্গবাণীর অর্চ্চনায় আত্ম-নিয়োগ করেন। তদবধি ব্রতধারী তপস্বীর ন্যায়, সুচিরকাল নিয়ম ও নিষ্ঠার সহিত অক্লান্ত-অকুণ্ঠ ভাবে তাঁহার আরাধনা করিয়াছেন। হে তাপস, আপনার সাধনার সিদ্ধি হইয়াছে—দেবী আপনার শিরে অমর-বর বর্ষণ করিয়াছেন —আপনার ত্রিতন্ত্রীতে তাঁহার অমৃত-বীণার অভয় মূর্চ্ছনা সঞ্চারিত করিয়াছেন। হে বরাভয়মণ্ডিত মনীষী, আপনি শতায়ুঃ হইয়া, এই মোহনিদ্রায় নিষুপ্ত জাতির প্রাণে বীর্য্য ও বলের প্রেরণা দ্বারা, তাহার সুপ্ত চেতনাকে প্রবুদ্ধ করুন, এবং প্রতিভার কল্পলোকে বিরাজ করিয়া, মুক্তহস্তে প্রাচ্যকে ও প্রতীচ্যকে নব নব সুষমা ও সৌন্দর্য্য, কল্যাণ ও আনন্দ বিতরণ করুন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ঊনচত্বারিংশ বৎসর ব্যাপিয়া আপনার উপচীয়মান শুভ সাহিত্য-সম্পদে বিপুল গর্ব্ব অনুভব করিয়াছে। আপনার বক্তৃতার মন্দ্রে ইহার আদ্য বার্ষিক উৎসব মন্দ্রিত হইয়াছিল। আপনার পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ণ হইলে পরিষৎ আপনাকে অভিনন্দিত করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। আবার আপনার স্মরণীয় ষষ্ঠীতম জন্মদিনে সংবর্দ্ধনার সম্ভার সজ্জিত করিয়া, পরিষৎ আপনাকে সম্ভ্রমের অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছিল। কবি-জীবনের সেই সেই সন্ধি-ক্ষণে উচ্চারিত পরিষদের উচ্চ আশা ও আকাঙ্ক্ষা আপনার কীর্ত্তি-ভাতিতে সমুজ্জ্বল হইয়া আজ সফলতার তুঙ্গ ভূমিতে আরোহণ করিয়াছে। সু-ধন্য আপনি মানবের বিনশ্বর দুঃখ-সুখের মধ্যে সত্যের শাশ্বত স্বরূপকে দর্শন করিয়াছেন, এবং খণ্ডের মধ্যে অখণ্ড, বিভক্তের মধ্যে সমগ্র, ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টি, বহুর মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পাইয়া, যুগ-যুগান্ত-লব্ধ ভারতের সনাতন আদর্শকে ভাগীরথী-ধারার ন্যায় মর্ত্ত্যে আবার অবতীর্ণ করাইয়াছেন। হে সত্যদ্রষ্টা, আপনাকে শত শত নমস্কার।

হে বাণীর বরপুত্র, হে বিশ্ববরেণ্য কবি, ‘বর্ণ-গন্ধ-গীতময়’ এই বিচিত্র বিশ্ব যাঁহার সুরভি-শ্বাস, কবি-কোবিদের ‘ধী’র অভ্যন্তরে মুখরিত প্রেম-প্রজ্ঞা-প্রতাপ যাঁহার সৎ-চিৎ-আনন্দের প্রচ্ছন্ন আভাস, সেই শঙ্কর বিশ্বম্ভর বিশ্বকবি আপনার চির-স্বস্তি ও শান্তি বিধান করুন; যদ্ ভদ্রং তদ্ ব আ সুবতু; আর, স বো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥

॥ ওঁ স্বস্তি ॥ ওঁ স্বস্তি ॥ ওঁ স্বস্তি ॥

কলিকাতা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে

বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

১২ই পৌষ সভাপতি

কবির উত্তর

সাহিত্য-পরিষদের প্রথম আরম্ভ কালেই এই প্রতিষ্ঠান আমার অন্তরের অভিনন্দন লাভ করিয়াছিল এ কথা তাঁহারা সকলেই জানেন যাঁহারা ইহার প্রবর্ত্তক। আমার অকৃত্রিম প্রিয় সুহৃদ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অক্লান্ত অধ্যবসায়ে এই পরিষদকে স্বভবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে বিচিত্র আকারে পরিণতি দান করিয়াছেন। একদা আমার পঞ্চাশৎবার্ষিকী জয়ন্তীসভায় তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোগী এবং সেই সভায় তাঁহারই স্নিগ্ধ হস্ত হইতে আমার স্বদেশদত্ত দক্ষিণা আমি লাভ করিয়াছিলাম। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বর্ত্তমান জয়ন্তী-উৎসবের সূচনা সভায় সভানায়কের আসন হইতে প্রশংসা-বাদের দ্বারা আমাকে তাঁহার শেষ আশীর্ব্বাদ দান করিয়া গিয়াছেন। আমি অনুভব করিতেছি এই মানপত্রে আমার পরলোকগত সেই সহৃদয় সুহৃদ্‌দের অলিখিত স্বাক্ষর রহিয়াছে—যাঁহাদের হস্ত অদ্য স্তব্ধ, যাঁহাদের বাণী নীরব।

অদ্য পরিষদের বর্ত্তমান সভাপতি সর্ব্বজনবরেণ্য জন-নায়ক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এই যে মানপত্র সমর্পণ করিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিলেন এই পত্রে সাহিত্য-পরিষদ বঙ্গ-ভারতীর বরদান বহন করিয়া আমার জীবনের দিনান্তকালকে উজ্জ্বল করিলেন এই কথা বিনয়নম্র আনন্দের সহিত স্বীকার করিয়া লইলাম।

তাহার পর হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন অভিভাষণ পাঠ করেন এবং রবীন্দ্রনাথ তাহার যথাযোগ্য উত্তর দান করেন।

প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের অভিনন্দন

জয়ন্তী-অর্ঘ্য

হে কবি! জয়ন্তী-অর্ঘ্য নিয়ে হাতে তোমার স্মরণে
সুদূর প্রবাস হ'তে এই পথে, কবিনিবেদনে,
এলো যারা, সেকি তারা বয়সের দাবী শুনে তব?
তা তো নয়, দেখি রূপ, অপরূপ, চির অভিনব;
বয়সের সীমা তব, নিত্য নব নর্ত্তনের কোলে,
সপ্ততি বৎসর বুকে, সাত বৎসরের শিশু দোলে
সৃষ্টির আনন্দে মগ্ন; সময়ের হিসাব না রাখে,
বিস্মিত বিশ্বের মন তার পানে চেয়ে শুধু থাকে।
কার চোখে এত দীপ্তি? কার বাণী নিত্য বহমান?
কার প্রীতি নিতি নিতি, রচি চলে বিশ্বের কল্যাণ
অফুরন্ত প্রাণ-রসে;—সে যে এই শিশু চিরন্তনী,
যুগে যুগে হে প্রবীণ! গাহ নবীনের জয়ধ্বনি।
বাঙ্গালার বুকের দুলাল! সত্যদ্রষ্টা! হে অমর কবি!
কালক্ষয় করে তুমি জয় গেয়ে যেও সুরের পূরবী।
চির-সবুজের সমারোহ নিত্য হোক জীবনে তোমার,
প্রবাসের ভালবাসা-ভরা, ধর এই অর্ঘ্য-উপচার।

কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের
সপ্ততিতম-বর্ষ-অর্ঘ্যপত্র
দেশবাসীর শ্রদ্ধার অর্ঘ্য

কবিগুরু,

তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।

তোমার সপ্ততিতম-বর্ষশেষে একান্তমনে প্রার্থনা করি জীবনবিধাতা তোমাকে শতায়ুঃ দান করুন; আজিকার এই জয়ন্তী-উৎসবের স্মৃতি জাতির জীবনে অক্ষয় হোক।

বাণীর দেউল আজি গগন স্পর্শ করিয়াছে। বঙ্গের কত কবি, কত শিল্পী, কত না সেবক ইহার নির্ম্মাণকল্পে দ্রব্যসম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছেন; তাঁহাদের স্বপ্ন ও সাধনার ধন, তাঁহাদের তপস্যা তোমার মধ্যে আজি সিদ্ধি-লাভ করিয়াছে। তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী সকল সাহিত্যাচার্য্য-গণকে তোমার অভিনন্দনের মাঝে অভিনন্দিত করি।

আত্মার নিগূঢ় রস ও শোভা, কল্যাণ ও ঐশ্বর্য্য তোমার সাহিত্যে পূর্ণ বিকশিত হইয়া বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছে। তোমার সৃষ্টির সেই বিচিত্র ও অপরূপ আলোকে স্বকীয়-চিত্তের গভীর ও সত্য পরিচয়ে কৃতকৃতার্থ হইয়াছি।

হাত পাতিয়া জগতের কাছে আমরা নিয়াছি অনেক, কিন্তু তোমার হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক।

হে সার্ব্বভৌম কবি, এই শুভদিনে তোমাকে শান্তমনে নমস্কার করি। তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকে আজি বারম্বার নতশিরে নমস্কার করি। ইতি—

রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসব-পরিষদপক্ষে
শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু
সভাপতি

সমস্ত অভিনন্দন প্রদান ও অর্ঘ্যদান শেষ হইয়া গেলে রবীন্দ্রনাথ সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ করিয়া বলেন—

"বিপুল জনসঙ্ঘের বাণীসঙ্গমে আজ আমি স্তব্ধ। এখানে নানা কণ্ঠের সম্ভাষণ, এ যে আমারই অভিবাদনের উদ্দেশে সম্মিলিত এ কথা আমার মন সহজে ও সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করিতে অক্ষম। সূর্য্যের আলোক বাষ্পসিক্ত ধূলি বিকীর্ণ বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়, কোথাও বা সে ছায়ায় ম্লান, কোথাও বা সে অন্ধকারের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত, কোথাও বা সে বাধাহীন আকাশে সমুজ্জ্বল, কোথাও বা পুষ্প-কাননে বসন্তে তাহার অভ্যর্থনা, কোথাও বা শস্যক্ষেত্রে শরতে তাহার উৎসব। দৈবকৃপায় আমি কবিরূপে পরিচিত হইয়াছি—কিন্তু সেই পরিচয়ের স্বীকার দেশবাসীর হৃদয়ে হৃদয়ে অনবচ্ছিন্ন নহে, তাহা স্বভাবতঃই বাধাবিরোধ ও সংশয়ের দ্বারা কিছু না কিছু অবগুণ্ঠিত। তাহাকে বিক্ষিপ্ততা হইতে সংক্ষিপ্ত করিয়া, আবরণ হইতে মুক্ত করিয়া এই জয়ন্তী অনুষ্ঠান নিবিড় সংহতভাবে প্রত্যক্ষগোচর করিয়াছিল—সেই সঙ্গে উপলব্ধি করিলাম দেশের প্রীতি প্রসন্ন হৃদয়কে তাহার আপন অপ্রচ্ছন্ন বিরাটরূপে। সেই আশ্চর্য্যরূপ দেখিলাম পরম বিস্ময়ে, আনন্দে, সম্ভ্রমের সঙ্গে, মস্তক নত করিয়া।

অদ্যকার এই প্রকাশ কেবল যে আমারই কাছে অপরূপ অপূর্ব্ব তাহা নহে, দেশের নিজের কাছেও। উৎসবের আয়োজন করিতে গিয়াই দেশশ্রী সহসা আবিষ্কার করিয়াছেন তাঁহার গভীর অন্তরের মধ্যে কতটা আনন্দ কতটা প্রীতি নানা ব্যবধানের অন্তরালে অজস্র সঞ্চিত হইতেছিল। আবাল্যকাল দেশমাতার প্রাঙ্গণে গাহিয়াই আমার কণ্ঠ সাধনা। মাঝে মাঝে যখন মনে হইত উদাসীন তিনি, তখনো বুঝিবা তাঁহার অগোচরেও সুর পৌঁছিয়াছিল

তাঁহার অন্তরে; যখন মনে হইয়াছে তিনি মুখ ফিরাইয়াছেন তখনো হয়ত তাঁহার শ্রবণদ্বার রুদ্ধ হয় নাই। ভালো ও মন্দ, পরিণত ও অপরিণত, আমার নানা প্রয়াস তিনি দিনে দিনে মনে মনে আপন স্মৃতিসূত্রে গাঁথিয়া লইতেছিলেন। অবশেষে সত্তর বৎসর বয়সে যখন আমার আয়ু উত্তীর্ণ হইল, যখন তাঁহার সেই মালার শেষ গ্রন্থি দিবার সময় আসন্ন, তখনই আমার দীর্ঘজীবনের চেষ্টা তাঁহার দৃষ্টি সম্মুখে সমগ্রভাবে সম্পূর্ণ প্রায়। সেইজন্যই তাঁহার এই সভায় আজ সকলের আমন্ত্রণ, স্নিগ্ধস্বরে তাঁহার এই বাণী আজ উচ্চারিত—"আমি গ্রহণ করিলাম।" সংসার হইতে বিদায় লইবার দ্বারের কাছে সেই বাণী স্পষ্ট ধ্বনিত হইল আমার হৃদয়ে। ত্রুটী বিস্তর আছে, সাধনায় কোনো অপরাধ ঘটে নাই ইহা একেবারে অসম্ভব। সেইগুলি বুনিয়া বুনিয়া বিচার করিবার দিন আজ নহে। সে সমস্তকে অতিক্রম করিয়াও আমার কর্ম্মের যে সত্যরূপ, যে সম্পূর্ণতা প্রকাশমান তাহাকেই আমার দেশলক্ষ্মী তাঁহার আপন সামগ্রী বলিয়া চিহ্নিত করিয়া লইলেন। তাঁহার সেই অঙ্গীকারই এই উৎসবের মধ্য দিয়া আমাকে বরদান করিল। আমার জীবনের এই শেষ বর, এই শ্রেষ্ঠ বর।

অনুকূলতা এবং প্রতিকূলতা শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষের মতোই উভয়েরই যোগে রাত্রির পূর্ণ আত্মপ্রকাশ। আমার জীবন নিষ্ঠুর বিরোধের প্রভূত দান হইতে বঞ্চিত হয় নাই। কিন্তু তাহাতে আমার সমগ্র পরিচয়ের ক্ষতি হয় না, বরঞ্চ তাহার যা শ্রেষ্ঠ যা সত্য তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। আমার জীবনেও যদি তাহা না ঘটিত, তবে অদ্যকার এই দিন সার্থক হইত না। আমার আঘাতপ্রাপ্ত শরবিদ্ধ খ্যাতির মধ্য দিয়া এই উৎসব আপনাকে প্রমাণ করিয়াছে। তাই আমার শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষেরই তিথিকে প্রণাম করা আমার পক্ষে আজ সহজ হইল। যে ক্ষয়ের দ্বারা ক্ষতি হয় না তাহাই বিধাতার মহৎ দান—দুঃখের দিনেও যেন তাহাকে চিনিতে পারি, শ্রদ্ধার সহিত যেন তাহাকে গ্রহণ করিতে বাধা না ঘটে।

আপনাদের প্রদত্ত শ্রদ্ধা ও গৌরব আমি সকৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করিতেছি। আপনাদের এই আয়োজন সময়োচিত হইয়াছে। জীবনের গতি যখন প্রবল থাকে, তখন সম্মান গ্রহণ ও বহন করিবার দিন নয়। জীবন যখন মৃত্যুর প্রান্তে আসিয়া পৌঁছায় তখনই তাহা অপেক্ষাকৃত সহজে লওয়া যায়। কর্ম্মের গতি বেগময় জীবনের মধ্যে সম্মান অনেক বিক্ষোভ ও বাদবিসম্বাদের সৃষ্টি করে। আজিকার দিনে আপনাদের হাত থেকে তাই সবিনয়ে দেশের শেষ সম্মান আমি গ্রহণ করিতেছি ও দেশবাসীকে আমার সকৃতজ্ঞ হৃদয়ের শেষ নমস্কার জানাইয়া যাইতেছি।

মঙ্গলবার (১৩ই পৌষ)—

এইদিন অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটার সময় শ্রীযুক্ত অমল হোম বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের যে প্রতিমূর্ত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহার উন্মোচন অনুষ্ঠান হয়, সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় প্রতিমূর্ত্তি উন্মোচন করেন। তাহার আধ ঘণ্টা পরেই রবীন্দ্রনাথ পরিষদ-ভবনে উপস্থিত হন। এ দিনে পরিষদে তাঁহার সংবর্দ্ধনার আয়োজন হয়। এই স্থানে মেদিনীপুর সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে সভাপতি শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী মহাশয় কবিবরকে রেশম-সূত্রে গ্রথিত একখানি সুন্দর মাদুর উপহার দেন। আলাপ-আলোচনা, আলোকচিত্র গ্রহণ ও জলযোগের পর সম্মেলন শেষ হয়।

বৃহস্পতিবার (১৫ই পৌষ)—

এই দিন অপরাহ্ণ চারিটার সময় বাঙ্গালাদেশের ছাত্র-ছাত্রীদিগের পক্ষ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করা হয়। বিস্তৃত সেনেট হলটী পত্রপুষ্প পতাকায় অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। ছাত্র-ছাত্রীদিগের পক্ষ হইতে কয়েকটী অভিনন্দনপত্র পঠিত ও অর্ঘ্য প্রদত্ত হইলে কবিবর একটী সুদীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করেন।

মেলা, প্রদর্শনী ও আমোদপ্রমোদ—

৯ই পৌষ হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েকদিনব্যাপী একটী মেলা ও প্রদর্শনী টাউনহলের প্রাঙ্গণে ও হলের নিম্নতলে হইয়াছিল। মেলায় অনেক দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছিল। টাউনহলের নিম্নতলে যে শিল্প প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহা বড়ই মনোরম হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত দুই শতাধিক চিত্র, তিনি কোথায় কি কি উপহার পাইয়াছিলেন সে সমস্ত, তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর পাণ্ডুলিপিসমূহ এবং নানা স্থান হইতে আগত চিত্রাবলী এই প্রদর্শনীর অপূর্ব্ব শ্রী সম্পাদন করিয়াছিল। কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে এবং কবিবরের জোড়াসাঁকোর ভবনে কয়েক

দিন গানবাজনা ও কবিরচিত 'নটীর পূজা' ও 'শাপ-মোচনের'র অভিনয় হইয়াছিল।

এই রবীন্দ্র-জয়ন্তীর অনুষ্ঠাতৃবর্গকে এই অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিবার জন্য ধন্যবাদ করিতেছি।

স্বর্গীয় বরদাপ্রসাদ বসু

সুপ্রসিদ্ধ 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার স্বত্বাধিকারী বরদাপ্রসাদ বসু মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন। 'বঙ্গবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের পরলোক গমনের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বরদাপ্রসাদ বাবুই এতদিন 'বঙ্গবাসী' পরিচালনা করিয়া আসিয়াছেন। তিনি পিতার ন্যায় কার্য্যদক্ষতা ও সদাশয়তাগুণে সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। বরদাবাবুর পরলোকগমনে আমরা একজন সহৃদয় বন্ধু হারাইলাম। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি বরদাবাবুর শোক-সন্তপ্ত আত্মীয়স্বজনগণের হৃদয়ে শান্তিধারা বর্ষণ করুন।

৺যোগেশচন্দ্র সিংহ

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম যে গত ১৩ই পৌষ মঙ্গলবার রাত্রি ১০টায় কলিকাতা হাইকোর্টের প্রবীণ উকিল, পাইকপাড়া রাজষ্টেটের একজিকিউটার, পরম ভাগবত এবং সাহিত্যিক যোগেশচন্দ্র সিংহ মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসর হইয়াছিল। তিনি কায়স্থসমাজের কল্যাণসাধনে বিশেষভাবে ব্রতী ছিলেন। বাল্যাবধি তিনি জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। তাঁহার প্রণীত পুস্তকাবলীর মধ্যে "কালের স্রোত" নামক ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুস্তকখানি বাঙ্গলার সুধিসমাজে বিশেষ আদৃত হইয়াছে। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের আজীবন সভ্য এবং স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও স্বর্গীয় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অন্তরঙ্গ সুহৃদ ছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় নিজ গ্রাম পাঁচথুপীর উন্নতিকর সমস্ত হিত কর্ম্মে তিনি প্রধান

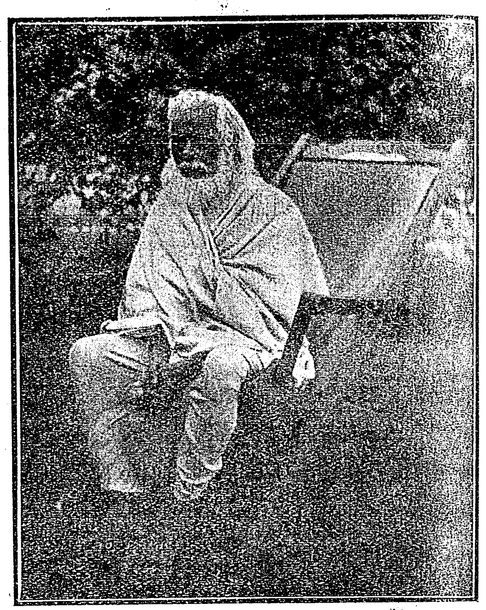

স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র সিংহ

উদ্যোগী ছিলেন। এই শোকের সময় আমরা তাঁহার পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত "নিশিপদ্ম"—১৷৷০

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "অনাহূত"—১৷৷০

শ্রীরাধাবল্লভ স্মৃতি ব্যাকরণ জ্যোতিস্তীর্থ কৃত শ্রীভাস্করাচার্য্যের "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" (গণিতাধ্যায়ের)—১৲

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত "লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ"—১৷৷০

শ্রীসুখময় দাসগুপ্ত এম-এ প্রণীত "বীরপূজা" —।৶০

শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নাটিকা "যক্ষপ্রিয়া"—।০

শ্রীসুখময় দাসগুপ্ত এম-এ প্রণীত "মহাত্মা গান্ধীর ছাত্র-জীবন"—।৶০

শ্রীমতী মাহ্‌মুদা খাতুন ছিদ্দিকা প্রণীত খণ্ডকাব্য "পশারিণী"—১৲

শ্রীনগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত "আলাপে প্রলাপে"—১৲

শ্রীমতীকনকলতা ঘোষ প্রণীত খণ্ডকাব্য "অনুরাগ"—৷৷০

শ্রীতড়িৎকুমার বসু প্রণীত নাটক "শ্রী-হীন কৃষ্ণ"—১৷৷০

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত খণ্ডকাব্য "পদ্মা"—১৲

শ্রীমতীপ্রীতিকণা দত্তজায়া প্রণীত "পদ্মিনী"—।০

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA.
of Messrs. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
201, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

Printer—NARENDRANATH KUNAR.
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS.
203-1-1, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

পার্থ-সারথী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

COLOURED ILLUSTRATION